একালের একাংক

[প্রথম খণ্ড]

সম্পাদনায়ঃ

সুনীল দত্ত

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলি-৯

প্রথম প্রকাশ :
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

প্রচ্ছদ :
প্রণবকুমার

প্রকাশক :—ডি. ঘোষ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, ও শ্রীবাণী প্রিন্টিং কোং, ৩৬।৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীদেবকুমার দে কর্তৃক মুদ্রিত।

নীলকণ্ঠ

॥ উৎপল দত্ত ॥

॥ চরিত্র ॥

মহারাজ	চিদানন্দ
শিউনন্দন	অলক
ছেলেরা	সুরেন
অবিনাশ	পোর্টফোলিও
সুদর্শন	নিতাই
সমীর	আরও অনেকে

[বিকেলবেলা চারটে নাগাদ মেঘ করে আসায় গলিটা কেমন অন্ধকার ন্ধকার ঠেকছে। রোয়াকে অবিনাশবাবুর সঙ্গে রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টর চদানন্দবাবুর দাবা খেলাটা জমে উঠেছে খুব, পাড়ার নিতাইবাবু এবং ক্ষিণেশ্বরবাবু মাঝে মাঝে বিনামূল্যে উপদেশ দিয়ে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। ওদিকে দোতলার বারান্দায় ছোট বউটি রোদে দেয়া শাড়িগুলো তুলে নিচ্ছিল। লপিওয়ালা মাথায় এক কলসী ঠাণ্ডা নিয়েও গরমে ঘামতে ঘামতে বসে ড়েছে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে। সুরেনবাবু অফিস থেকে ফিরলেন এই ত্র। বাড়িতে ঢোকার আগে পাশের বাড়ির সুদর্শনবাবুর সঙ্গে দ্রব্যমূল্য-দ্ধি সম্বন্ধে একটু আলাপ করে নিচ্ছেলেন। অলস সুরে "শিশি বোতল গন্জ বিক্রী" বলতে বলতে ততোধিক মন্থর পদক্ষেপে চলে যাচ্ছিল এক শীর্ণকায় ক্ত। অদূরের চায়ের দোকানে অলক আর সমীর কর্মহীনতার আলস্যে মাহনবাগানের অকাস্মিক পরাজয়ের কথা আলোচনা করছিল।

এমন সময়ে শুধু মাত্র নেংটি পরনে, হাতে দড়ি আর বালতি নিয়ে কৃষ্ণকায় শিউনন্দন আর মহারাজ এসে সাবলের চাড় দিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনাটা খুলে ফেললো। মহারাজ বালক মাত্র; তাই কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সাফ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ওদিকে শিউনন্দন বিড়ি ধরিয়েছে, গুন গুন করে গানও ধরেছে। মহারাজ ম্যানহোলের মুখে দাঁড়িয়ে পুতিগন্ধময় গহ্বরটাকে একবার দেখে নেয়। এঁদের ভাষা কাব্যময় ব্রজবুলি; সুবিধের জন্য এদের দিয়ে বাংলাই বলানো যাক।]

শিউনন্দন ॥ নামবি তো, না চেয়ে থাকবি ?

মহারাজ ॥ নামছি, তাড়া কি ?

শিউ ॥ কাজ শেষ করে ঘরকে যাই। মন ভাল নেই।

মহারাজ ॥ কি ব্যাপার ?

শিউ ॥ আর বলিস কেন ? সকালে মোড়ের বাড়িটায় এক কাণ্ড হয়ে গেল।

মহারাজ ॥ কি ?

শিউ ॥ জল ঢালতে বললাম, গিন্নীর আর আসার সময় হয় না। কল ছুঁয়ে ফেলেছিলাম।

মহারাজ ॥ তারপর ?

শিউ ॥ বাড়ির দুই পালোয়ান ছেলে জুতো নিয়ে মারতে এল, হাওয়া হয়ে গেলাম।

মহারাজ ॥ হাতের ঝাঁটাটা দিয়ে মুখে এক-ঘা কষে দিতে পারলে না ?

শিউ ॥ হ্যাঁঃ, আর পৈতৃক প্রাণটা যাক আর কি ? নাম্, নাম্!

[মহারাজের নামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে কুলপি কিনতে গেল। ওদিকে চিদানন্দবাবু একটা চাল ফেরৎ চাইলে সমবেত সকলে হৈ হৈ করে উঠলো। ছোট বউটি রেলিংয়ে ভর দিয়ে আনমনা দাঁড়িয়ে রইল। সুরেনবাবু বাক্যালাপ সেরে ঘরে ঢোকার মুখে বউটিকে কয়েক নজর দেখে নিলেন। অলক আর সমীর বলরামের খেলার প্রশংসা করতে করতে বেরিয়ে এল চায়ের দোকান থেকে। মহারাজ কুলপি খেতে খেতে ফিরে এল ম্যানহোলের কাছে।]

শিউ ॥ তুই বেশ আছিস।

মহারাজ ॥ কি ?

শিউ ॥ ছোটখাটো শরীর, মাটির তলায় কাজ। আমার এই গতর নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। রাজ্যের পায়খানা ঝেঁটিয়ে গালি খাও! নাম না রে বাবা!

শিউ ॥ এই নামছি।

[মহারাজেরই সমবয়সী পাড়ার ছেলেরা ইস্কুল থেকে ফিরল। বইখাতা ঝপাঝপ রোয়াকে নামিয়ে রেখেই তারা গলিটাকে ক্রিকেট-পিচ-এ পরিণত করার উদ্যোগ করলো। তাদের দেখে মহারাজ আধখানা কুলপি ধূলোয় ফেলে ম্যানহোল দিয়ে নামতে সুরু করলো।]

শিউ ॥ কি হল ?

মহারাজ ॥ ঐ ছেলেগুলো ভারী পাজী! সেদিন বস্তীর মুখে ওদের দুটোকে ধরে আমরা ঠেঙিয়েছিলাম! ঘুড়ি কেড়ে নেবে!

[সে নেমে যায় অন্ধকূপে। চিদানন্দবাবু হেরে গেছেন, ঘোড়ার চালটা বুঝতে না পেরে মাৎ হয়ে বোকার মতন হাসছেন; অবিনাশবাবু জয়ের তুষ্টিতে তাঁকে দাবার অ-আ-ক-খ বোঝাচ্ছেন। সুরেনবাবু ঘরে গেছেন; কিন্তু সুদর্শনবাবু বেরিয়ে এসে অপলক নেত্রে ও-বাড়ির ছোট বউকে দেখছেন। ছোট বউ সেটা বুঝতে পেরেও যাচ্ছে না; গায়ের কাপড় একটু টেনে নিয়ে সে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শূন্যে। অলক আর সমীর যাচ্ছিল বাঁশি শুনতে, ছেলেদের ক্রিকেট দেখে একটু দাঁড়িয়ে যায়। শিউনন্দন বালতিতে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেয় ভেতরে। তারপর সে-ও কুলপি কেনে। খাচ্ছিল আয়েস করে, মেঘলা দিনের আমেজটাও তাকে জড়িয়ে ধরেছিল সলজ্জ বারবনিতার মতন। এমন সময় ম্যানহোল থেকে জেগে ওঠে একটা চীৎকার। ছেলেরা খেলা বন্ধ করে। অবিনাশবাবু গুটি সাজাতে সাজাতে হাতে মন্ত্রী নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। বউটিও তাকায় চমক ভেঙে। শিউ-এর হাত থেকে কুলপি পড়ে যায়। সে ছুটে যায় ম্যানহোলের মুখে; মাথাটা ঝুকিয়েই সে কেশে ফেলে কাঠ-চেরা শব্দ করে—তাই সে পিছিয়ে যায়। নাকে গামছা বেঁধে সে আবার ঝোঁকে]

শিউ॥ এই মহারাজ! মহারাজ! কি? গ্যাস?

[নীচ থেকে মহারাজ যা বলে আমরা শুনতে পাই না কিন্তু শিউনন্দন শুনতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে]

এক মিনিট! চুপ করে শুয়ে থাক্; তোকে এখুনি তুলে নিচ্ছি।...

[মহারাজ আরো কিছু বলছে, ওর অস্ফুট কথা একটা গোঙানির মতন শোনাচ্ছে। গলির বাসিন্দারা এখনো ব্যাপারটা সম্যক বুঝতে পারেন নি, তাই তারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন]

আরে বাবা, এখুনি আসছি, লোক ডাকতে হবে তো, নাকি?

[এই বলে চলে গেল শিউনন্দন। ছেলের দল এবার এগিয়ে আসে হুড়মুড় করে, ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে ভেতরে]

ছেলেরা॥ শুয়ে আছে কাদায়—

—ওটা হাত; ওটা পা—

—ঐ যে মাথা—

—দূর, ওটা পাছা, মাথা ঐদিকে—

[ছোট বউটি কাকে যেন ডাকে, কক্ষাভ্যন্তর থেকে দু কাপ চা হাতে বেরিয়ে আসেন বড় জা, এক কাপ দেন ছোট বউকে, আরেক কাপে শব্দ করে তৃপ্তির চুমুক দিয়ে দেখেন রাস্তায় কি ঘটছে। ছেলেদের বাবারাও উঠে পড়েছেন, এগিয়ে এসেছেন সদলবলে ব্যাপারটার রহস্য-ভেদ করতে]

অবিনাশ॥ অমন মটকা মেরে পড়ে আছে কেন?

সুদর্শন॥ থেকে থেকে কাশছে।

চিদানন্দ॥ নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

অলক ॥ মরে যাবে নাতো ?

সুরেন ॥ কি ঝামেলা ! পাড়ার মধ্যে ঢুকে এভাবে—

[পোর্টফোলিও হাতে এক ভদ্রলোক পথ বেয়ে অতি দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন, মহানগরীর অর্থহীন ব্যস্ততার ছাপ অঙ্গে মেখে। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে ব্যবসা ভুলে তিনি দেখতে সুরু করলেন]

পোর্টফোলিও ॥ কখন আটকালো ?

নিতাই ॥ এই তো।

সমীর ॥ কিন্তু ব্যাপারটা কি ? পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে ?

অলক ॥ পা স্লিপ করে—

সুদর্শন ॥ না, না, গ্যাস, কাদায় বার্ণিশ মারতেই—

চিদানন্দ ॥ কি গ্যাস ?

সুদর্শন ॥ কয়লাখনিতেও থাকে—কি যেন নাম ?

পোর্টফোলিও ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরকমটা হয়। সালফারের সঙ্গে জল মিশে হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসের—মানে ওরকমটা হয়।

[সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করেন]

নিতাই ॥ মশাই বোধকরি রাসায়নিক।

[দেখতে দেখতে দোতলার বারান্দাগুলো ভরে গেছে বহু কৌতূহলী মহিলায় ; ও বাড়ির অসূর্যম্পশ্যা খাঁদার মাও ঘোমটা খুলে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়েছেন। আর গলির জনতা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে ; অফিস ফেরৎ ভদ্রলোকেরা জলখাবার না খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। আটের দুইয়ের ডি বাড়ি থেকে বেরুলেন অতিবৃদ্ধ শ্যামসুন্দরবাবু, নাতির হাত ধরে ধুক ধুক করে এগিয়ে এলেন ম্যানহোলের ধারে, ঝুঁকেই মনে পড়লো চশমা আনেননি]

শ্যামসুন্দর ॥ ওরে দাদুভাই, চশমাখানা ফেলে এসেছি টেবিলের কোণায়, নিয়ে আয় না !

[চিদানন্দবাবু নাস্যি নিচ্ছিলেন তাই অবিনাশবাবু উপদেশ দিলেন]

অবিনাশ ॥ দেখবেন, ম্যানহোলের ভেতরে নস্যির গুঁড়ো না পড়ে।

পোর্টফোলিও ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশেষ করে যখন লাংস ল্যাসেরেটেড হয়ে আছে, তখন আবার নস্যির গুড়ো গিয়ে—মানে স্ট্র্যাংগুলেশন হলেও—মানে হওয়া আশ্চয নয়।

নিতাই ॥ মশাই বোধকরি ডাক্তার।

[ভীড় এবার সত্যই বৃহদাকার ধারণ করেছে। ওরই মধ্যে একটু ধাক্কাধাক্কি, একটু বচসা হচ্ছে]

একজন ॥ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন পিঠে, শিরদাঁড়ায় লেগেছে—

দ্বিতীয় ॥ তা আপনিই বা অমন আষাঢের মেঘের মতন সবটা আগলে থাকবেন কেন ?

তৃতীয় ॥ এ্যাই, এ্যাই, এ্যাই মশাই, আপনি আমার পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, জানেন ?

চতুর্থ ॥ তা, একটু সরে দাঁড়ান না। স্টেটবাসের বাদুড়ঝোলার অবস্থা।

তৃতীয় ॥ উঃ, পেছন থেকে পায়ের ডিমে বুট শুদ্ধ এক লাথি কষালো।

চতুর্থ ॥ আপনি মশাই বড়ো ঠুনকো।

চিদানন্দ ॥ উঃ, এক ধাক্কায় আমাকেও ম্যানহোলে ফেলেছিলেন যে।

অবিনাশ ॥ এত ভীড় কেন ? এ কি ?

দক্ষিণেশ্বর ॥ এই মশায়রা, এখানে দেখার কি আছে ?

পঞ্চম ॥ তা আপনিই বা এখানে কি দেখছেন ?

দক্ষিণেশ্বর। আমাদের কথা আলাদা। আমরা পাড়ার লোক। একটা দায়িত্ব আছে।

চতুর্থ॥ রাস্তাটা তো আপনার সম্পত্তি নয়।

[অলক আর সমীর এবার অবস্থা আয়ত্বে আনার কাজে লাগে। লক্ষ্য তাদের দোতলার বারান্দাগুলোর দিকে]

সমীর॥ দাদারা, একটু সরে সবে, সবে সবে, ওপর থেকে মা-বোনেরা দেখছেন।

[দাদুভাই চশমা নিয়ে আসতে শ্যামসুন্দর সেটা এঁটে ফেলে দৃঢ়পদে নাতির হাত ধরে ভীড় ভাঙতে সুরু করলেন।

অলক॥ মশায়রা, একটু পিছিয়ে, ঠেলা মারবেন না। দাদুকে পথ করে দিন।

[অলকের সাহায্যে ম্যানহোলের ধারে পৌঁছে দাদু ঠাওর করেন, কিন্তু হতাশ হন]

শ্যামসুন্দর॥ কাদায়, কালো রং-এ মাখা-মাখি, কিছু বোঝার উপায় নেই।

[কিন্তু নাতির নবীন চোখে মহারাজের দেহ শুধু দৃশ্যমান নয়, একগাদা প্রশ্নও.]

নাতি॥ দাদু, ও শুয়ে আছে কেন?

শ্যামসুন্দর॥ কিছু না, আবার উঠে আসবে।

নাতি॥ ওর গায়ে জামা নেই কেন?

শ্যামসুন্দর॥ ওরা গরিব, তাই জামা নেই।

নাতি॥ গরিব কেন?

শ্যামসুন্দর॥ মেথরের ছেলে, তাই গরিব।

নাতি॥ ও ইস্কুলে যায় না কেন?

শ্যামসুন্দর॥ গরিব কিনা, তাই যায় না।

নাতি ॥ গরিব কেন ?

[প্রশ্নগুলো ক্রমশঃ বেয়াড়া রকমের হয়ে উঠছে দেখে শ্যামসুন্দর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।]

শ্যামসুন্দর ॥ ওকে তোলা হচ্ছে না কেন ?

অবিনাশ ॥ সঙ্গে আরেকটা মেথর ছিল। সে লোক ডাকতে গেছে।

শ্যামসুন্দর ॥ মরে যাবে যে ! আমরাই একটু কষ্ট করে—

নিতাই ॥ ব্যাপারটা বিপজ্জনক। নীচে হাইড্রোক্লোরাইড গ্যাস—মানে ইনি বলবেন—

[বলে তিনি পোর্টফোলিওকে দেখিয়ে দেন]

পোর্টফোলিও ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেফটি-র কাজে নানাধরনের যন্ত্রপাতি—মানে গ্যাস্‌মাস্‌ক আর অক্সিজেন—অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেণ্টস্ লাগে।

নিতাই ॥ মশায় বোধকরি কয়লাখনির অফিসার।

[শিউনন্দন একজন কনস্টেবল জোগাড় করে এনেছে। একজন অতি শীর্ণ কনস্টেবল। বিরাট লাল পাগড়ীটা রোগা দেহে অত্যন্ত বেমানান]

কনস্টেবল্ ॥ হঠ যাও, হট যাও, দেখতে হলে লাইন লাগাও। এসব ধাক্কাধাক্কি চলবে না।

শিউ ॥ এই গর্তে।

[কনস্টেবল অন্ধকারে দৃষ্টি চালিত করে]

কনস্টেবল্ ॥ এই ছোকরা, উঠে আয় না ! ওখানে পড়ে থেকে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস ?

শিউ ॥ তোমার কেমন কথা পুলিসসাহেব ! উঠতে পারলে ও শখ করে ওখানে পড়ে আছে ?

কনস্টেবল্ ॥ সে সব আমি কিছু জানি না। এখানে ভীড় জমে যাচ্ছে সব ঐ ছোকরার জন্যে। সরুন, সরুন, এখানে দাঁড়াবেন না।

শিউ ॥ ওকে কি করে তুলবো বলুন।

কনস্টেবল্ ॥ সে আমি কি জানি ? আমাকে থানা থেকে পাঠিয়েছে এখানে ভীড় কণ্ট্রোল করতে। তোল্লাতুল্লির আমি কি জানি ?

পোর্টফোলিও ॥ তা বলে চোখের সামনে একটা লোক মরে যাবে ? আপনারা হলেন জনসাধারণের ভৃত্য, তাই আরো কনস্টেবল্ ডেকে—

কনস্টেবল্ ॥ কনস্টেবল্ পাবো কোথা ? ময়দানে মিটিং আছে যে। আঃ মশায়রা, দেখাব এখানে কি আছে ?

এক ব্যক্তি ॥ বাঃ, সবাই দেখছে, আমি দেখলেই দোষ ?

কনস্টেবল্ ॥ দেখতে চান তো লাইনে দাঁড়ান, যান। এই, ওকে তাড়াতাড়ি তোলার ব্যবস্থা কর, নইলে এখানে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড হয়ে যাবে।

শিউ ॥ আপনি মদৎ না দিলে কি করে তুলব হুজুর ?

কনস্টেবল্ ॥ আমি কি করে মদৎ দেব ? আমি কি হরিজন উদ্ধার সমিতি খুলেছি, না আমার বাপের দড়ির কারখানা আছে ? এ্যাঃ, কি বোঁটকা গন্ধ !

শিউ ॥ বাবুসাহেবরা, আপনারা একটু সাথ দিলে আমিই ওকে তুলে আনতে পারি, এটুকু তো শরীর।

এক যুবক ॥ এই ন্যাড়া, চল চল, রীলে-র সময় হয় গেল।

শিউ ॥ বাবুজী, একটু মদৎ দিন, হাল্কা বাচ্চা, বাবুজী—

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, ওখানে সেঁধিয়ে পৈতৃক প্রাণটা ওখানেই রেখে আসি—

শিউ ॥ পায়ে ধরছি, বাপুজী।

অবিনাশ ॥ এই ছুঁবিনে বলছি। মেথর !

পোর্টফোলিও ॥ আপনাদের মশাই এইসব ব্যাকওয়ার্ড আইডিয়াজ কেন বলুন তো।

চিদানন্দ ॥ ও বাবা, মশাই দেখছি একেবারে কমিউনিস্ট। তা দেখান না আপনার উদারতা। কোটটা খুলে নামুন না আপনার কমরেডের সঙ্গে।

[অনেকেই হেসে ফেলেন]

পোর্টফোলিও ॥ সেটা তো প্র্যাকটিকেব্‌ল্‌ একটা ব্যাপার নয়। ভদ্রলোকের ছেলে, নফর কুণ্ডু হবার শখ নেই।

অলক ॥ আমি নামবো, চল্‌।

শিউ ॥ নামবেন ?

অলক ॥ হ্যাঁ।

সুরেন ॥ অলু, তোর বাবাকে বলেছিস ?

অলক ॥ বাবা কিছু বলবেন না।

চিদানন্দ ॥ এসব হচ্ছে গ্যালারি-প্লে। মেয়েছেলেরা দেখছে, তাই।

[অলক কামিজ খুলে বুকের পাঁজর মেলে ধরে। কিন্তু প্রচণ্ড বাধা আসে কনস্টেবল-এর কাছ থেকে।]

কনস্টেবল্‌ ॥ এ্যাই, এ্যাই, কাউকে নামতে দেব না আমি, কাউকে না। শেষকালে জোড়া মড়া তুলতে হবে, ওর মধ্যে আমি নেই। ভেতরে গ্যাস আছে।

পোর্টফোলিও ॥ এই, কর্পোরেশনে টেলিফোন করো না!

শিউ ॥ টেলিফোন ?

দক্ষিণেশ্বর ॥ তার চাইতে সৎকার সমিতিতে খবর দিলে দুটো মুদ্দোফরাস পাঠিয়ে দেবে'খন, হিঁচড়ে তুলে নেবে।

সুদর্শন ॥ না, না, সৎকার সমিতির রুল আছে, মরে না গেলে মুদ্দোফরাস পাঠায় না। এ তো বেঁচে রয়েছে।

সুরেন ॥ জিরো ডায়াল করে এম্বুলেন্স ডাকলেই হয়।

সুদর্শন ॥ কি যে বলেন! এম্বুলেন্স-এর লোক ভেতরে নামবে কেন ?

পোর্টফোলিও ॥ সবচেয়ে আগে ফোন করা দরকার দমকলে, ওরা এসে—

[ভেতর থেকে আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার ফেটে পড়ে, শিউনন্দন অধীর হয়ে ওঠে]

শিউ ॥ কাছে টেলিফোন কোথায় আছে হুজুর—

[সকলে সমস্বরে বোঝাতে প্রয়াস পান, ফলে কিছুই বোঝা যায় না]

পোর্টফোলিও ॥ (ধমকে) আস্তে !—এগিয়ে বাঁহাতে গেট-ওয়ালা বাড়ি।

[শিউনন্দন ছুটে চলে গেল। যারা গর্তের মধ্যে দৃষ্টিপাত করছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল]

—নড়ছে ! নড়ছে ! নড়ছে ! নড়ছে ! নড়ছে !

[মহিলারা বারান্দা থেকে ম্যানহোলের অভ্যন্তর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারা এবার দলে দলে পথে বেরিয়েছেন ভীড় ফাঁক হয়ে গেল, তারা এসে দেখে যাচ্ছেন]

—ঐ ছ্যাখ, নীরা, তালগোল পাকিয়ে গেছে—

—পাড়ার মধ্যে এসব !

—ওখানে মরে থাকলে কি হবে ?

—এ মা, কি গন্ধ !

অবিনাশ ॥ 'আমার মনে হয় ও বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে রাখা ভাল।

—রুমালে নাকটা ঢেকে নে, রমা !

—মাগো, মরার আর জায়গা পায় না এরা ?

[একদল যুবক উত্তেজিত হয়ে মহিলাদের দেহসৌষ্ঠব লক্ষ্য করতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে করতে লাগলো আদিরসাত্মক আলোচনা]

চানাচুরওয়ালা ॥ আইয়ে বাবু মজেদার চানাচুর গরম !

[চায়ের দোকানে ভীড় অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যাওয়ায় আনন্দবাবু গলদঘর্ম অথচ স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল। এত খদ্দের একসঙ্গে কখনো তিনি দেখেন নি]

আনন্দ ॥ দু নম্বরে ডবল হাপ আর দুটো টোস্ট, ছ নম্বরে তিন কাপ চা !

চানাচুরওয়ালা ॥ পাঁচমিশালি এক আনা, মুম্বইওয়ালা এক আনা !

[পাড়ায় থাকেন দুই অধ্যাপক, বিরলকেশ সুহাসবাবু আর অবিন্যস্ত কেশ খগেনবাবু। কলেজ থেকে ফিরে আনন্দবাবুর দোকানে চা খেয়ে বাড়ি যাবেন, দেখেন ভীড়।

খগেন ॥ চলুন দেখি গে, যাওয়া উচিত। নো ম্যান ইজ এন আইল্যাণ্ড। পাড়ায় যা ঘটছে তা আমাদেরই ব্যাপার।

সুহাস ॥ ঐ ভীড়ে যেতে আমি রাজী নই। সমাজ-চেতনা-ফেতনা খুবই ভাল কথা, কিন্তু ঐ ভীড়ে ঢুকে আমার ইণ্ডিভিজুয়্যালিটি হারাতে আমি রাজী নই।

খগেন ॥ বাঃ লোকের সঙ্গে মিশলে যে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায় তা থেকেই বা কি লাভ ?

সুহাস ॥ সে আপনি বুঝবেন কি ক'রে ? ভেড়ার পালের গোষ্ঠি-চেতনা আপনার মধ্যে বড় প্রবল।

[একগাল হেসে সুহাসবাবু চা খেতে যান ; খগেনবাবুও তাঁকে অনুসরণ করেন তর্ক করতে করতে—কির্কেগার্ড-এর নামটা শোনা যায় এক-আধবার। শিউনন্দন ফিরে এল]

কাগজওয়ালা ॥ টেলিগ্রাম ! জোর খবর। নেতাজী আ গয়া !

পোর্টফোলিও ॥ ফোন করেছ ?

শিউ ॥ হাঁ হুজুর ! সাহেব বললেন, নিজের মুখে বললেন, ক'রে দেবেন !

সুরেন ॥ ও সাহেবটাহেবদের বিশ্বাস নেই, বড়লোক তো! চিদানন্দবাবু, আপনার ফোনটা ইউজ করতে দিন না।

চিদানন্দ ॥ অসুবিধে আছে। শোবার ঘরে ফোন। মেয়েছেলেরা আছে।

গণক ॥ হস্তরেখা বিচার, ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান নখদর্পণে!

[সাইকেলে চড়ে এক কর্পোরেশনের কর্মচারী এসে পড়েন—হাপ-প্যাণ্ট ও মোজা পরেন। এসেই তিনি নোটবই-পেন্সিল বার করে ফেলেছেন।]

কর্পোরেশন ॥ এই, নম্বর কতো?

শিউ ॥ হুজুর আমার নম্বর তিন দুই সাত।

কর্পোরেশন ॥ আঃ, তোর নয়, ওর।

শিউ ॥ হুজুর, আট দুই দুই।

[নম্বরটি লিখে নিয়ে কর্মচারী সাইকেলে চড়ার উপক্রম করেন।]

পোর্টফোলিও ॥ ও দাদা, ছোকরাকে তোলার কি হবে?

কর্পোরেশন ॥ সে ব্যাপারে কোনো ইনস্ট্রাকশন পাইনি।

[সাইকেলে চড়ে তিনি চলে গেলেন। অলক ফিরে এল ছুটতে ছুটতে।]

অলক ॥ ডাক্তারবাবু আসতে পারবেন না, কেস আছে, বেরিয়ে যাচ্ছেন!

অবিনাশ ॥ অত বড় ডাক্তার, সময় কোথায় বলুন।

পোর্টফোলিও ॥ না, এ ব্যাপারে সময় নেই, কিন্তু অতি-ভোজনের ফলে মারোয়াড়ী কোটিপতির পেটের অসুখ হলে সময় হোতো!

[অনেকে হেসে উঠলেন]

কি আর করা যাবে? ডিস্‌পেনসারির ডাক্তারবাবুকেই ডাকা হোক।

[অলক আবার ছুটে চলে যায়]

ফলওয়ালা ॥ লেমো, লেমো !

চানাচুরওয়ালা ॥ লে যাও বাবু এক আনা, চানাচুর গরম !

দক্ষিণেশ্বর ॥ আচ্ছা, কাউন্সিলর হরিসাধনবাবুকে খবর দেয়া যাক না। অমায়িক লোক।

সুরেন ॥ ওঁকে পাবেন কোথায়? জব্বলপুর গেছেন এ আই সি সিব মিটিঙে।

দক্ষিণেশ্বর ॥ এঃ হে, থাকলে আর ভাবতে হোতো না !

পোর্টফোলিও ॥ আপনাদেব কাউন্সিলবকে চিনি না, আমাদের এলাকাব কাউন্সিলর হলেন রবি নাগ, নাম শুনেছেন ?

নিতাই ॥ ভেগলি।

পোর্টফোলিও ॥ অগ্নিযুগে জেল-টেল খেটেছেন। খদ্দর পরেন। ইংবিজি জানেন, কিন্তু বলেন না। বাংলায় চেক সই করেন। সিগাবেট খান না, খান বিড়ি। সেদিন দেখা কবতে গেলাম; বিড়িটা বেরুলো কোত্থেকে জানেন ? সোনার কৌটো থেকে।

[অনেকে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন]

নিতাই ॥ মশাই বোধ করি পোলিটিসিয়ান।

[অলক ডাক্তারবাবুকে পথ দেখিয়ে আনে]

চিদানন্দ ॥ এই যে, এসে গেছেন, দেখুন তো দিকি।

[ডাক্তার ঝুঁকে এক ঝলক দেখে নিলেন]

ডাক্তার ॥ দেখলাম। কি করতে হবে আমাকে ?

পোর্টফোলিও ॥ কেমন দেখলেন ?

ডাক্তার ॥ বলবো ? যদি ইনফ্লামাটরি একসুডেট হয়ে থাকে, তা হলে এ্যাফিকসিয়া হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাবাড়।

সুদর্শন ॥ কি বললেন ?

ডাক্তার ॥ থাক, আর বুঝে কাজ নেই।

পোর্টফোলিও ॥ ও কি? চলে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান! এক্ষুনি তোলা হবে। ফার্স্ট এড দিতে হবে।

ডাক্তার ॥ এ কেসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড কিস্যু নেই। প্রচুর টাকা লাগবে। আপনারা দেবেন?

পোর্টফোলিও ॥ আহাহাহা, আপনারা এত ক্যালাস হলে চলে কি করে? আর্তদের সেবা করার একটা শপথ নিতে হয় না ডাক্তারদের? হিপ্যোক্রটিক ওথ?

ডাক্তার ॥ সেবা করতে তো রাজিই আছি। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস বাড়াতে হবে, যাতে গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে পারে। সেজন্য শতকরা সাত ভাগ কার্বন-ডাই-অকসাইড আর তিরানব্বই ভাগ অকসিজেনের মিকসচার ইনহেল করাতে হবে। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করে টাকা কটা ফেলে দিলেই তো হয়।

[সকলে ভাব অস্বস্তিতে ঘামতে থাকেন]

কি হল? দয়া মায়া আর্তসেবা শেখাচ্ছিলেন না? আপনি দেবেন? আপনি? আবার ঐ এসফিকসিয়া সেট ক'রে গেলে তক্ষুনি অকসিজেন দিতে হবে। কই, কোনো উচ্চবাচ্য নেই যে বড়ো?

[ডাক্তার রওনা দিলেন; কিন্তু দুপা গিয়ে আবার ফিরে আসেন হুংকার ছেড়ে।

আর এলভোলার এপিথিলিয়ামে অলটারেশন হলে অকসিজেন টেণ্ট আর নেজাল ক্যাথিটার ব্যবহার করতে হবে। বোঝেন কিচ্ছু? দেবেন খরচ? আমার ফিটা তো না হয় ছেড়েই দিলাম।

শিউ ॥ আর বাচ্চাটার যে জান নিয়ে টানাটানি হুজুর।

ডাক্তার ॥ কেন হয় অমন একসিডেণ্ট? অমন দামী দুর্ঘটনা ধাঙড়-মেথরের হওয়া উচিৎ নয়।

[শিউনন্দন বিশ্বময় সকল হুজুরের পাদস্পর্শে বিশেষ তৎপর। সে চকিতে ডাক্তারবাবুর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]

শিউ॥ হুজুর, দয়া করুন, হুজুর—

ডাক্তার॥ একি? ব্ল্যাকমেল নাকি? ছাড়, পা ছাড়!

[বলে ডাক্তার হন হন করে খানিক এগিয়ে গেলেন; সেখান থেকে বললেন—]

তার চেয়ে ওলাইচণ্ডীর পুজো দে শস্তায় হবে।

[ডাক্তার চলে গেলেন।]

অবিনাশ॥ আমরা ছা-পোষা, অত টাকা পাবো কোত্থেকে?

শিউ॥ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

ক্যানভাসার॥ এই যে, আসুন, ধন্বন্তরী মলম—কাটা ছেঁড়া ঘা দাদ খোস পাচড়া মাথাধরা দাঁত কটকট প্রভৃতি ইত্যাদি যাবতীয় সর্বরোগে অব্যর্থ—মাত্র দু আনায় পাবেন, দু আনায়!

গণক॥ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান।

চানাচুরওয়ালা॥ লে যাও বাবু এক আনা!

—এই প্রণতি, চল না, কতক্ষণ দাঁড়াবি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল, কুমারদা এতক্ষণে তবলা ফাঁসিয়ে দিয়ে বসে আছে।

—চল প্রণতি, আমায় এখনো চারটে নাচ তুলতে হবে।

[ওরই মধ্যে আবার এক পকেটমার ধরা পড়ল। আশেপাশের সবাই তাকে কিঞ্চিৎ প্রহার করে নিজের নিজের ব্যাগ সামলাতে লাগলেন। কনস্টেবল এসে পকেটমারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললেন। যাওয়ার সময়ে শিউনন্দনকে কি সব বলে গেলেন গোলমালে শোনা গেল না, তবে, বোঝা গেল যে, এই প্রচণ্ড ভীড় জমে যাওয়ার জন্যে তিনি দায়ী করছেন শিউকে।]

লক ॥ গত শতাব্দীর মাঝামাঝি দমকলকে খবর দেয়া হয়েছিল না? শালারা মরল নাকি?

চিদানন্দ ॥ আরে, ওদের কথা ছাড়ো না। ১৯৭২ সাল নাগাদ প্রস্তাবটা উঠবে বিধানসভায়, তাও বিরোধী পক্ষের এডজোর্নমেণ্ট মোশনে। পাশটাশ হবে। তখন হুকুম হবে—হ্যাঁ, গত '৬২ সালের গোড়ার দিকে শিবু ডাক্তার লেনের মোড়ে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে অবিলম্বে দমকলকে পাঠানো উচিত।

[অনেকেই অট্টহাস্য করলেন।]

পার্টফোলিও ॥ হ্যাঁ, এসব কেসে দমকলের একটু দেরী হবেই। ফায়ার ফাইটিং সার্ভিসকে হঠাৎ এ কাজে লাগাবার আগে, মানে পাবলিক সেফটি এক্ট-এর তিন নম্বর ধারা না মেনে—মানে মেনে নিয়ে—ইউনিফর্মের ব্যাপারটা—

নিতাই ॥ মশাই বোধ করি উকিল।

সুরেন ॥ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও বড়লোকের বাচ্চা টেলিফোন করেনি! অলক, ডিসপেন্সারি থেকে আরেকটা করো তো!

[অলক ছুটে চলে গেল। এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন একদল প্রেস রিপোর্টার, তৎসহ কয়েকজন ফটোগ্রাফার। "কই কই" শব্দে তাঁরা দৌড়ুতে দৌড়ুতে ম্যানহোলের কাছে পৌঁছুলেন। এবং পরমুহূর্তে খটাখট শব্দে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলতে শুরু করে; ক্ষণপ্রভায় উদ্ভাসিত হতে থাকে শিউনন্দনের মুখ। সে নিতান্তই অশিক্ষিত, তাই বিমূঢ় হয়ে যায়। লিকলিকে একজন রিপোর্টার প্রথম প্রশ্নবাণ জ্যামুক্ত করতে শুরু করেন।]

লিকলিকে ॥ পড়ল ঠিক কখন?

শিউ ॥ এই চারটে হবে।

[শিউনন্দনের জবাবগুলো খর খর শব্দে চোদ্দখানা নোটবই-এ একযোগে লেখা হতে থাকে।]

লিকলিকে ॥ কেমন করে পড়ল ?

শিউ ॥ হুজুর, গ্যাস খেয়ে।

লিকলিকে ॥ নিচে নেমে গ্যাস খেয়ে পড়ল, না গ্যাস খেয়ে নিচে পড়ে গেল ?

শিউ ॥ জী, হাঁ।

লিকলিকে ॥ ঠিক করে বলো।

শিউ ॥ হুজুর···গ্যাস খেল আর পড়ল।

লিকলিকে ॥ পড়ার সময়ে কি বলল ?

শিউ ॥ জী ?

লিকলিকে ॥ কি বলল ? বলল কি ?

শিউ ॥ হুজুর, বলবে কি ?

লিকলিকে ॥ মানে একটা কিছু বলল তো। ধরো, গ্যাস খেয়েছি, বা—

শিউ ॥ হাঁ, মানে, না তা বলেনি।

লিকলিকে ॥ তবে কি বলল ?

শিউ ॥ জানি না, হুজুর।

লিকলিকে ॥ দুৎ, কিস্সু মনে রাখতে পারে না।

আরেকজন ॥ বলল না—বাঁচাও, আমায় বাঁচাও ?

শিউ ॥ না, হুজুর—

লিকলিকে ॥ (ধমকে) ভাল করে ভাবো।

শিউ ॥ হ্যাঁ, হুজুর।

লিকলিকে ॥ গুড ! (লিখতে লিখতে) বাঁচাও, আমায় বাঁচাও !

[একজন অত্যন্ত রাশভারী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারসহ ভীড় ঠেলে এসে পড়েন। তাঁকে দেখে অন্যান্য রিপোর্টাররা সংকুচিত হয়ে পড়েন।

লিকলিকে ॥ দাদা স্বয়ং।

রাসভারী ॥ ঘাবড়াও মৎ; বেশি কিছু লিখবো না। এই যে "ওরিয়েন্ট," রিপোর্টার কই?

ওরিয়েন্টের ফটোগ্রাফার ॥ আগ্যে আমাদের কাগজকে তো চেনেন। ছবি ছাড়া আর কিছুই ছাপবে না।

রাসভারী ॥ আর "কালান্তর"? দেখছিলাম তোমাদের কাণ্ডকারখানা। একটা স্টোরির প্রাণ হচ্ছে একটা হিউম্যান এঙ্গল, যার থাকবে সার্বজনীন আবেদন; যা পড়ে লোকের চোখের পাতাটা একটু ভিজে উঠবে।

লিকলিকে ॥ কি আপনি বলছেন দাদা, বুঝতে পারছি না। আমি যে এঙ্গল নিয়েছি, মানে গ্যাস খেয়ে ছেলেটা বলে—বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

রাশভারী ॥ আরে ছোঃ! তোমাদের আর বালব নেই তো? তাহলে বলি। আমার কাছে একখানা ছবি ছিল হে—

[দাদার গলা নেমে এসেছে; সাংবাদিকরা ভীড় করে শুনছেন।]

চিনাকুড়ি খনি-দুর্ঘটনার। ছেলে মরে গেছে খবর পেয়ে নির্বাক শোকাহতা মায়ের ছবি। সেইটে সুপারইম্পোজ করবো এই ম্যানহোলের ভীড়ের ছবির উপর। নিচে ছোট্ট একটি লাইন—মণিহারা! ঐ নির্বাক মাতাই হবে আমার গল্পের নায়িকা।

[এই বলে দাদা তাঁর ফটোগ্রাফারকে নানা উপদেশ দিতে থাকলেন; শিউনন্দনের হাতখানাকে কপালে চেপে ধরতে বলে ছবির বাস্তবতাটাকে আরো নিশ্চিত করে তুললেন। অন্যান্য সাংবাদিকরা সপ্রশংস ও স-ঈর্ষা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকলেন। দাদা হাঁকলেন—]

ক্যামেরা!

[ফ্ল্যাশ বাল্‌ব বিদ্যুৎ হানল। এমনি সময়ে ম্যানহোল থেকে একটা কাতরোক্তি উত্থিত হতে সবাই থেমে গেলেন এবং ভীড়ের মধ্যে গুঞ্জন ছড়াতে লাগল—]

—গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে—

[দমকলের ঘণ্টাও শোনা গেল সেই সঙ্গে। দমকলের কর্মীরা যখন কদমাক্ত বীভৎস শীর্ণ ছোট দেহখানা তুলে আনল, তখন মহারাজ মরে গেছে। চোখদুটো খোলা, শাদা, আর মুখখানা হাঁ-করা। নিঃশ্বাস নিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল মহারাজ, কারণ মানুষ মরতে চায় না।]

———

|| চরিত্র ||

শিবচরণ

বিশ্বনাথ

যা তারা পারে নি

|| কিরণ মৈত্র ||

[কোলকাতার কোন এক জনবিরল গলি। রাত ১১টা ১২টা, প্রচণ্ড শীত পড়েছে। একটা গ্যাস পোস্টের টিমটিমে আলোয় জায়গাটা আলোকিত। দূব থেকে মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। নিস্তব্ধ নিশ্চুপ পরিবেশ। অতি শীর্ণ জীর্ণ এক মানুষের প্রবেশ। তার নাম শিবচরণ। বয়েস ৫০ পেরিয়েছে। গাল দাড়িতে ভরা। চুলগুলো উসকো খুসকো। তেল পড়েনি অনেক দিন মাথায়। চোখ কোঠরে ঢুকেছে। পা খালি। ছেঁড়া, ময়লা কাপড় পরণে। গায়ের ফতুয়াটার অবস্থাও তথৈবচ। মস্তিষ্ক অল্প বিকৃত যেন। দামী কম্বল একটা গায়ে জড়ানো আছে। শিবচরণ গ্যাসপোস্টের তলায় বসল। কম্বলটা গায়ে জড়ালো ভালো করে। আবার খুলল। ভালো করে দেখল। পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল মুখে। পকেট থেকে বিড়ি বার করে টান দিল ক'টা আবামে। তারপর শীতে কাঁপা কাঁপা গলায় গান ধরলো—হরি পার করো আমারে···। বাইরে থেকে কুকুরটা ডেকে উঠল।]

শিবচরণ ॥ আঃ, একটু মনের আনন্দে গান গাইব শালা কুকুরগুলোর জ্বালায় হবার উপায় নেই। যতো সব !

[শিবচবণ পরিতৃপ্তিতে কম্বল আরও ভালো করে জড়াল। ঘন ঘন বিড়িতে টান দিতে লাগল। আর একজন ঢুকল। নাম বিশ্বনাথ। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, লুঙ্গির মত কাপড় পরা। দেখলে গুণ্ডা শ্রেণীর মানুষ বলে মনে হবে। শিবচরণকে দেখে থমকে দাঁড়াল। গায়ের কম্বলটা তার ভালো করে দেখল। বিড়ি বার করলো একটা। তারপর শিবচরণের কাছে এগিয়ে এল।]

বিশ্বনাথ ॥ এই !

শিবচরণ ॥ (প্রায় চমকে) অত জোরে হাঁক পাড কেন ? পিলে চমকে যায়। পাহারাদার নাকি ?

বিশ্ব ॥ না। দেশলাই আছে ?

শিব ॥ আছে।

বিশ্ব ॥ দাও—বিড়িটা ধরাই।

শিব ॥ (পকেটে হাত দিযে) নেশা করতে পার আর দেশলাই রাখতে পারো না ?

বিশ্ব ॥ অত কথায় কাজ কি ? যদি থাকে দাও।

শিব ॥ (দেশলাই দিয়ে) এই নাও। দেখ আবার পকেটে ফেলো না।

বিশ্ব ॥ অত ছোট জিনিসে আমার নজর নেই।

[বিড়ি ধরিযে দেশলাই ফেরৎ দিল।]

শিব ॥ আহা জলন্ত কাঠিটা আমার গাযে ফেলছ কেন ? কম্বলটা পুড়ে যাবে না ?

বিশ্ব ॥ বেশ দামী কম্বল দেখছি।

শিব ॥ আমি মানুষটা কম দামী নাকি ?

বিশ্ব ॥ কোত্থেকে পেলে !

শিব ॥ তোমাকে বলব কেন ?

বিশ্ব ॥ চুরি করেছ ?

শিব ॥ ধ্যেৎ, আমি চোর নাকি ? চোরদের আমি ঘেন্না করি।

বিশ্ব ॥ তোমার ঘেন্নায় চোরদের ভারি বয়েই গেল ! তুমি তাহলে কি ?

শিব ॥ (গর্বের সঙ্গে) আমি ভিখিরী।

বিশ্ব ॥ ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না ?

শিব ॥ স্বাধীন ব্যবসা করি, লজ্জা কিসের ?

বিশ্ব ॥ এমন কম্বল কেউ ভিক্ষে দেয় ?

শিব ॥ দেবে না কেন? বেড়ালের ভাগ্যেও শিকে ছেঁড়ে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো—একটু গপ্পো করি।

[বিশ্বনাথ বসল।]

বিড়ি আছে?

বিশ্ব ॥ আছে।

শিব ॥ দাও একটা।

বিশ্ব ॥ বিড়িটাও ভিক্ষে করো নাকি?

শিব ॥ নিশ্চয়ই। প্রথমেই বলি চার আনা দাও। না পেলে বলি বিড়ি দাও।

বিশ্ব ॥ বলি, এত সুন্দর কম্বলটা সত্যি ভিক্ষে করে পেলে?

শিব ॥ মাইরি বলছি। একজনের বারান্দায় বসে কাঁপছিলুম। একজন বাড়ীতে ঢুকছিল। আমাকে শীতে কাঁপতে দেখে বোধ হয় দয়া হলো। ভেতর থেকে এই কম্বলটা এনে দিল।

বিশ্ব ॥ গাঁজাও চলে নাকি?

শিব ॥ কখনও সখনও। কম্বলটা পেয়েই সিধে দৌড় দিলুম।

বিশ্ব ॥ কেন?

শিব ॥ কি জানি, যদি তার বৌটা এসে চেয়ে নিয়ে যায়!

বিশ্ব ॥ না বাবা, ঝাড়া মিথ্যে কথা বলছ, এ চোরাই মাল।

শিব ॥ বলি নিজের হাতটান আছে নাকি? মাল চিনতে ওস্তাদ দেখছি?

বিশ্ব ॥ চোরাই মাল গায়ে দিয়ে রাস্তায় বসে আছ, সাহস তো কম নয়।

শিব ॥ ঘর থাকলে তো ঘরে থাকব!

বিশ্ব ॥ পুলিশ রোঁদে বেরিয়েছে। এদিকে এল বলে।

শিব ॥ আসুক।

বিশ্ব ॥ বামাল শুদ্ধ ধরা পড়বে।

শিব ॥ ভালোই হবে, কদিন জেল থেকে ঘুরে আসা যাবে!

বিশ্ব ॥ ঠ্যাঙানির চোটে চোখে সর্ষে ফুল দেখবে। অত হ্যাঙ্গামায় কাজ কি কম্বলটা আমায় দাও। কাছাকাছি আমার জানা শোনা লোক আছে রেখে আসি।

শিব ॥ তুমি আর অত কষ্ট করবে কেন?

বিশ্ব ॥ তাতে কি হয়েছে! দাও। আরে বাবা আমি চোর নই। তোমার কম্বলটা নিয়ে আমি পালাব না।

শিব ॥ পালাবে কেন? ফেরত দিতে ভুলে যাবে।

বিশ্ব ॥ আমাকে অবিশ্বাস করছো?

শিব ॥ ছিঃ, তা কি করতে পারি! তুমি আমার কতকালের বন্ধু!

বিশ্ব ॥ যাক্‌গে, না দেবে, না দেবে। তোমার ভালোর জন্যে বলা, নাও, একটা বিড়ি খাও।

শিব ॥ (বিড়ি নিয়ে ধরিয়ে) খুব ঘন ঘন বিড়ি বার করছো যে! কি করা হয়?

বিশ্ব ॥ পুরনো মাল-পত্তর বেচি। সস্তায় নয়, চড়া দরেই।

শিব ॥ তাই নাকি! তা রাত বিরেতে কোথায় যাচ্ছিলে?

বিশ্ব ॥ ঘরে। বলি রোজ কেমন রোজগার হয়?

শিব ॥ চার পাঁচ আনা। তাও দু দিন ধরে জুটছে না!

বিশ্ব ॥ না খেয়ে আছো?

শিব ॥ হ্যাঁ। সাতদিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারি।

বিশ্ব ॥ আহা, তা একটা কাজ করো না কেন?

শিব ॥ কি?

বিশ্ব ॥ এই কম্বলটা বেচে দাও না?

শিব ॥ কিনবে কে?

বিশ্ব ॥ সে ব্যবস্থা আমি করব।

শিব ॥ কত পাওয়া যাবে?

বিশ্ব ॥ দশটা টাকা তো বটেই, পনের টাকাও হতে পারে।

শিব ॥ দশ—পনের ?

বিশ্ব ॥ তবে !

শিব ॥ দাও টাকা দাও।

বিশ্ব ॥ আহা, টাকা কি সঙ্গে আছে ! কম্বলটা দাও, এই তো পাশেই আমার খদ্দের আছে। বেচে টাকা নিয়ে আসি।

শিব ॥ থাক, টাকায় আমার দরকার নেই।

বিশ্ব ॥ অবিশ্বাস করছো !

শিব ॥ ছিঃ, তা কি করতে পারি !

বিশ্ব ॥ দু' দিন পরে দু' টাকায় বেচতে হবে। আমার আর কি ! দু' দিন না খেয়ে আছো, তাই বললাম। নয় ত এই কম্বলের দাম কে দশটা টাকা দেবে ?

শিব ॥ তাহলে আর একটা বিড়ি দাও। যা শীত, এই কম্বলেও গা গরম হচ্ছে না।

বিশ্ব ॥ গা গরম করবার মত জিনিস আমার আছে।

শিব ॥ মাল টাল নাকি ?

বিশ্ব ॥ হ্যাঁ। খাবে ?

শিব ॥ মাল টানাও অভ্যেস আছে নাকি ?

বিশ্ব ॥ আজকাল তো সবাই টানে। তোমার অভ্যেস নেই ?

শিব ॥ না। গরীবের ঘোড়া রোগে কাজ নেই।

বিশ্ব ॥ গরীবদেরই ঘোড়া রোগে ধরে। (শিশি বার করে) নাও খাও।

শিব ॥ না বাবা, ও টানা টানির মধ্যে আমি নেই।

বিশ্ব ॥ আরে বাবা, খাও তো ! খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে, কোথায় শীত ভেগেছে। দেখছ তো, আমি খালি গায়ে রয়েছি। টেনেছি কিনা ! খাও।

শিব ॥ না বাবা, তুমিই টানো।

বিশ্ব ॥ আরে বাবা, একটু খাও না! চাঙ্গা হয়ে যাবে। খাও বড় ভালো জিনিস। কোলকাতা সহর এখন এই জলে ভাসছে।

শিব ॥ তবে দাও। এত করে বলছ!

বিশ্ব ॥ নাও।

[শিবচরণ খেতে গেল। কিন্তু কি মনে করে খেল না]

শিব ॥ না বাবা খাব না। মদের ঝোঁকে বেহুঁস হই। আর তুমি কম্বলটা নিয়ে সরে পড়ো।

বিশ্ব ॥ কম্বল খোয়াবার ভয়েই গেলে! এ রকম চারটে কম্বল আমার আছে।

শিব ॥ তাহলে আর গরীবের এই কম্বলটার ওপর তোমার নেক নজর কেন বাবা!

বিশ্ব ॥ তোমার মনটা বড় অপরিষ্কার।

শিব ॥ আজকের দিনে কার মনই বা পরিষ্কার বাবা!

বিশ্ব ॥ তুমি যখন খাবে না—তখন আমিই খাই।

শিব ॥ খাও। আরাম করো খাও।

[বিশ্বনাথ ঢক ঢক করে মদটা খেয়ে নিল।]

বিশ্ব ॥ জানো দাদা, এখানে কাল একটা খুন হয়ে গেছে!

শিব ॥ (ভয় পেয়ে) এ্যাঁঃ! কোথায়?

বিশ্ব ॥ ঠিক এইখানে। যেখানে আমরা বসে আছি!

শিব ॥ বলো কি গো! মদের ঝোঁকে ছাড়ছো না তো?

বিশ্ব ॥ মাইরি, সত্যি কথা বলছি, এখানে তো প্রায়ই লোক খুন হয়।

শিব ॥ (আরও ভয় পেয়ে) তাই নাকি?

বিশ্ব ॥ জায়গাটা বড় খারাপ। রামু গুণ্ডার দলের নাম শুনেছ তো!

শিব ॥ ও বাবা, শুনিনি আবার! নমস্য ব্যক্তি।

বিশ্ব ॥ ওদের দল তো এখানেই থাকে!

শিব ॥ তাই নাকি ? তাহলে পালাই বাবা ! (উঠে দাঁড়াল)

বিশ্ব ॥ যাচ্ছো কোথায় একলা ? খুন হয়ে মরবে যে ! গায়ে দামী কম্বল !

শিব ॥ (আতঙ্কে) দূর, আমাকে খুন করবে কেন ! এই দশটাকা দামের কম্বলের জন্যে কেউ কাউকে খুন করে !

বিশ্ব ॥ (হেসে ওঠে) বলো কি দাদা, চার আনা পয়সার জন্যে খুন হয়ে যাচ্ছে।

শিব ॥ (ভয়ে বসে পড়ে) বলো কি ?

বিশ্ব ॥ তবে ? এই তো পরশু দিন। একটা লোক তার গায়ে নতুন জামাটার জন্যেই খুন হয়ে গেল।

শিব ॥ এ্যাঁ ! তাহলে আমার গায়ের কম্বল দেখলে তো আমার রেহাই নেই !

বিশ্ব ॥ তা নজরে পড়লে রেহাই পাওয়া শক্ত।

শিব ॥ তাহলে কি করি বলো ত ! পালাব এখান থেকে ?

বিশ্ব ॥ যেমন তোমার বুদ্ধি ! একলা পেলে তো তোমাকে কচু কাটা করে ছাড়বে !

শিব ॥ (প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে) তা হলে কি করি বলো তো ভায়া ?

বিশ্ব ॥ দাও, কম্বলটা আমাকে দাও।

শিব ॥ আমার জন্যে তুমি মরবে কেন ?

বিশ্ব ॥ আমাকে মারবে কোন শালা ? চেহারাটা দেখেছ ? আমাকে মারতে এলে নিজেই মরে পড়ে থাকবে। দাও।

শিব ॥ তাহলে নাও।

[কম্বলটা খুলে দিতে গিয়ে দিল না]

বিশ্ব ॥ কই দাও ?

শিব ॥ (কম্বলটা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে) না, থাক। মরি মরব, কম্বল ছাড়বো না। তোর ও সব ভড়কিবাজি আমি বুঝি। কম্বলটা হাতাবার মতলব।

বিশ্ব ॥ দেবে না তাহলে ?

শিব ॥ (জোরের সঙ্গে) না।

বিশ্ব ॥ দেবে না ?

শিব ॥ না। না।

বিশ্ব ॥ (হঠাৎ একটা ছোরা বার করে বিশ্বের বুকের সামনে ধরে) এইবার দেবে কিনা বল ?

শিব ॥ (ভয়ে পিছু হটে) এই তুইও কি বামু গুণ্ডার দলে নাকি ?

বিশ্ব ॥ হাঁ। নতুন জামার জন্যে যে লোকটা খুন হয়েছে, তাকে আমিই খুন করেছি। (ছোরাটা বুকের আরও সামনে ধরে) কম্বলটা দেবে তো দাও, নয় তো এই ছুরিটা বুকের মধ্যে বসিয়ে দেব।

শিব ॥ এ্যাঁ:, একটা কম্বলের জন্যে মানুষ খুন করবি ?

বিশ্ব ॥ হাঁ করব। আজকের দিনে আট দশটাকাও কম নাকি ?

[ছুরিটা দিয়ে ফতুয়ার খানিকটা অংশ ছিড়ে দিল]

শিব ॥ মুখ দেখে বড় জোর তোকে জোচ্চর বলে মনে হয়। মানুষ খুন তোর কর্ম নয়।

বিশ্ব ॥ দেখবে ? দেব ছুরিটা কলজেয় চালিয়ে ?

শিব ॥ (হঠাৎ বুকটা চিতিয়ে ধরে) দে। চালা। খুন না করে তোকে কম্বল নিতে দেব না।

বিশ্ব ॥ দিয়ে দাও না কম্বলটা ভালোয় ভালোয়। কেন পরাণটা হারাবে ?

শিব ॥ যাক, একটা কম্বলের অভাবে আমার ছেলেটার পরাণটা হারিয়ে গেল !

বিশ্ব ॥ (ছুরিটা নামিয়ে) কি বললে ?

শিব ॥ আমার ছেলে ছিল রে ? সাত বছরের ছেলে।

বিশ্ব ॥ (বিস্ময়ে) তোমার ছেলে ছিল ?

শিব ॥ ছিল বৈকি ? ছেলে ছিল, বৌ ছিল।

বিশ্ব ॥ তারা কোথায় ?

শিব ॥ ছেলেটার জন্ম দিয়ে বৌটা মারা গেল।

বিশ্ব ॥ ভারী দুঃখের ব্যাপার তো ?

শিব ॥ এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করতুম। সুযোগ বুঝে আমাকে ঠকাল। সর্বস্বান্ত হলুম। আমি না খেয়ে কাটাতুম। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও। এমনি এক দারুণ শীতের দিনে তার হঠাৎ অসুখ করলো।

বিশ্ব ॥ ছেলেটা সেরে উঠ্‌ল ?

শিব ॥ না, ফুটপাতেই ছেলেটা শীতে কুঁকড়ে মরে গেল। মরবার আগে সে প্রায়ই একটা গরম কিছুর জন্যে বায়না ধরত ; আর আজ দেখ আমার গায়ে নতুন কম্বল।

[হেসে উঠ্‌ল]

বিশ্ব ॥ ভারী দুঃখের ব্যাপার তো !

শিব ॥ আমি তো সেই দুঃখে পাগলই হয়ে গেলুম। লোকে দেখলেই মারতো। মার খেতে খেতে আবার ঠিক হয়ে গেছি। হা…হা…হা।

বিশ্ব ॥ (দুঃখের সঙ্গে) ক' বছর বয়সে তোমার ছেলেটা গেল।

শিব ॥ বছর ছয়েক।

বিশ্ব ॥ কি নাম ছিল ?

শিব ॥ সুন্দর। ভারী সুন্দর দেখতে ছিল ছেলেটা। ইয়া টানা টানা চোখ। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। গড় গড় করে বাংলা পড়তে পারতো! একটা কম্বলের জন্যে ছেলেটা কেঁদে ভাসাতো, আর আমার গায়ে নতুন কম্বল হা…হা (কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে) আঃ কি আরাম !!

বিশ্ব ॥ এই শোনো…

শিব ॥ এর পর আমার আর কি শোনার আছে রে ? এ্যাঁঃ হো হো…

বিশ্ব ॥ তোমার কথা তো বললে আমার কথা শুনবে না ?

শিব ॥ তোর কথা আর কি শুনবো রে ? তুই তো মিথ্যে কথা বলবি ? তুই তো একটা চোর, জোচ্চোর, ঠগ্‌, গুণ্ডা, বদমাস, খুনে। (কম্বলটা

গায়ে জড়িয়ে) আঃ কি আরাম হো···হো···কি আরাম ! কি আরাম !

বিশ্ব ॥ তাই বলে তারা সত্যি কথা বলে না !

শিব ॥ না বলে না, নইলে চোর জোচ্চর হবে কেন ?

বিশ্ব ॥ তোমরা ভিখিরীরাও তো মিথ্যে কথা বলে ভিক্ষে করো !

শিব ॥ তাহলেও তফাৎ আছে রে হতভাগা !

বিশ্ব ॥ তফাৎটা কি শুনি ?

শিব ॥ সবাই জানে, আমরা মিথ্যে বলেই ভিক্ষে করি কিন্তু তোদের কথা লোকে সত্যি বলে ভাবে।

বিশ্ব ॥ কিন্তু দাদা শোন।

শিব ॥ হাঁ রে, আমি আবার তোর দাদা হলাম কবে থেকে রে ?

বিশ্ব ॥ কিন্তু তুমি তো দাদারই মতো।

শিব ॥ থাক বাবা, আর দাদা টাদা বলিস নি। কেঁদে ফেলব। ভাই নেই বলে অনেক কালের দুঃখু।

বিশ্ব ॥ কিন্তু সত্যি বলছি দাদা—

শিব ॥ আবার দাদা বলছিস ? তোকে নিয়ে ভাবী মুস্কিলে পড়লুম যে ? মাঝরাতে আমি কাঁদতে বসি তাই কি তুই চাসরে ?

[নেপথ্যে কুকুরের করুণ ডাক শোনা গেল]

শিব ॥ ব্যাটা, কুকুরটা কাঁদে কেন রে ? ওটার আবার ভায়ের শোক লাগলো না কি ?

বিশ্ব ॥ সত্যি বলছি দাদা, ঠিক তোমারই মত আমার একটা দাদা ছিল।

শিব ॥ ছিল ? এখন বুঝি নেই ?

বিশ্ব ॥ আছে। জেলে। মিথ্যে খুনের দায়ে জেল খাটছে। আর মজা দেখ সত্যি সত্যি খুন করে আমি বুক ফুলিয়ে রাস্তায় বেড়াচ্ছি।

[বিশ্বনাথের গলাটা কেমন যেন ভারী হয়ে আসে]

শিব ॥ (সহানুভূতির সঙ্গে) আর কে আছে তোর ?

বিশ্ব ॥ বৌ ছিল—পালিয়েছে।

শিব ॥ মার ধোর করতিস বুঝি ?

বিশ্ব ॥ মাঝে মাঝে।

শিব ॥ তাহলে বেশ করেছে পালিয়েছে।

বিশ্ব ॥ (ডুকরে কেঁদে উঠে) কিন্তু ছেলেটাকে রেখে গেল কেন ?

শিব ॥ এ্যাঁঃ, তোর আবার ছেলে আছে নাকি ?

বিশ্ব ॥ আছে দাদা, একটা···

শিব ॥ বয়েস কত রে ?

বিশ্ব ॥ এই বছর আষ্টেক।

শিব ॥ আরে আমার সুন্দরটাও তো বেচে থাকলে এবারে আটে পা দিত ? (আগ্রহের সঙ্গে) তোর ছেলের নাম কি রে ?

বিশ্ব ॥ কালো বলে ডাকি।

শিব ॥ (অতি আনন্দে প্রায় চীৎকার করে) এ্যাঁঃ কালো ? বলিস কি রে ? আমার ছেলেটাকেও তো আমি কালো বলে ডাকতুম।···তা তোর ছেলেকে কেমন দেখতে রে ?

বিশ্ব ॥ বললে না তোমার ছেলের কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল, আমার ছেলেটারও চুলগুলো কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো···আর তোমার ছেলের মতই আমার ছেলের চোখ দুটো ইয়া টানা···টানা···

শিব ॥ এ্যাঁঃ, এই আমার ছেলেটা মরে তোর ঘরে হাজির হয়েছে না কি রে ? তোর ছেলে কবিতা বলতে পারে ?

বিশ্ব ॥ হাঁ পারত, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

শিব ॥ পারত কি রে ? এখন পারে না ?

বিশ্ব ॥ কি করে পারবে ? পক্ষাঘাত হয়ে দু' বছর বিছানায় পড়ে আছে যে !

[বিশ্বনাথ আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। শিবনাথের চোখ সজল হয়ে ওঠে]

বিশ্ব ॥ উঠতে পারে না, বসতে পারে না। না খাইয়ে দিলে খেতে পারে না।

শিব ॥ হাঁরে, এমন ছেলে ঘরে ফেলে তুই রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস ? (কান্নাভরা গলায়) বলি তোর শরীরে দয়ামায়া বলে কিছু নেই রে !

বিশ্ব ॥ কি করে ঘরে যাই ! গেলেই ছেলেটা ইসারায় বলে, বাবা বড় শীত, একটা গরম জামা কিনে দাও না ?

শিব ॥ তবে যে বললি, তোর ঘরে চারটে কম্বল আছে।

বিশ্ব ॥ মিছে বলেছিলুম দাদা।

শিব এ্যাঃ ! তাই জন্যে তুই আমার এই কম্বলটা বাগাবার জন্যে এতক্ষণ চেষ্টা করছিস ? এই নে, নিয়ে যা—

[কম্বলটা গা থেকে খুলে দিতে যায়]

বিশ্ব ॥ না দাদা থাক, তুমি বুড়ো মানুষ, এই কম্বলটা গায়ে না থাকলে তুমি শীতে মরেই যাবে।

শিব ॥ নারে বাবা না। তুই নিয়ে যা তো।

বিশ্ব ॥ না দাদা, তোমার এই কম্বলটার ওপর লোভ আমার ছিল, এখন আর নেই।

শিব ॥ যা বলছি শোন তো ! আরে বোকা ! এই কম্বলটা কি আর আমার গায়ে আছে রে ! আমার সুন্দরের গায়ে জড়িয়ে বসে আছি ! আমার সুন্দরই তোর কালো রে ! যা, যা, নিয়ে যা, নে···

[শিবনাথ জোর করে বিশ্বনাথের হাতে কম্বলটা দিয়ে দিল।]

ছেলেটার গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিগে যা, খুব আরাম পাবে ! যা আর দেরী করিস নে।···

[বিশ্বনাথ কম্বলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। শিবনাথ কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড শীতে তার শরীর থরথর করতে থাকে। কাপড়টা দিয়ে মাথামুড়ি দেয়। চাপাচাপা গলায় গান শোনা যায়। বিশ্বনাথকে কম্বল

হাতে ফিরে আসতে দেখা যায়। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে শিবচরণের গায়ে কম্বলটা ফিরিয়ে দেয়। শিবচরণ হুড়মুড় করে উঠে বসে। কম্বলটা মাটিতে পড়ে যায়]

শিব ॥ কিরে? কম্বলটা ফিরিয়ে দিলি যে?

বিশ্ব ॥ দাদা, আমি চোর, জোচ্চর, লোক ঠকিয়ে খাই, কিন্তু তোমার সুন্দরের কম্বলটা কেড়ে কালকের মদের দামটা আমি চাইনে।

শিব ॥ তাহলে তোর কালো?

বিশ্ব ॥ কালো আমার নেই। কোন কালে ছিলও না। কম্বলটা বাগাতে গল্পটা ফেঁদে ছিলাম।

শিব ॥ সুন্দরটা আরামে কম্বলটা জড়িয়ে শুয়ে আছে মনে করে একটু শান্তিতে মরতে পারতুম। তাও দিলি না। শালা তুই সত্যিই হাড় বদমাস।

[শিবচরণ বিড়ি বার করে। দেশলাই কাঠি জ্বালে। বিড়িটা ধরায়। তারপর জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা কম্বলটাকে ধরাবার জন্যে কাছে ধরে। বিশ্বনাথ তা দেখতে পেয়ে ফিরে এসে ফুঁ দিয়ে দেশলাই কাঠিটা নিভিয়ে দেয়। তারপর কম্বলটা বিশ্বনাথের গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিয়ে সে দ্রুত চলে যায়। পর্দা সরে আসে।]

দিনান্ত

॥ বীরু মুখোপাধ্যায় ॥

॥ চরিত্রলিপি ॥

অমরাবতী রেষ্টুরেণ্টের বয় :—

ঝড়ু :

অনন্ত :

গোকুল :

দোকানের মালিক :

শীতলবাবু : মধ্যবয়স্ক শিক্ষক।

অবিনাশবাবু : গোকুলের পিতা

: জনতা ও পথচারী :

[একটি রেষ্টুরেণ্টের সম্মুখস্থ ফুটপাথের কিয়দংশ। একটি গ্যাসপোস্ট দেখা যায় মঞ্চের বাঁ দিকের গভীরে। ভোর হচ্ছে ধীরে ধীরে। কয়েকটা হাল্কা টেবিল পাশাপাশি সাজিয়ে ঘুমুচ্ছে তিনটে ছেলে, ওরা সামনের অমরাবতী রেষ্টুরেণ্টের বয়। ক্রমে ক্রমে ট্রাম চলার ঘড় ঘড় আওয়াজ ভেসে আসে। হোস্ পাইপের জল দেওয়ার শব্দ ভেসে আসে। একটি লোক মই কাঁধে গ্যাসপোস্টের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যায়। ট্রামবাসের আওয়াজ স্পষ্টতর হয়। হোস্পাইপের জলের ছিটা গায়ে লাগতেই একটি ছেলে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে। ছেলেটির নাম "ঝড়ু"।]

ঝড়ু ॥ (পাশের ছেলেটিকে গায়ে লাথি মেরে) আরে, এই শালা, ওঠ, ওঠ।

অনন্ত ॥ (উঠে পড়ে, হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙে) বাবা, বেলা হ'য়ে গেল—

[বালিশের নীচে রাখা বিড়ি ও দেশলাই বা'র করে]

॥ দাও, এদিকে ছাড়ো একগাছা— । (অনন্ত ঝড়ুকে বিড়িটা দেয়, ঝড় বিড়ি ধরিয়ে পাশের ছেলেটিকে বিকৃতস্বরে বলে—) খোকন, ও বাপ খোকন, উঠে পড় মাণিক আমার, মুখ ঢুয়ে ডুডু খাও ।

[পাশের ছেলেটির বয়স এদের চেয়ে অল্প এবং অপেক্ষাকৃত সুন্দর । একবার উঠে বসে বিহ্বল চোখে সবার দিকে চায় । আবার শুয়ে পড়ে । ঝড়ু ও অনন্ত উভয়ে হেসে ওঠে]

॥ (ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে) এ্যায়, আজ কি বার ? (ছেলেটি মাথা নাড়ে) জানে না, ন্যাকা ! তা-তো জানবেই না ! বুধবার কার পালা ? [ছেলেটি আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখায় । ছেলেটির নাম 'গোকুল' ।]

কুল ॥ অন্তার !

ড়ু ॥ অন্তার ? 'মাইরী প্রাণ গড়ের মাঠ ।' সোম, মঙ্গল ঝড়ু ; বুধ, বৃহস্পতি অন্তা ; শুক্র, শনি ঝড়ু । আর তুমি শালা শুয়ে শুয়ে কুলোর বাতাস খাবে !

াকুল ॥ আমি পারি না যে—

ড়ু ॥ পারো না, কচি খোকা । হোটেলে চাকরি করতে এসেছো আর উনুনে আঁচ দিতে শেখো নি ?

নন্ত ॥ ভারী তো কাজ, আমি দিয়ে দিচ্ছি ।

ড়ু ॥ এ্যায় অন্তা তুই যাবি না, ঐ শালাই দেবে । কেন যখন হেসে হেসে বাবুদের বক্‌শিস্ আদায় করো তখন তো অন্তাকে ডাকোনা । শাঁসালো বাবু দেখলেই মাইরি ছুটে যাবে একেবারে !

নন্ত ॥ বাবুরা ওর মুখ দেখে বক্‌শিস্ দেয় ।

ড়ু ॥ হ্যাঁ, ঐ ন্যাকা ন্যাকা মুখে গিয়ে দাঁড়ায় যে সবায়ের সামনে । এক ঘুসিতে তোমার ঐ ন্যাকাপনা ঘুচিয়ে দেবো শালা । আমার সবকটা খদ্দেরকে ঐ শালা হাত করেছে মাইরি ! আগে শনিবারের দিন রেসের

ঝাড়া-মোছা ক'রে নিয়েছে। মালিক গঙ্গা জলের
নিয়ে দরজার সামনে জলের ছিটে দেন, অনন্ত ভে
থেকে একটা ধুনুচি নিয়ে এসে মালিকের হাতে দে
মালিক সেটা দোকানের সাইনবোর্ডটার কাছে নি
ঘোড়াতে থাকেন। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এক
ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন রাস্তা দিয়ে। তাঁর চল
ভঙ্গীতে বোঝা যায় তিনি দৃষ্টিহীন। লাঠি দি
জায়গাটা অনুভব করে তিনি ডাকেন—'গোকুল'
'গোকুল'—]

মালিক ॥ (ভেতর দিকে মুখ করে) এ্যায় গোকলে, ছাখ তোর বাবা এসেছে
সকাল বেলা খদ্দেরের নাম গন্ধ নেই যত সব অযাত্রা !

[গোকুল তখন ছুটে আসে। বৃদ্ধ তখন ফুটপাথে ব
পড়েছেন। বৃদ্ধের চেহারায় অতীত ভদ্রাবস্থার ছাপ
তালিমারা ক্যাম্বিসের জুতো। বৃদ্ধের নাম অবিনা
চৌধুরী।]

গোকুল ॥ (কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান) বাবা, কতক্ষণ আইলা ?

অবিনাশ ॥ (ম্লান হেসে) এই মাত্তর আইলাম। সেই ভোর হইতে হা
দিছি। যাদবপুর কি এহান ?

গোকুল ॥ একাই আইলা ? নকুলরে সঙ্গে লইলা না ক্যান ?

অবিনাশ ॥ নকুল তহন ঘুমইতে ওঠে নাই। তখন ত' রাত আছিল। এক
চইল্যা আইলাম। রাস্তার লোকেরে জিগাইলে রাস্তা দেহাইয়া দে
লোকগুলান সব ভাল।

গোকুল ॥ (বাবার গায়ে হাত দিয়ে) তোমার চেহারা ত' ভাল দেখায় না
শরীর ভাল আছে ?

অবিনাশ ॥ আর শরীর ! আছি কোন মতে টিকিয়া। দিন যায় রা
আসে, আবার ভোর হয়, মোর পোড়া দিনটুকু ত' শ্বাস হয় না ! ভো

হলেই চিন্তা, চার চারটা প্যাট্ হাঁ কইরা আছে রাক্ষসের মত। আইজ এখান হইতে যাইবার পথে চাল লইয়া গেলে তয় হাড়ি চরবো।

গোকুল॥ বাবা, বিপদ হইছে, আধুলি একখান রাখছিলাম তোমার লাইগ্যা! এহানে এই কোমরে রাইখ্যা রাতে শুইছি কওন খ্যানে পইর‍্যা গেছে '

অবিনাশ॥ কস্ কি? পইর‍্যা গেল! একখান আধুলি এই বাজারে—দেহত' কাম, ছাওয়াল পান মানুষ, শহর জায়গা কত সাবধান হইয়া থাকতে হয়।

গোকুল॥ বাবা, আজকার দিনটুক কোনমতে চালাইয়া লইতে পারবা না? কালই আমি দিমু। এক বাবুরে কইছি দশটা টাকার লাইগ্যা, বাবুটি খুব ভাল। আমারে বড় ভালবাসে। আমি ভাল ছাত্র ছিলাম শুইন্যা উনির খুব দয়া হইছে। আমারে কইলেন রোজ পড়, পড়া ছাইড়ো না, প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল দিবা। আমি বই খাতা জোগার করছি বাবা। রোজ পড়ি।

[এই সময় ঝড়ু পেছনে এসে লুকিয়ে দাঁড়ায় দরজার আড়ালে।]

অবিনাশ॥ (মুখে হাসি ফুটে ওঠে) পড়, পড, রোজ পড়। (গোকুলের গায়ে হাত বুলায়) তুমিত' ভাল ছাত্র ছিলা বাবা, মাদারীপুরের স্কুলের হেডমাষ্টার আমারে কইছিলেন, তুমি একজন মানুষের মত হইবা। (সদীর্ঘশ্বাসে) হা, দুর্ভাগ্য! পড়, বাবা পড়, ভাল কইর‍্যা যদি ইস্কুল ফাইন্যালটা পাশ করতে পার ত' আমাগো হরিশবাবু, ঐ যে সিরাজগঞ্জের হরিশবাবু, আমারে কইছেন র‍্যালের অফিসে তোমারে চাকরি কইর‍্যা দিবেন। পড়, ভাল কইর‍্যা পড়। তা এহানে কি পড়াশুনার সুবিধা হয়! দোকান জায়গা—

গোকুল ॥ না বাবা, আমায় ত' ভারি কাম কিছু করবার হয় না, আমি খাতা লিখি।

[পেছন থেকে ঝড়ু শিষ দেয়। গোকুল ঝড়ুকে দেখে লজ্জা পায়]

অবিনাশ ॥ দেখো, ভগবানের কৃপা। একাম ভাল না, চায়ের দোকানের কাম, অবিনাশ চৌধুরীর ছাওয়াল। (সদীর্ঘশ্বাসে) বেলা হইল—চলি, দেহি যদি কোনখানে কিছু জোগাড় করবার পারি। (কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসে) এক্কেরে ভুইলা গেছি, (একটা পুঁটলি বার করে) তোর মায় দুটো নারু দিছিল, খাইয়া ল'।

গোকুল ॥ (পুঁটলিটা গ্রহণ করে, ঝড়ুকে লক্ষ্য করে) খাবো'খন, তুমি রাইখা যাও।

অবিনাশ ॥ হারে পাগল, আমার সামনে একখান খাইয়া ল'। আমি দেখবার পারিনা, তবু ত' বুঝবার পারুম তুই খাইতে আছস। তোরে না দেইখ্যা আমাগো বড় কষ্ট হয় ; ল'—একখান খাইয়া ল'।

গোকুল ॥ (সলজ্জভাবে একটা মুখে দেয়) কাল আইস বাবা, ঠিক এমনি সময় আইস। আমি দিমু টাকা।

অবিনাশ ॥ (সদীর্ঘশ্বাসে) আমু। আসতে ত' হইবই। (একবার হাত দিয়ে ওকে অনুভব করে) উনিশ শ একচল্লিশ সন, হ' সতর বছর হইল। (হঠাৎ) আমি গেলাম। (দ্রুত এগিয়ে যায়)

গোকুল ॥ কাল ঠিক আইসো বাবা—

অবিনাশ ॥ আমু, আমু। (লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে যায়)

[গোকুল দোকানের দিকে ফিরে ঝড়ুকে ডাকে]

গোকুল ॥ ঝড়ু, এই ঝড়ু এইনে নাড়ু খা আমার মা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঝড়ু ॥ তোর মা তোকে দিয়েছে, আমি খেতে যাব কেন ?

গোকুল ॥ তা-তে কি হয়েছে, আমি দিচ্ছি, খা না।

ঝড়ু ॥ (ওর চোখ দুটো জলে ওঠে, গোকুলের নাড়ুশুদ্ধ হাতে ধাক্কা দেয়। ওর নাড়ুটা পড়ে যায়) য্যা, য্যা, নাড়ু খাওয়াতে এসেছে। তোর মা তোকে পাঠিয়েছে আমি কেন খেতে যাবো। তোর মা আছে আদর করে নাড়ু পাঠায়, বাবা আছে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আমার কে আছে? আমি কেন খাবো, তোর নাড়ু তুই খা। আমি কেন খাবো······

মালিক ॥ (দ্রুত ভেতরে থেকে) গোকুল, এ্যায় গোকলো হারামজাদা, সারা দিন-রাত্তির কেবল ফাঁকি, এদিকে খদ্দের সব ব'সে আছে—এ্যায় গোক্‌লো······

[গোকুল ভেতরে ঢুকে যায়। রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ে। বেলা বাড়ে। দু'একজন ক'রে খদ্দের দোকানের ভেতরে ঢুকতে সুরু ক'রে, রাস্তায় লোক চলাচল অব্যাহত থাকে। ট্রামের অবিরাম ঘড় ঘড় আওয়াজ আসে। খদ্দেররা মশলা চিবোতে চিবোতে বেড়িয়ে আসে। বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা দোকানের ভেতর থেকে ভেসে আসে। ধীরে ধীরে আলো নিভে যায়। আলো জ্বললে দেখা যায় ঝড়ু ও অনন্ত ব'সে তাস পেটাচ্ছে। পাশেই বই-খাতা নিয়ে গোকুল একমনে পড়ছে। দোকানের দরজাটা খোলা, ভেতরটা ফাঁকা, চেয়ার টেবিল একপাশে জড়ো করা, দুপুর বেলা পাশের গ্যাস পোস্টের ছায়াটা লম্বা হয়ে রাস্তায় পড়েছে।]

অনন্ত ॥ এঃ, তিনজন না হ'লে কি জমে! গোকুল, আয় না মাইরি।

গোকুল ॥ আমি পড়ছি রে······

ঝড়ু ॥ ওঃ, শালা আমার বিদ্যাসাগরের বাচ্চা।

গোকুল ॥ একটু ভদ্র ভাবে কথা ব'লতে শেখ।

ঋভু ॥ তা দয়া ক'রে শিখিয়ে দাও, মুখ্যু সুখ্যু লোক তোমার মতো ইস্কুে ফাইন্যাল দিতে শিখি নি।

অনন্ত ॥ সে আবাব কিরে ?

ঋভু ॥ শুনিস নি, শালা এবার ইস্কুল ফাইন্যাল দেবে। এখন সেমি ফাইন্যা চলছে !

অনন্ত ॥ কি জানি ভাই, আমরা এক ফাইন্যালের কথা জানি, মাঠে ফাইন্যাল।

ঋভু ॥ হাঁা যা বলেছিস। আজ মোহনবাগান কি দব বে ?

অনন্ত ॥ কি-দর খেয়েছিস ?

ঋভু ॥ আমি তো শালা পাঁচটাকা খেয়ে নিয়েছি, দেডে দেডে ড্র উইন।

অনন্ত ॥ তবে মরেছে, আজকেব দব হাফ ফবফিট ওয়ান বিটান—

গোকুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সে আবার কিবে ?

ঋভু ॥ যা করছো করো। এব মধ্যে নাক গলাতে এসো না। এ তোমা ইস্কুল ফাইন্যাল নয়, মাঠ ফাইন্যাল হ্যাঁ, এ সব শিখতে গেলে দু'পয়স খরচা কবতে হয়।

গোকুল ॥ জন্ম জন্ম যেন না শিখতে হয়—ঐ ছোটলোকেব জুয়া খেলা।

ঋভু ॥ কি বললি শালা ? জুয়া ! আমবা জুয়াড়ী ? তুই শালা কি ? তু তো ভিখিবি ! কালকে ঐ গলদা-চিংড়িবাবুর কাছে ভিক্ষে চাইছিলি— আমি দেখিনি ? "আমি ভদ্রলোকের ছেলে, পয়সাব জন্য পড়াশুন বন্ধ হযে গেল"—শালা ভদ্রলোকের ছেলের ভিক্ষে চাইতে লজ্জা কে না ?

অনন্ত। এই ঋভু থাম•••।

ঋভু ॥ দেখ না, শালা যা করছিস কর, বড় বড় বাত কেন বাবা ?

অনন্ত ॥ যাক্‌গে পড়ছে পড়ুক না, আয় দু'জনে খেলি। (তাস ফাটায়)

ঝড়ু ॥ খেলছিলুম ত' চুপ চাপ, শালা কথায় কথায় ভদ্রলোক ছোটলোক তোলে কেন ?

অনন্ত ॥ তা ও-ত' আমাদের মত নয়, সত্যি সত্যিই ভদ্রলোকের ছেলে।

ঝড়ু ॥ হ্যাঁ, তোর ভদ্রলোকের মুখে ঝাড়্। লাঠি ঠুকে ঠুকে আসে, চারগণ্ডা পয়সা না হলে হাঁড়ি চড়ে না—আবার ভদ্দর লোক ! (ভেঙিয়ে) "তুই ভাল কইর‍্যা পাশ করবার পারলে আমাগো সিরাজগঞ্জের হরিশবাবু কইছিল তোরে রেলের অফিসে চাকরি কইর‍্যা দিব।" আর কি রেলের বাবু, তখন আর শালা আমাদের গোকুলো নয়। গোকুলবাবু—এই রকম করে কোঁচা দুলিয়ে আসবে এই অমরাবতী রেষ্টুরেন্টে—দেখি দু'খানা 'প্রণ' কাটলেট আব ডিমের ডেভিল।

গোকুল ॥ আঃ, একটু চুপ করবি ! আমি পড়াশুনা করছি।

ঝড়ু ॥ পড়াশুনা করতে হয় ইস্কুলে পাঠশালে যাও, এখানে হোটেলের বয়গিরি করবে আর ভদ্দরপনা ফলাবে—দু'রকম ত' চলবে না।

অনন্ত ॥ তুই দোকানের ভেতরে গিয়ে ব'স না গোকুল।

গোকুল ॥ ভেতরটা বড্ড গরম, তাই এখানে এসে বসেছিলুম। এখন দুপুরবেলা ত' পাখা খোলবার হুকুম্ নেই।

ঝড়ু ॥ বসেছ বেশ করেছ, এস একহাত ব'সে যাও।

গোকুল ॥ আমি তোদের কাছে হাত জোর করছি ঝড়ু পরীক্ষার বেশী দেরী নেই, প্রাইভেট পরীক্ষা আমায় দিতেই হবে।

ঝড়ু ॥ পেরাইভেট কেন বাবা, একবারে খোলাখুলিই দাও না, কে মানা ক'রছে। তবে লুকোচুরিটি ক'রো না। বাবাকে বলেছে, বুঝলি অন্তা—"আমি এখানে খাতা লেখার কাজ করি।" কাঁটাচামচ ধুয়ে ধুয়ে শালার হাতে কড়া প'ড়ে গেল ! (দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে)

গোকুল ॥ (বই খাতা গুছাতে থাকে) নাঃ, আমি ভেতরেই যাচ্ছি।

ঋজু ॥ (এগিয়ে গিয়ে ওকে আদর করে) না না, বাপমায়ের আদরের দুলাল আমার, ব'স এখানেই। "পড়, মন দিয়ে।" তুমি মনতিড়ি হবে, লাট-বেলাট কত কি হবে—আমরা, বুঝলি অন্তা কাল ম্যাটিনী, আঃ কেয়া গানা গায়িস্ ইয়াব—(নৃত্যেব ভঙ্গীতে) "লেকে পহ্‌লা পহ্‌লা প্যার।"

গোকুল ॥ (উঠে দাঁড়ায়) অনেক পাপ না ক'রলে তোদের সঙ্গে কাজ করতে আসেনা বুঝলি—কি করবো জমি-জায়গা সব চলে গেল পাকিস্থানে। বাবা অন্ধ হ'য়ে গেল। ছোট ছোট দু'টো ভাই, বোন, মা—তাই পড়া ছেড়ে দিয়ে —। আমি স্কুলে ফার্স্ট হতুম জানিস! কপালের ফের তাই, না হলে তোদেব মতো ছেলেদের সঙ্গে আমবা কথা কইতাম না দেশে।

ঋজু ॥ তা দেশেই যাও না, এখানে পড়ে আছ কেন মরতে। সব শালা বুঝলি অন্তা, জমিদার! পাকিস্তানে আমাদের সব ছিল, তা সেই সব বুঝতেই যাও না; আমাদের ভাগে ভাগ বসাতে এসেছ কেন বাবা!

গোকুল ॥ তোরা কি বুঝবি? সে বোঝার মতো বিদ্যে তোদের আছে? নিজেব বলতে কিছু ছিল কোনকালে? বাড়ী নেই, ঘর নেই, মা নেই তোরা ত' রাস্তার কুকুর।

ঋজু ॥ (এগিয়ে গিয়ে ওর কলার ধরে) কি বললি? কি বললি তুই?

অনন্ত ॥ এই ঋজু কি হচ্ছে, ছেড়ে দে।

ঋজু ॥ ছেড়ে দোব? ও যে কথা বলেছে জিভ দিয়ে, ঐ জিভ আমি উপড়ে নোব; বল শালা, রাস্তার কুকুর!

গোকুল ॥ বলবই ত, একশবার বলবো। যার বাপ মা-র ঠিক নেই—তার আবার—

[ঝড়ু লাফ দিয়ে পড়ে গোকুলের ঘাড়ে, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বই খাতা ছিঁড়ে যায়। এই অবস্থায় দোকানের মালিক প্রবেশ করে]

মালিক ॥ (ঝড়ুর চুলের মুঠি ধরে) এই শুয়ার, মারামারি! (গোকুলকে) এদিকে আয়—

[অনন্ত ভয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে যায়]

গোকুল ॥ (কেঁদে ফেলে) আমি কি করবো, আমি দুপুর বেলা একটু পড়তে বসেছিলুম, দেখুন না আমার বইখাতা সব ছিঁড়ে দিয়েছে।

মালিক ॥ হুঁ! তা দেবে বইকি! (ঝড়ুর চুল ধরে ঝাঁকানি দেয়) কিরে—

গোকুল ॥ আমাকে ও—

মালিক ॥ কোন কথা শুনতে চাইনা, ছিঁড়েছিস ওর বইখাতা? উত্তর দে ছিঁড়েছিস ওর বই খাতা? (চড় মেরে) রাস্কেল, একজন ভদ্রলোকের ছেলে পেটের দায়ে চাকরি করতে এসেছে তার ফাঁকে ফাঁকে একটু পড়াশুনা করে সেটা সহ্য হচ্ছে না—না? বেতিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দোব। আর করবি কোন দিন? এ্যা, করবি আর—

[চুল ধরে ঝাঁকানী দেয়]

ঝড়ু ॥ ওর জিভ আমি উপড়ে নোব।

মালিক ॥ অ্যাঁ, কি বললি!

ঝড়ু ॥ আমাকে ও আমার বাপ-মা তুলে কথা বলেছে—

গোকুল ॥ না বাবু, আমি—

মালিক ॥ চুপ, (ঝড়ুকে) এইসব ছোটলোকেদের মতন অসভ্য কথা ও যদি ব'লে থাকে, তোদের কাছ থেকে শিখে ব'লেছে। অভদ্র ইতর কোথাকার! "বাপ-মা তুলে কথা ব'লেছে" ত' মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে একেবারে। কোন ধনেখালির রাজবাড়ীর রাজপুত্তুর আমার,

গায়ে ফোস্কা প'ড়ে গেছে! ফের যদি শুনি ওর পেছনে তুই লেগেছিস তবে জুতো মারতে মারতে দোকান থেকে তাড়িয়ে দোব। তিনটে বেজে গেছে, এখনও উনুনে আঁচ পড়েনি কেন?

ঝড়ু ॥ আজ বুধবার গোকুলের পালা—

মালিক ॥ ফের মুখের ওপর কথা, যা এক্ষুণি আঁচ দিগে যা, যা—

[ওকে ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়]

[ঝড়ু যাবার আগে একবার তীব্র দৃষ্টিতে গোকুলকে লক্ষ্য করে, তার চোখ দুটো জ্বলছিল, দ্রুত ভেতরে চলে যায় মাথা হেঁট করে। গোকুল ছেঁড়া পাতাগুলো গুছোতে থাকে।]

(গোকুলের দিকে ফিরে) ওর সঙ্গে লাগতে গেছিলি কেন?

গোকুল ॥ (কাঁদো-কাঁদো স্বরে) আমি ত' একধারে ব'সে পড়ছিলুম।

মালিক ॥ (খেঁকিয়ে) একধারে ব'সে প'ড়ছিলে আর ও গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলো!

গোকুল ॥ (কেঁদে ফেলে) অন্তাকে জিগেস করুন না।

মালিক ॥ থাম থাম, কাঁদিস নি অমন ফ্যাচ ফ্যাচ ক'রে। যত জোটে আমার কপালে! দেখো তোমায় আমি সাফ কথা বলে দিচ্ছি—তোমাকে রাখবার ইচ্ছে ছিল না আমার। দোকানের একটি কাজও তোমাকে দিয়ে ভাল ভাবে হয় না। এক মাসে তিনটে গ্লাস, চারটে প্লেট তুমি ভেঙেছো। অন্য ছেলে হ'লে পুরো টাকাটি মাইনে থেকে কেটে নিতুম! তোমার বাবা অনেক কাঁদা-কাটা ক'রে আমার কাছে তোমাকে দিয়ে গেছে। ভাবলুম থাক, গরীব অন্ধের ছেলে, যা হয় করে চালিয়ে নেবে। লেখাপড়া করছ শুনে খুশীই হয়েছি আমি। ভদ্রলোকের ছেলে মুখ্যু থাকার মত পাপ আর নেই। ভালয়-ভালয় পাশটা ক'রে নিজের কাজ

গুছিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো। ওদের সঙ্গে মিশবে না, ওদের কোনো কথায় থাকবে না, ওরা সব বস্তির ছেলে ছোটলোকের ছেলে, মিথ্যেবাদী, চোর, জুয়াড়ী—। যদি ওদের সঙ্গে ভেড়, তা হ'লে একেবারে ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হ'য়ে যাবে এই বলে দিলুম। যাও, নিজের কাজে যাও। (গোকুল নতমস্তকে ভেতরে ঢুকে যায়; মালিক ভেতরে ঢোকেন)

[বেলা পড়তে সুরু করে। রাস্তায় লোক চলাচল আবার বাড়ে। দোকানে খরিদ্দার ঢোকে, বেরোয়। ক্রমে সন্ধ্যা হয়। একজন লোক মই কাঁধে ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বালিয়ে দেয়। একজন প্রৌঢবয়সী দোহারা চেহারার ভদ্রলোক দোকানের সামনে আসতেই গোকুল ছুটে এসে ধরে।]

গোকুল॥ বাবু, আপনি বলেছিলেন আজ দেবেন।

শীতলবাবু॥ কে? ও হ্যাঁ, তোমাকে দশটা টাকা দোব ব'লেছিলাম না? (পকেট থেকে টাকা বের করে) নই নাও। (এই সময়ে ঝড়ু পেছনে এসে লক্ষ্য করে) পড়াশুনা ক'রছ মন দিয়ে?

গোকুল॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, চেষ্টা করছি।

শীতলবাবু॥ করো, স্কুল ফাইন্যালটা পাশ করো। ভদ্রলোকের ছেলে শিক্ষাই আসল বুঝেছ! শিক্ষাহীন জাতির কোন পরিচয় নেই।

গোকুল॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

শীতলবাবু॥ হ্যাঁ শোন, দু'টি শর্ত আছে। প্রথম, এই টাকাটা তুমি আমায় ফেরৎ দেবে—

গোকুল॥ আমার ত' মাসে দশ টাকা মাইনে। একমাসে ত' পারবো না দিতে।

শীতলবাবু॥ দশ মাসে দিও। একটা ক'রে—তবে দিও। আমি দান করি না কাউকে, ওতে দাতার—মানে যে দান করে তার, বুঝেছ, আত্মশ্লাঘা—

অর্থাৎ কিনা অহংকার বাড়ে এবং গ্রহীতার—মানে, মানে যে নে
তার আত্মা অপমানিত হয়। টাকাটা দিয়ে দিও, যত দিনে পারে
দিও।

গোকুল ॥ আপনার ঠিকানাটা বলুন, টাকা দিয়ে আসবো মাসে মাসে।

শীতলবাবু ॥ ঠিকানার দরকার নেই! মাসেরও প্রয়োজন নেই। আমি এ
দোকানে আসবো, তুমি আমার হাতে টাকাটা দিয়ে দিও প্রতি মাসে
হ্যাঁ—আর দ্বিতীয় শর্ত টাকাটা আমি তোমাকে দিয়েছি একথা কাউকে
ব'লবে না, ম'রে গেলেও ব'লবে না, ওকে আমি নীতি বিগর্হিত মনে
করি। ভাল কথা, আজ স্পেশাল মেনু কি দোকানের—

গোকুল ॥ আজ ভালো ফ্রাই তৈরী হয়েছে ভেটকীর।

শীতলবাবু ॥ হুঁ, চলো দুটো খেয়েই যাই। বাড়ীতে ত' আর ওসব জিনিস
খাবার জো নেই ছেলে-পিলের জ্বালায়!

[গোকুল ও শীতলবাবু দোকানে ঢুকে যান]

[আর কিছু খরিদ্দার দোকানে ঢোকে-বেরোয়, রাস্তা
লোক চলাচল বৃদ্ধি পায়। কিছু পরে দোকানের মালি
ও পূর্ববর্ণিত শীতলবাবু কথা কইতে কইতে বাইরে
আসেন।]

মালিক ॥ মানে ক'দিন ধ'রেই ব'লবো ভাবছিলুম। আমার ছেলেটি
পড়াশুনো ত' একদম হচ্ছে না। যদি দয়া ক'রে একটু প্রাইভেট
পড়াতেন। মাইনের জন্যে আটকাবে না! আগের টিউটরকে আমি
চল্লিশ টাকা দিতাম।

শীতলবাবু ॥ আমার কাছে পড়াবেন? কিন্তু তাতে ত' আপনার খুব
সুবিধে হবে না।

মালিক ॥ কেন?

শীতলবাবু॥ অর্থাৎ আমি ত' আর ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক নই। অত টাকা মাইনে যখন দেবেন তখন একজন পরীক্ষক টিউটর রাখতে পারতেন, তাতে আপনার ছেলের অন্তত স্কুলফাইন্যাল পর্যন্ত ভাবনা থাকতো না।

মালিক॥ হাঃ হাঃ হাঃ, আজ্ঞে না, আমি চাই ছেলে শিক্ষিত হোক, আর একটু চরিত্রবান হোক। পরীক্ষায় পাশটাই ত' আর শেষ কথা নয়।

শীতলবাবু॥ যাক, বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ তা'হলে এখনও এদেশে কিছু আছে। বেশ, বেশ। পাঠিয়ে দেবেন আপনার ছেলেকে আমার বাড়িতে। অত টাকা লাগবে না। কোন্ ক্লাসে পড়ে ?

মালিক॥ ক্লাস এইট।

শীতলবাবু॥ ষোল, ষোলই দেবেন। হ্যাঁ, ঐ গোকুল ব'লে যে ছেলেটি আপনার দোকানে চাকরি করে ওকে একটু দেখবেন। ছেলেটির পড়শুনায় বেশ আগ্রহ।

মালিক॥ আজ্ঞে হ্যাঁ দেখছি ত'। ভদ্রলোকের ছেলে, কলোনীতে থাকে। একজন চাপিয়ে গেছে আমার ঘাড়ে। সেই থেকে এখানেই আছে। বাঙালীকে বাঙালী দেখবে না ত' আর কে দেখবে বলুন।

শীতলবাবু॥ হুঁ, (একবার মালিকের মুখের দিকে তাকান) আচ্ছা চলি, নমস্কার। হ্যা, একদিন মাসের প্রথম দিকে মটন বিরিয়ানী ক'রবেন, বহুদিন খাইনি। ছেলেপিলের জ্বালায় ওসব খাওয়া-দাওয়া ত' আর হ'য়ে ওঠে না বাড়িতে—চলি নমস্কার। (বেরিয়ে যান)

মালিক॥ নমস্কার। (দোকানের ভেতরে যান, অল্পক্ষণ পরেই চিৎকার করে ডাকেন) এ্যায় ঝড়ু-অন্তা শোন, শোন সব এধারে। এ্যাঁ, এইমাত্র একখানা দশ টাকার নেট রেখে গেলুম, কোথায় গেল সেই টাকা ?

[ঝড়ু ও অনন্ত পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে ঘাড় নাড়ে]

ঘাড় নাড়লে ত' চলবে না। দু' মিনিট হয়নি আমি মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরে গেছি, এর মধ্যেই দশটা টাকা উধাও। কে সরিয়েছিস বল?

ঝন্টু॥ আমি জানি না।

অনন্ত॥ আমি এধারে আসি নি।

মালিক॥ এধারে আসো নি ত' টাকার পাখা গজালো নাকি?

[চিৎকারে রাস্তার লোক জমতে সুরু করে

সব চালান দোব। সবকটাকে চালান দোব। বল, বল এখনও।

ঝন্টু॥ গোকলো ত' এখানে ঘোরাঘুরি করছিল—।

মালিক॥ গোকলো—(ভীত গোকুল এসে দাঁড়ায়, সে কাঁপছে) টাকা সরিয়েছিস ক্যাশ থেকে?

গোকুল॥ টাকা!

মালিক॥ হ্যাঁ, দশ টাকার নোট।

[ঝন্টু ফস্ করে গোকুলের কোঁচায় টান মারে

ঝন্টু॥ এটা কি বাঁধা?

গোকুল॥ এ-এ আমার টাকা।

মালিক॥ দেখি দেখি···। এই ত' দশ টাকার নোট!

গোকুল॥ এ আমার···।

মালিক॥ তোর বাবার জন্মে এত টাকা দেখেছিস বেটাচ্ছেলে, চোর কাঁহাকা

গোকুল॥ আমি চুরি করিনি···।

মালিক॥ ফের মিথ্যে কথা! লেখাপড়া শিখছেন, এর নাম লেখাপড়া!

গোকুল॥ আমি চুরি করিনি। আমাকে দিয়েছেন···।

মালিক: কে দিয়েছে?

গোকুল॥ (ইতস্ততঃ করে) একজন দিয়েছে।

ালিক ॥ একজন দিয়েছে। তোমার শ্বশুর ঘোরাঘুড়ি করছে চতুর্দিকে, টাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে তোমায়। শুয়ার কি বাচ্চা, চল্ চল্ এক্ষুনি থানায়, চল্—

[উপস্থিত দু'একজন বলে—'যাকগে ছেড়ে দিন, ছেলেমানুষ'।]

ছেড়ে দোব? ছেড়ে দোব কি মশায়। চোর তার ওপর মিথ্যেবাদী; ভদ্রলোকের ছেলে, পেটের দায়ে চাকরি করতে এসেছে, একে এখন থেকে শায়েস্তা না করলে পরে যে ডাকাত হবে মশায়। ওঃ দু'মিনিট হয়নি জানি এখুনি ফিরবো—ক্যাশ বাক্সটায় আর চাবি দিই নি। এর মধ্যেই ফাঁক! তোমাকে ভাল ছেলে ব'লে জেনেছিলুম। তোমার পেটে পেটে এত! চল্ চল্ শুয়ার থানায়।

[ওকে ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় বার করে, তারপর ঠেলে নিয়ে যায়। জনতা অনুসরণ করে। অনন্ত করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঝড়ু কি বলতে পেছনে পেছনে গিয়ে পেছিয়ে আসে। আলো নিভে যায়।]

[আবার আলো জ্বললে দেখা যায় শেষ রাত্রি। ল্যাম্প পোস্টটা জ্বলছে। শূন্য রাস্তা, দুরে দু'একটা পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যায়। দু'টো হাল্কা টেবিল ফুট-পাথে বিছিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে অনন্ত আর ঝড়ু শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ উসখুস করে ঝড়ু উঠে পড়ে বেঞ্চি থেকে। বিড়ি ধরায়। পায়চারি করে। ওকে লক্ষ্য করে অনন্ত বলে—]

অনন্ত ॥ ঝড়ু, এ্যাই ঝড়ু...

ঝড়ু ॥ এ্যা—

অনন্ত ॥ থানায় খুব মারে—না ?

ঝড়ু ॥ জানি না।

অনন্ত ॥ তুই ত' গেছিস্ কতবার···।

ঝড়ু ॥ গেছি ত' মুখস্থ ক'রে রেখেছি নাকি কখন কি করে

অনন্ত ॥ (উঠে বসে) গোক্‌লো চুরি করেনি, বুঝলি···।

ঝড়ু ॥ (চমকে) কি করে জানলি ?

অনন্ত ॥ ও ত' চোর নয়।

ঝড়ু ॥ তবে কি আমি চুরি করেছি ?

অনন্ত ॥ ওর বাবা-মা যদি জানতে পারে কত ভাববে।

ঝড়ু ॥ (একবার দৃষ্টিতে অনন্তকে দেখে) হুঁ।

[পায়চারি করে, বিড়িটা টান মেরে ফেলে দেয়। তারপর শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপচাপ।]

ঝড়ু ॥ অন্তা, ঘুমুলি—

অনন্ত ॥ না।

ঝড়ু ॥ আচ্ছা, আমি যদি কাল সকালে থানায় গিয়ে বলি যে, ও চুরি করে নি, আমি চুরি করেছি, তা হ'লে ওকে ছেড়ে দেবে না ?

অনন্ত ॥ ও থানা বড় খারাপ জায়গা, দু'জনকে পুরে রেখে দেবে হাজতে তারপর কেস হবে, প্রমাণ হবে, তবে—

ঝড়ু ॥ হুঁ···। (কিছুক্ষণ চুপচাপ) অন্তা ঘুমুলি ?

অনন্ত ॥ না।

ঝড়ু ॥ (উঠে বসে) আমার নাম ঝড়ু হ'ল কেন জানিস ?

অনন্ত ॥ কেন ?

ঝড়ু ॥ ঝড়ের রাতে জন্মেছিলুম—

অনন্ত ॥ কি ক'রে জানলি তুই ?

ঝড়ু ॥ মা-র কাছে শুনেছি। মা ছিল আমার···

অনন্ত ॥ হাঃ, হাঃ, হাঃ, সবাইকারই থাকে রে—

ঝড়ু ॥ না রে—আমি দেখিছি তাকে। ঐ রামকেষ্ট দাস লেনে বাবুদের বাড়িতে চাকরি ক'রতো। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে যেতুম, আর আমাকে বাবুদের বাড়ি থেকে চুরি করে দুধ খাওয়াত রোজ। খাওয়া হয়ে গেলে—এই ছ্যাখ, ছ্যাখ না শালা, এইভাবে মুখ মুছিয়ে দিয়ে আমার গালে একটা চুমু খেতো—হাঃ হাঃ হাঃ। (কিছুক্ষণ নীরব থেকে সদীর্ঘশ্বাসে) তারপর কোথায় যেন চলে গেল······(হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সুর করে) 'লেকে পহ্‌লা পহ্‌লা প্যার' (পায়চারি করে) আঃ, শালার বাতটা শেষ হয় না।

অনন্ত ॥ চুপচাপ শুয়ে ঘুমো একটু।

ঝড়ু ॥ (আবার শুয়ে পড়ে) অন্তা ?

অনন্ত ॥ হুঁ······

ঝড় ॥ কত নক্ষত্তর দেখেছিস—

অনন্ত ॥ হুঁ···

ঝড়ু ॥ এক একটা মানুষ মরে আর এক একটা নক্ষত্র হয় জানিস।

অনন্ত ॥ হুঁ···

ঝড়ু ॥ আচ্ছা আমরাও একদিন অমনি নক্ষত্তর হ'য়ে যাবো।

অনন্ত ॥ হুঁ···

[কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। বোঝা যায় উভয়ের চোখেই তন্দ্রা নেমে এসেছে। অল্প পরে ফটফট করে হোস পাইপের শব্দ, একজন গ্যাস বাতি নিভিয়ে যায়। যথারীতি ভোর হয়, সকালের আলো ফোটে লোক চলাচল সুরু হয়। ঝড়ু ও অনন্ত টেবিল দোকানে তুলে দেয়। অনন্ত

উনুনে আগুন দেয়, ধোঁয়া ওঠে। ঝড়ু দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ঠক্ ঠক্ লাঠির আওয়াজ শোনা যায়। বৃদ্ধ অবিনাশ চৌধুরী এগিয়ে এসে দোকানের দরজায় ডাকে—'গোকুল'—'গোকুল' ঝড়ু দ্রুত ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা টিনের কৌটো সমেত। তারপর ইতস্ততঃ করে অতি নিম্ন স্বরে···]

ঝড়ু ॥ বাবা—

অবিনাশ ॥ (চমকে) কে ?

ঝড়ু ॥ বাবা—

অবিনাশ ॥ গোকুল ? দেহি, দেহি, (হাতড়ায় কিন্তু ঝড়ু দূরত্ব বজায় রাখে শরীর ভাল আছে ত ? অত ধীরে কথা কস ক্যান— ?

ঝড়ু ॥ (গোকুলের অনুকরণে পূর্ববঙ্গীয় টানে) না বাবা, ভালই আছি দোকানে অনেক খরিদ্দার আমার সময় নাই, এই লও দশটা টাকা। সেই বাবুটি দিছেন।

অবিনাশ ॥ বাবু দিছেন, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

ঝড়ু ॥ বাবা—

অবিনাশ ॥ এ্যাঁ—

ঝড়ু ॥ কাল যে আধুলিখানা হারাইছিলাম না, আজ পাইছি। এই লও।

অবিনাশ ॥ পাইছস্—আঃ। ওবে তুই মোর অন্ধের লাঠি আয় কাছে আয়—

[এগিয়ে যায়, কিন্তু ঝড়ু, দূরত্ব বজায় রাখে

ঝড়ু ॥ বাবা, আমি তাইলে যাই—

অবিনাশ ॥ হ, হ, যাও, পড়াশুনা কর, মন দিয়া পড়াশুনা কর। মানুষ হইতে হইবে। এই দোকানের এই কাম, একি ভদ্দরলোকের ছাওয়ালের কাম। এই ত্যাহ—এক্কেরে ভুইল্যা গেছি, আমাগো গাইডা বিয়াইছে।

পেরথম দুধ তোর লাইগ্যা পাঠাইছে তোর মা। দুধটা খা, তোর লেখাপড়ার কাম করতে হইবে। মাথার কাম করতে হইবে। পাত্তরটা আমারে দে খালি কইর‍্যা লইয়া যাই।

[একটা ঘটি এগিয়ে দেয়। ঝড়ু ঘটিটা নিয়ে দুধটা ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে সবটা ঢক ঢক করে গিলে ফেলে—তারপরে ঘটিটা অবিনাশবাবুকে ফেরৎ দেয়।]

অবিনাশ ॥ থ'ইলে আমি গেলাম—

ঝড়ু ॥ আস।

অবিনাশ ॥ ভাল থাক, মন দিয়া পড়াশুনা কর। মানুষ হইতে হইবে। পাঁচজনের একজন হইতে হইব............ভদ্দরলোকের ছাওয়াল—(ধীরে ধীরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে যান অবিনাশ চৌধুরী)

[ঝড়ু একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে—কিছুপর নিজের কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছে নেয়। ওর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।]

॥ চরিত্র ॥

১ম কনেস্টবল

২য় কনেস্টবল

অফিসার

বাউল

অনৈক লোক

অরুণোদয়ের পথে

সলিল চৌধুরী

[ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মঞ্চ থেকে
বিভিন্ন সময় অভিনয় করেছিলেন
—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজ আমেদ খাঁ,
উৎপল দত্ত, সুনীল দত্ত, সন্তোষ দত্ত।]

[একটা জেটির ধারে শিকল আর খোঁটা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে—মাঝখানে একটা বিরাট পিপে। একপাশে একটা রেলিং দেওয়া সিঁড়ি বরাবর নীচের দিকে নদী পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। চাঁদনী রাত। একজন পুলিশ অফিসার আর দুজন কনস্টেবলদের একজনের হাতে একটা আঠার পাত্র—সে সেটা নামিয়ে রাখে; আর একজনের হাতে এক বাণ্ডিল প্লাকার্ড—সে সেটা খোলে।]

১ম কনস্টেবল ॥ (পিপেটা দেখিয়ে) এইটের গায়ে নোটিশটা লাগানো যাক্—কি বল ?

২য় কনস্টেবল ॥ ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করি। (অফিসারকে) এখানে নোটিশটা লাগালে কি ভাল হবে স্যার ?

[অফিসার উত্তর দেয় না]

১ম কনস্টেবল ॥ নোটিশটা কি পিপের ওপর লাগাব ?

অফিসার ॥ (নিজের মনে বলতে থাকে) হুম্…সিঁড়িগুলো দেখছি বরাবর নদী পর্যন্ত নেমে গেছে—জায়গাটায় কড়া নজর রাখতে হবে। এখান দিয়ে নেমে গিয়ে থাকলে হয়তো কোন নৌকো এসে ভিড়বে !…হুম্…

১ম কনস্টেবল ॥ (চেঁচিয়ে) এই পিপেটায় নোটিশটা টাঙাব স্যার ?

অফিসার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, টাঙাতে পার—টাঙাও। (তারা দুজন আঠা লাগিয়ে নোটিশ মারতে থাকে, অফিসার লেখাটা পড়ে) এক হাজার টাকা পুরস্কার ! চুল—কৃষ্ণবর্ণ, চোখ—কৃষ্ণবর্ণ, গায়ের রঙ—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখ মসৃণ, লম্বা—পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি।·· নাঃ, এ দিয়ে কোন মানুষকে চেনা যেতে পারে না। অন্তত কয়েক লক্ষ লোক আছে যাদের এ রকম চেহারা। · জেল ভেঙে বেরোবার আগে লোকটাকে একবার দেখতে পর্যন্ত পারলুম না। চুঃ চুঃ ! অথচ কত কি শুনছি ! সে নাকি অদ্ভুত ! এত বড় আন্দোলনটা নাকি তার বুদ্ধিতেই চলছে। এইভাবে জেল ভেঙে পালানোর ক্ষমতা বাংলাদেশে নাকি আর কারো নেই ! গুজব, স্রেফ গুজব। নিশ্চয়ই জেলারদের মধ্যে তার কোন বন্ধুটন্ধু ছিল। তারা না সাহায্য করলে কেউ কখনো এ-ভাবে পালাতে পারে না। কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত এই সব জেলারদের !

২য় কনস্টেবল ॥ কিন্তু স্যার, ওর মত একজন লোককে ধরবার জন্যে এক হাজার টাকা মাত্র পুরস্কার বড় কম। অবিশ্যি এটা ঠিক যে পুলিশের মধ্যে যেই তাকে ধরুক তার প্রমোশন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

অফিসার ॥ হুম্, দেখ। এই জায়গাটায় আমি নিজে নজর রাখতে চাই !

১ম কনস্টেবল ॥ আচ্ছা স্যার ! (কনস্টেবল দুজন ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চায়)

অফিসার ॥ তিনি যদি হঠাৎ এখানে এসে উদয় হন আমি মোটেই আশ্চর্য হব না। জায়গাটা যে-রকম—তাতে—হয়তো ওদিক থেকে সে আসবে —আর এদিক থেকে নৌকোটা আসবে—আর তখন আমি এই এমনি করে রিভলবারটা ধরে নামব নিচের দিকে·· ~~ধাঁই ধাঁই ধাঁই~~···কিন্তু যদি একবার ফসকায় আর সারা জীবনে তাকে খুঁজে পেতে হবে না। হয়তো কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাকবে আর দেশের লোক শালারা

জানলেও কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। আমার মত লোক এক হাজার টাকা পেল কি না পেল তাতে ওদের বয়েই গেল !

২য় কনস্টেবল ॥ তারা তো ধরিয়ে দেবেই না, উল্টে আমরা যদি ধরি তে শালারা গালাগাল করবে স্যার ! আর কাকেই বা বলব স্যার, নিজের আত্মীয়-স্বজনরাই গালাগাল করে !

অফিসার ॥ (সামলে নিয়ে) তাতে কী হল ? পুলিশে যখন আছি তখন আমাদের কর্তব্য আমাদের করে যেতেই হবে। এ তো আর ছেলে-খেলা নয়—সারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রাখার ভার আমাদের ওপর ! আমরা না থাকলে এই গোটা দেশটাই আজ ওলটপালট হয়ে যেত। (স্বগত) যারা আজ নিচে সবাই উঠত ওপরে, আর যারা ওপরে ?··· (কনস্টেবলদের উদ্দেশ্যে) যাক তোমরা তাড়াতাড়ি কর···এখনে অনেক জায়গায় নোটিশ টাঙানো বাকি রয়েছে। কাজ শেষ হলে আবার চলে আসবে এখানে...বেশি দেরি না হয় ! হ্যাঁ আলোটা তোমরা নিয়ে যেতে পার। (টর্চটা দেয়) জায়গাটার আশেপাশে জনমনিষ্যি নেই···নির্জন খাঁ খাঁ করছে একেবারে !

১ম কনস্টেবল ॥ কি করব স্যার ! আপনার সঙ্গে থাকতে পারছি না। এন্‌ফোর্সমেণ্ট নাকি এসে পৌছয় নি ! ওর মত লোক জেলে থাকতে থাকতেই গরমেণ্টের উচিত ছিল আরও পুলিশ নিয়ে আসা। আচ্ছা আমরা তাহলে চলি স্যার ! (দুজনের প্রস্থান)

[অফিসার পায়চারি করতে থাকে আর একবার করে নোটিশটার দিকে তাকায়]

অফিসার ॥ এক হাজার টাকা আর প্রমোশন ! ওঃ ! এক হাজার টাকা পেলে কত কী করা যায় ! কিন্তু টাকার জন্যে তো নয়—এ আমার কর্তব্য ! দেশের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি চালাচ্ছে যারা

গরীব বড়লোকে ঝগড়া বাধিয়ে হিংসের সৃষ্টি করছে—তাদের ধরা হচ্ছে পেট্রিয়টিক ডিউটি! কমিশনার যা বলেন ঠিক বলেন! (পায়চারি করে আবার পোস্টার পড়ে) এক হাজার টাকা! সুমিতার কতদিনের শখ একসেট জড়োয়া গয়না—বেচারা কোথাও বেরোতে পর্যন্ত পারে না। মেয়ের বিয়ে দিতে তো অর্ধেক বিকিয়ে গেল!...কমিশনার মাইনে পান কত?···না না—আবার গরীব বড়লোক এসে যাচ্ছে—শ্রেণীসংগ্রাম না কি বলে যা তা···ওঃ! লোকগুলো দেখছি আমাকেও পেয়ে বসছে! ডেন্‌জারাস থট্! (পায়চারি করতে থাকে)···কিন্তু এক হাজার টাকা! আমি চুরি করছি না—আমার প্রাপ্য—My reward! কেন নেব না? আমার ডিউটি করে আমি নেব! নিশ্চয় নেব···হাঃ এই তো সমস্যার সমাধান! কিন্তু আমি কি পাব? ভগবান! আমার মত লোকের বরাতে কি আর এক হাজার টাকা জুটবে?

[শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় পরা একজন লোক ঢোকে। একমুখ দাড়ি গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল। হাতে একতারা। লোকটা অফিসারকে পেরিয়ে চলে যেতে থাকে। অফিসার হঠাৎ ফিরে দেখে]

এই! কিধার যাতা?

লোক॥ হেঁ হেঁ...এই যেতেছি কত্তা, এদিক পানে যেতেছি। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উটে অমনি ডুই দিকে চলি যাব! (যেতে থাকে)

অফিসার॥ দাঁড়াও! কে তুমি?

লোক॥ এজ্ঞে আমি একজন বাউল গো কত্তা। ঐ মাজি-মাল্লাদের দুটো গান শোনাব বলে যেতেছি আর কি। (আবার যেতে থাকে)

অফিসার॥ এই! বলছি না দাঁড়াতে? ওদিক দিয়ে যাওয়া আজ বন্ধ। যাও, ভাগো হিঁয়াসে!

বাউল ॥ যাওয়া বন্দ বুঝি? আচ্ছা গো বাবু, তাহলি যাই। গরীবির বন্নাতে আর কোন সুখ নি গো বাবু—সারা জগতই তার বিরুদ্ধে!

অফিসার ॥ তুমি কে? ঠিক করে বল তুমি কে?

বাউল ॥ এজ্ঞে তা ঝদি বলতি বল কত্তা, শোনলে আপনার খুউব ভালো নাগবে। তা বাগগে আমার নাম হোল গে আপনার ইয়ে—ভদ্দেশ্বর ধাড়া—একজন বাউল আর কি।

অফিসার ॥ ভদ্রেশ্বর ধাড়া! কই নামটা তো আগে কখনো শুনেছি বলে মনে হয়না?

বাউল ॥ সে কি কত্তা, আমার নাম শোননি? তা হতি পারে—তবে সোনারপুরির নোকেরা ও নাম একবার উচ্চারণ করলিই চেনবে। তা আপনি বুঝি কখনো সোনারপুরে যাওনি কত্তা?

অফিসার ॥ তা এখানে কি করতে এসেছ তুমি? কি মতলবে?

বাউল ॥ এই দুটো পয়সার ধান্দায়—ভাবলাম মাজ্জিদের কাছে গান শোনালি হয়তো দুটো চারটে পয়সা মিলতি পারে—হেই আর কি। তা অনেকখানটা পথ হেঁটে আসতিছি গো কত্তা! হেই ধরো গে আপনার চৌয়াটি বে—গাঁড়ে হয়ে—

অফিসার ॥ তা যদি এতদূর হেঁটে আসতে পেরে থাক, আরও কিছুদূর যেতে পারবে। এখানে তোমার থাকা হবে না—যাও।

বাউল ॥ হাঁ তা যাব বইকি কত্তা—আমি কি আর চেরকাল এখানেই থাকব। ঝেখানে যাবার আমি ঠিক যাব। (সিঁড়ির দিকে যায়)

অফিসার ॥ এই! ওদিকে নয়—এদিক দিয়ে যাও। চলে এস সিঁড়ির ধার থেকে!

বাউল ॥ আমি যাবুনি গো কত্তা—এই সিঁড়ির ওপর চুপটি মেরে বসে থাকব। দেখি ঝদি কোন মাজ্জিমাল্লা এদিকে এসে পড়ে। এর আগেও তো

দেখিচি অনেক আত্তির পের্যন্ত হয়তো কোন মালটাল নিয়ে জাহাজে ফিরে যায়। দুটো চারটে পয়সা দিলি কাল সকালের খাওয়াটা হয়।

অফিসার॥ (রেগে যায়) আমি বলছি তোমাকে ভালয় ভালয় ওখান থেকে সবে পড়। আজ রাত্তিরে কাউকে এই জেটির ধারে থাকতে দেয়া হবে না—যাও নিকালো! (চাবুক আস্ফালন করে)

বাউল॥ (ভয়ে ভয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ যাই কত্তা—এবার ঠিক চলে যাব···যাচ্ছি ···গরীবের ওপর আর নাঞ্ছনার শেষ নি—(চোখের জল মোছে, ফের দাঁড়ায়)

অফিসার॥ কি হল আবার দাড়ালে কেন?

বাউল॥ এই একটা কতা বলব কত্তা? বালই চলে যাব—হেঁ হেঁ—! তা আমি তো চলেই যেতেছি—কিন্তু যাবার আগে আপনি একটা গান শোনবে কত্তা! শোনলে আপনার নিশ্চয় ভাল লাগবে—একেবারে কানের মধ্যি দিয়ে সেঁদিয়ে পরাণের সঙ্গে কথা কয়ে যাবে—হেঁ হেঁ—। (সুর দেয় একতারায়) এটা হোলগে আপনার অনাবিষ্টির গান।

অফিসার॥ আচ্ছা জ্বালালে তো! যাও! যাও এখান থেকে!

বাউল॥ আচ্ছা আপনি একবার শুনিই ছাখো—ভাল না নাগলি তখন আমি চলে যাব। (গান শুরু করে)

আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই।
আসমান অইল টুটা ফুড
জমিন আইল ফাড়া
আর ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়া আছে
পানি দিব্ব কেডা!···

অফিসার॥ ব্যস্—যাও এবার এখান থেকে. এখানে হাল্লা করলে ভীষণ মুস্কিল হবে।

বাউল ॥ আচ্ছা— (হন্ হন্ করে সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে থাকে)

অফিসার ॥ এই ! আবার ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

বাউল ॥ এজ্ঞে আপনি তো বল্লে আমারে চলে যেতে, তাই চলে যাচ্ছি।

অফিসার ॥ রাস্কেল কোথাকার ! যেদিক থেকে এসেছ সেদিকে চলে যাও।

বাউল ॥ (কাতরভাবে) এজ্ঞে যেথান থেকে এইচি আবার সেথানে চলে যাব ?

অফিসার ॥ ভাল কথায় হবেনা তোমার ! (ঘাড় ধরে) যাও বেরোও এখান থেকে—বেরোও ! (ধাক্কা দেয়। কিছুদূর গিয়ে বাউল আবার দাঁড়িয়ে পড়ে—নোটিশটা হঠাৎ দেখতে পেয়ে মন দিয়ে দেখতে শুরু করে) আবার দাঁড়াচ্ছ কেন ? এবার চাবকে তোমায়—

বাউল ॥ ও ! এতক্ষণে বোঝলাম !

অফিসার ॥ কি বুঝলে ?

বাউল ॥ এতক্ষণে বোঝলাম আপনি কেন এত ছিটফিট করতিছ—আর কার জন্মি অপেক্ষা করতিছ !

অফিসার ॥ তাতে তোমার কি ?

বাউল ॥ এজ্ঞে কিছু লয়। আমি নোকটারে চিনি কিনা—মানে বেশ ভাল করেই চিনি কিনা—তাই আর কি। তা সে যাগ্‌গে—আমি চলি—

[যেতে থাকে]

অফিসার ॥ তুমি চেন ওকে ?…এই ! এদিকে এস—এদিকে এস !

বাউল ॥ এজ্ঞে আমারে আবার কেন ফিরে আসতি বলতিছ কত্তা—ওরে বাবা ! শেষে কি সবংশে মারা পড়ব কত্তা ?

অফিসার। ও কথা কেন বলছ ? কেমন লোক সে ?

বাউল ॥ (দু'হাত কপালে ঠেকায়) আমি ওসবের মধ্যি ঘুণাক্ষরেও নি কত্তা, আমি চলি। ও দশ হাজার টাকা পেলিও আমি আপনার মত হতাম না কত্তা…বাপ্‌স ! (চলে যেতে থাকে)

অফিসার ॥ এই! এদিকে এস! শুনে যাও (জামা ধরে নিয়ে আসে) কেমন লোক সে, কোথায় দেখেছ তুমি? শিগ্‌গির বল, নইলে তোমাকে শুদ্ধু জেলে পুরব।

বাউল ॥ ওরে বাবা! বোকা লোক পেয়ে যে একেবারে আমারে মারীচের কলে ফেললে কত্তা! এখন কোন্ দিকে যাই আমি—ওদিকে রাবণের বাণ এদিকে রামের—

অফিসার ॥ ওকে কোথায় দেখেছ তুমি?

বাউল ॥ (ভয়ে ভয়ে চারিদিক চেয়ে) এজ্ঞে আমার দেশেই আমি তারে দেখেচি—সোনারপুরিতেই। আমি আপনারে সোজা কথা বলতিছি কত্তা তার দিকে চাইলি আপনার অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে যাবে। তার সঙ্গে এক জায়গায় থাকতি পের্যন্ত আপনার গা ছমছম করবে। ছুরি, লাঠি, বন্দুক, কামান, বোমা এমন কোন অস্তর নিই যা সে আপনার চালাতি জানে না। আর তেমনি শক্তি—হাতের এই গুল্ যেন এই নোয়ার মত শক্ত (পিপেটা চাপড়ায়) নোয়ার মত শক্ত!

অফিসার ॥ (একেবারে বেকুব বনে গিয়ে) এত সাংঘাতিক লোক সে?

বাউল ॥ হ্যাঁ কত্তা। তারে সাংঘাতিক বলতি পার বটে!

অফিসার ॥ তুমি এ সব ঠিক বলছ তো?

বাউল ॥ ঠিক নয় আবার? ঠিক না হলি তো আমিও থাকতি পারতাম আপনার সঙ্গে!…একবার এক বেচারি সারজন্ট আমাদের ওখানে এয়েছ্যাল! তুই আপনার কেনিং থেকে—তা আপনারে বলব কি কত্তা—দেখ এখনও আমার গায়ে কাঁটা দি উটতেছে…একটা এই এমনি পাথর দিই তারে শেষ করে দিলে!

অফিসার ॥ কই, এ খবর শুনিনি তো কখনো?

বাউল ॥ কোথেকে শোনবেন কত্তা! যা সব ঘটনা ঘটে তার সবি কি আর রটে! আর এ সব নিয়ে বলাবলি করবে কার ঘাড়ে এমন দুটো মাতা

আছে ! আর একটা ঘটনা···সেও একজন পুলিশ—অবশ্যি সাদা জামা কাপড়-পড়া। ব্যাপারটা ঝ্যান কোথায়···হ্যাঁ সেই ডায়মণ্ডহারবার·· সেই ঝেবারে আপনার চন্দননগরির থানা লুট হল ঠিক তার পরে·· সেও এমনি চাঁদনী রাত···এই রকম নদীর ধার···কি যে ঘটল তা কেউ বলতি পাবল না···নোকটা যেন হাওয়ার মধ্যে উপে গেল !

অফিসার ॥ (ডুবার ঢোঁক গিলে গলাখাঁকরি দিয়ে) মানে, এ সব ঠিক বলছ তো তুমি ? ওঃ ! বাংলাদেশে থাকাটাই একটা বিপজ্জনক ব্যাপার !

বাউল ॥ ঠিক ! ঠিক বলেছেন কত্তা ! একেবারে খাঁটি কতা ! হয়তো আপনি এখানে দেঁইড়ে আছ তুই দিকে চেয়ে—মনে কর আপনি নোকটাবে দেখলে জেটিব এই ধার দে গুঁড়ি মেবে মেরে আসতিছে·· কোথাও কিছু নিই আবার দেখবে হঠাৎ সে ওইধার দে আসতিছে। আপনি নিজে কোথায় দেঁইড়ে আছ এ-কতা ভাল করে বোঝপাব আগেই সে একেবারে আপনাব ঘাডেব ওপর নেইপে পড়বে।

অফিসার ॥ (ভীষণ চমকে উঠে) চুপ কর ! ওঃ ! এ রকম একটা লোককে ধরার জন্যে আমি একলা কি করব ? একদল পুলিশ দেয়া উচিত ছিল ওদের !

বাউল ॥ তা তো বটেই ! অবিশ্যি আপনি যদি মনে কর তাহলে আমি আপনার সঙ্গে জেটিব এই দিকটায় নজর রাখতি পারি ! তা আপনাব কাছে বন্দুক আছে তো কত্তা ? তাহলি আমি বরং এই পিপেটার উপরি বসে থাকি !

অফিসাব ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি তো তাকে দেখলে চিনতে পারবে, তাই না ?

বাউল ॥ এক কোশ দূর থে আমি তারে চিনতি পারব কত্তা !

অফিসার ॥ কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ঐ টাকার ভাগ চাইবে না ?

ডল ॥ এজ্ঞে কত্তা—আমার মত একজন গরীব নোক—হাটে-মাঠে গান করে আমারে খেতি হয়—আমি তারে ধরিয়ে দিইছি জানলি আর নোকে একটা পয়সাও দেবে না !···আমি বরং চলি কত্তা, আমার তো থাকার কোন দরকার নি তেমন—সহরে আমি নিশ্চিন্তে থাকব'খন।

ফিসার ॥ না না—তুমি এখানে থাকতে পার—তুমি থাক।

উল ॥ যা বলেন আপনি ! (পিপেটার ওপর উঠে বসে। অফিসার পায়চারি করতে থাকে—বাউল দেখে) কত্তা !···আপনারে দেখে আমি অবাক হচ্ছি কত্তা ! সেই তখন থেকে যে রকম ভাবে আপনি ঘোরাঘুরি করতেছ কই তাতে তো আপনি অবসন্ন হচ্ছ না ?

ফিসাব ॥ অবসন্ন হলেও আমার অভ্যেস আছে।

উল ॥ এই পিপের উপরি অনেকখানি জায়গা রয়েছে। একটু জিরিয়ে নিলি পারতে—আজ আত্তিরেই তো আবার অনেক ধকল পোয়াতি হতি পারে ! আর এখেনে উটলি আপনি অনেকখানি দূর পের্যন্ত দেখতিও পাবে।

সার ॥ হুম্...তা বটে ! (উঠে বসল)

[অফিসার আর বাউল দুজনে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল। দূর থেকে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। অফিসার মাঝে মাঝে এদিক ওদিক দেখছে]

ফিসার ॥ তুমি এমনভাবে কথা বল শুনলে গায়ের মধ্যে কেমন শিরশির করতে থাকে !···

উল ॥ দেশলাই আছে কত্তা ?···(অফিসার পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে দেয়—বাউল একটা বিড়ি বের করে ধরায়) খাবেন নাকি একটা ? (অফিসার একটা সিগারেট বের করে) হ্যাঁ খেয়ে নাও ! খেলি অনেকটা শোয়াস্তি পাবেন। দাঁড়ান আমি জ্বেলে দিচ্ছি—হুঁ হুঁ

এদিকে মুখ ফেরাবেন না—জেটির ওপর থে একটু নজর নাড়বে না—(ধরিয়ে দেয়। দুজনে টানতে থাকে চুপচাপ)

অফিসার ॥ বড় ঝামেলা এই পুলিশের চাকরি। রাত নেই বিরেত নেই কা বিপদ-আপদের মধ্যে—মরলে একটা কেউ আহা বলবে না পর্যন্ত !

বাউল ॥ তা বটে !

অফিসার ॥ অথচ কর্তব্য ! হুকুম তামিল করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করবে না তুমি বিবাহিত কিনা—তোমার ওপ সংসার নির্ভর করছে কিনা—

বাউল ॥ (একতারার সুর দিতে আরম্ভ করে—তারপর গান ধরে)

দিনের শোভা সুর্য রে
রাইতের শোভা চান্দ
আর চাষীর শোভা হালকৃষি
জমিনের শোভা ধান্দ।

অফিসার ॥ (বিরক্তভাবে) আঃ থাম ! ও গান করবার সময় এটা নয়।

বাউল ॥ শরীলটা একটু গরম রাখবার জন্যি গাইতেছি কত্তা ! সে নোকটার কথা মনে পড়লেই আমার গায়ের রক্ত ক্যান হিম হয়ে আসে।

অফিসার ॥ চুপ কর তুমি !

বাউল ॥ একবার ভাবুন তো কত্তা—আমরা দুজনা এখেনে বসে রইছি—আ হঠাৎ দেখি হোই জেটির ধার দে সে থাবা মেরে মেরে গুটিগুটি আসতিছে—এই বুঝি একেবারে নেইপে ঘাড়ে উপরি পড়ে- -

অফিসার ॥ (বাউলের কাছে সরে এসে) তুমি ভাল করে নজর রাখছ তো ?

বাউল ॥ তা তো রাখতিছি কত্ত —আর কোন পুরস্কারের লোভেও নয়।

অফিসার ॥ ভগবান তোমায় পুরস্কার দেবেন।

উল ॥ তা জানি কত্তা—কিন্তু জীবনেরও একটা টান আছে। আমি নোকটা অমনি বোকা! এই ঝ্যাখনই কোন নোককে বিপদে পড়তি দে'খছি ত্যাখনই তারে উদ্ধার করতে নেগিছি—ওটা আমার একটা অব্যেস হয়ে গেছে।

ফসার ॥ বেশ, গান গাইলে যদি তোমার সাহস আসে তাহলে গাইতে পার আস্তে আস্তে-

উল ॥ (আবার সুর দেয়—আর গান ধরে)

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
অভিরামের দ্বীপচালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি চড়ত ঘোড়া
চিনতে যদি না পার মা
দেখো গলায় ফাঁসি!...

ফসার ॥ আঃ থাম থাম! কি সব যা তা বলছ? গান গেয়ে খাও—অথচ গানটাও জান না?

উল ॥ ভুল হল বুঝি কত্তা?

ফসার ॥ ভুল হল না?—গানটার একেবারে শ্রাদ্ধ করে ছাড়লে!

—"হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা
রক্তে মাংসে এক করিতাম
দেখত ভারতবাসী।"

নয়ে বেড়া
হতো এখানে

উল ॥ শৃঙ্খলা রক্ষা বাক হয়ে গেছ কত্তা! একেবারে ঠিক বলেছ—আমার হয়ে গিয়ে

[বাউল ঠিক করে গায়]

…কত্তা! আপনি এসব গান জানো ভাবতি কেমন নাগে—

অফিসার॥ কেন? ওটা তোমার একলার সম্পত্তি নাকি?

বাউল॥ না, তাই বলতিছি।

অফিসার॥ ছোটবেলায় কত গেয়েছি ও সব গান!

বাউল॥ তাই নাকি?…তাহলে…বলেই ফেলি কত্তা?

অফিসার॥ কি? কি বলে ফেলবে?

বাউল। হয়তো আপনার ছোটবেলায় ঠিক এখন আপনি যেমন বসে আ তেমনি করেই বসে থাকতে আর আপনার আশেপাশে আরও অনে ছেলে বসে থাকত আর আপনারা সকলে মিলে গাইতে ক্ষুদিরামে গান!

অফিসার॥ হ্যাঁ—তা গাইতাম—সকলে মিলে গাইতাম

বাউল॥ আর সেই "চিত্তরঞ্জন স্বদেশের প্রাণধন"?

অফিসার॥ হ্যাঁ, তাও গাইতাম।

বাউল॥ "ওদের যতই আঁখি অক্ত হবে?"

অফিসার॥ হ্যাঁ।

বাউল॥ আর "শিকল পরা ছল মোদের"?

অফিসার॥ হ্যাঁ, ওটাও গাইতাম। তাতে কি হয়েছে? ওসব কথা জিগে করছ কেন?

বাউল॥ না, এমনি। আমি ভাবতিছি যে নো… …নজর রাং তুমি আ… আত্তিরে খুঁজে বেড়াচ্ছ সেও হয়ত …লেবেলায় দি(অ… …লোভেও না গানগুলো গাইত!…জগত অতি বিচিত্ত ক… …স্মরণ

ফিসার ॥ চুপ—হিস্-স্-স্…কে যেন আসছে…না ওটা কুকুর।

উল ॥ আচ্ছা কত্তা, এমনও তো হতি পারে হয়তো যাদের সাথে বসে আপনি গান করেছেলে তাদের একজনকেই হয়তো আজ কিম্বা কাল গেরেপ্তার করবে—জেলে পাটাবে।

ফিসার ॥ হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে—কিন্তু এমন করে তো কথনো ভাবিনি।

উল ॥ সত্যি নাও হতি পারে—কিন্তু ভাবতে তো কোন দোষ নি কত্তা! মনে কর সেদিন কোন ছেলে ঝদি আপনারে বলত যে, দেশ স্বাধীন করবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছে—হয়তো আপনিও যোগ দিতে তাব সঙ্গে আব হতে পারে হয়তো আজকেব এই বিপদে আপনিই পড়তে।

ফিসার ॥ হ্যাঁ, তা পারতুম। তখনকাব দিন ছিল আলাদা, তখন মনে একটা তেজ ছিল আমাব!

বাউল ॥ বিচিত্ত জগত কত্তা—বড বিচিত্ত! ছেলে যবে মেঝের উপরি হামাগুড়ি দেয় তখন তার মাও বলতি পাবে না বড হলে সে কি হবে! কে যে কি হবে তা কেউ বলতি পারে না।

অফিসাব ॥ ঠিক বলেছ তুমি! কে যে কি হবে তা কেউ বলতে পারে না। এই ধব আমি, মানে আমাব যদি এত বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকত—স্ত্রী সংসাব ছেলেপুলে না থাকত কিম্বা পুলিশেব চাকরি না পেতুম—হয়তো আজ আমিই জেল ভাঙতুম…কে জানে!…হয়তো আমিই অন্ধকারে লুকিয়ে বেড়াতুম…আর সেই লোকটা যে জল ভেঙে বেরিয়েছে সে-ই হয়তো এখানে আমার জায়গায় বসে থাকত! সে-ই হয়তো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত আর আমিই তাঁ ভাঙতুম। হয়তো আমিই চাইতুম

তার মাথার খুলিটা গুলি করে গুঁড়ো করে দিতে কিংবা একটা পা
দিয়ে এমনি করে এক ঘায়ে তার মাথাটা চুরমার করে দিতুম…আ
তার লাসটা টেনে ঐ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতুম·· হ্যাঁ আমিই করতুম।

[অফিসার হাঁপাতে থাকে। বাউল অবাক হয়ে চে
থাকে। হঠাৎ অফিসার তার গলাটা চেপে ধরে]

না না আমি কিছু হতুম না…এই তোমাকে বলে দিচ্ছি শয়তান।
আমি কোন কথা বলিনি তোমাকে…আমি শুধু দেখছিলুম তোমা
কল্পনার কতদূর দৌড়!

[হঠাৎ কি একটা শব্দ হতেই অফিসার হাত সরিয়ে নে

ওটা কী? কি শব্দ হচ্ছে ওটা? কারা আসছে ওখানে?

[বাউল লাফিয়ে নেমে পড়ে, অফিসারও নেমে পড়ে

বাউল॥ ও কিছু লয় কত্তা, ও কিছু লয়।

অফিসার॥ না, একটা নৌকোর শব্দ হচ্ছে—আমি ঠিক তাই শুনেছিলা
তার দোস্তরা এখানে এসে নৌকো ভেড়াবে। ঐ শোন—

বাউল॥ কত্তা, আমি ভাবতিছি আগে আপনি ছিলে দেশের লোকের স
আর এখন আপনি আছ আইনের সঙ্গে।

অফিসার॥ হ্যাঁ, তখন যদি আমি বোকামি করেও থাকি, সে সব দিন এ
চলে গেছে।

বাউল॥ আমি ভাবতিছি এখনও এমন হ'তি পাবে, আপনার ঐ
আর পোশাক থাকা সত্তেও মাঝে মাঝে আপনার মনে হয়
লোকটার মত আপনিও দেশের পথ ধর।

অফিসার॥ সাট্ আপ! আমার মাথায় কি আসে না আসে তা
তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না!…শব্দটা থেমে গেল মনে হচ্ছে!

বাউল ॥ হতি পারে কত্তা যে এখনও আপনি দেশের নোকের পক্ষেই আছ। আপনার মুখপান দেখলি কেবল আমার ঐ কথাই মনে হয়।

অফিসার ॥ তুমি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বললে খুব খারাপ হবে। কার সঙ্গে কথা বলছ তোমার খেয়াল আছে? (আবার কান পেতে শোনে) হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটা নৌকো আসছে, পরিষ্কার দাঁড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বাউল ॥ (হঠাৎ গাইতে শুরু করে)

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পুজার পাষাণবেদী!

অফিসার ॥ চুপ····এ গান বন্ধ কর।

বাউল ॥ লাথি মার্ ভাঙ্‌রে তালা
যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা
ফেল্ উপাড়ি···

অফিসার ॥ যদি বন্ধ না কর আমি তোমাকে এখনি গ্রেপ্তার করব। (নদীর দিক থেকে শোনা যায় শিষ দিয়ে কেউ ঠিক ঐ সুরটাই বাজাতে থাকে) নিশ্চয় কেউ সংকেত করছে—সিগন্যালিং! হল্ট! দাঁড়াও ওখানে...এক পা নড়লে তোমার খুলি আমি উড়িয়ে দেব···কে তুমি? তুমি বাউল নও···তুমি···

বাউল ॥ ও কথা জিজ্ঞাসা করে আর লাভ নেই···ঐ নোটিশেই লেখা আছে আমি কে—

অফিসার ॥ (বজ্রাহত) তুমি! তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি··

বাউল ॥ (একটানে মাথার চুল আর গোঁফ-দাড়ি খুলে ফেলে) আজ্ঞে

হ্যাঁ, আমি সে-ই—আমার মাথার ওপরেই এক হাজার টাকা পুরস্কা ঘোষণা করা হয়েছে! কিন্তু আমার বন্ধুরা এসে গেছে…তারা নি নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে।

অফিসার॥ তুমি…আপনি…কেন আপনি আমাকে এ-রকম অপ করলেন? আপনি আমাকে কেন ঠকালেন?

বাউল॥ কেন? আমি দেশকে স্বাধীন করতে চাই—দেশের মানুষে ভালবাসি!

অফিসার॥ আমি দুঃখিত! কিন্তু আমার উপায় নেই।

[চুল-দাড়ি কেড়ে নেয়]

বাউল॥ আপনি কি আমায় যেতে দেবেন…না, যেতে দিতে বাধ্য ক আপনাকে?

অফিসার॥ আমি পুলিশের লোক—আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না

বাউল॥ আমি ভেবেছিলাম আমার মুখের জোরেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে (কোমরে হাত দিল) ও কি? ওরা কারা?

[কনস্টেবলদের কথা শোনা যায়—"এ যে এখানেই, এখানে

অফিসার॥ আমার লোকেরা এসে পড়েছে।

বাউল॥ আপনি নিশ্চয় শত্রুতা করবেন না। (পিপের পিছনে লুকো

[কনস্টেবল দু'জন ঢোকে]

২য় ক॥ পালালে নিশ্চয় সে কথা জানাজানি হবে।

[অফিসার চুল দাড়ি পিছনে লুকিয়ে ফেলে]

১ম ক॥ এ দিকে কেউ এসেছিল স্যার?

অফিসার। (চুপ করে থেকে) · না।

২য় ক॥ কেউ না?

অফিসার। না।

১ম ক॥ আশ্চর্য তো!

২য় ক॥ আমাদের কাজ শেষ স্যার। আপনার সঙ্গে এখন থাকতে পারি।

অফিসার॥ কোন দরকার নেই···তোমরা ফিরে যেতে পার।

১ম ক॥ আপনি যে বল্লেন স্যার তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে...আপনার সঙ্গে থাকার জন্যে—

অফিসার॥ না। আমি একলা থাকতে চাই! এরকম হাল্লা করলে এখানে আর কোন লোক আসবে বলে মনে কর? যাও···জায়গাটা নিরিবিলি থাকতে দাও।

২য় ক॥ তাহলে আলোটা এখানে রেখে যাই স্যার?

অফিসার॥ না আমার দরকার নেই আলো—তোমরা নিয়ে যাও।

১ম ক॥ আপনার কাজে লাগতে পারে স্যার, রাত পোহাতে এখনও অনেক বাকি। ঐ পিপের ওপর বরং এটা রেখে যাই। (পিপের দিকে যায়)

অফিসার॥ (ধমক দেয়) আমি যা বলছি তোমাদের, তাই কর! যাও, আর একটা কথা নয়।

১ম ক॥ বেশ, তাই যাচ্ছি স্যার! যখন টর্চটা আমার হাতে থাকে, কেবল ইচ্ছে হয় অন্ধকার কোণগুলোয় এমনি করে আলো ফেলি···মনে যেন সাহস পাই তখন। (টর্চ জ্বালায়)

অফিসার॥ (ফেটে পড়ে) ক্লিয়ার আউট আই সে!

[কনস্টেবল দুজন তাড়াতাড়ি চলে যায়]

[বাউল পিপের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে···অফিসার আর বাউল পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে]

এখনো কি জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন?

বাউল ॥ এই···আমার চুলটা আর দাড়িটা যদি দিয়ে দেন দয়া করে

[অফিসার দিয়ে দেয়। লোকটা আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে চলে যায় তারপর ফিরে দাঁড়ায়]

আচ্ছা চলি। ধন্যবাদ দিয়ে আর আপনাকে ছোট করব না।

অফিসার ॥ দয়া করে আপনি চলে যান এখান থেকে।

বাউল ॥ বিদায়! আবার দেখা হবে অরুণোদয়ের পথে··· যেদিন নিচু তলার মানুষরা ওপরে উঠবে সেদিন আপনাকে মনে থাকবে। অভিনন্দন!

[সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে যায়]

অফিসার ॥ (দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে নোটিশটা পড়ে) এক হাজার টাকা! এক হাজার টাকা পেলে কত কী না করা যায়!·· ওঃ, কি গর্দভ আমি! কিন্তু (দর্শকদের দিকে ফিরে এগিয়ে আসে) কিন্তু আপনারা? আপনারাও কি তাই বলবেন? আপনারাও কি বলবেন আমি গর্দভ

Lady Gregory-র At the rising of the Moon নাটিকার স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ।

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

উমানাথ ভট্টাচার্য

চরিত্র

শচীন	মায়া
ভবতোষ	কুলকারনি
উদয়	কুলি ছোকরা
মিস্টার বোস	মিস্টার রথ
ভবতারণবাবু	মিস্টার দুবে
মিস্টার মিত্র	সিংজী
মিস্টার দাস	আগরওয়ালা

নতুন গড়ে ওঠা একটি ছোট প্রজেক্ট টাউন।

শচীনের বাইরের ঘর। পিছনে বড়ো জানালা দিয়ে দেখা যায় অনেক দূরে নির্মীয়মান কল-কারখানার একাধিক চিমনির অংশ। ঘরের মধ্যে জানালার নিচে তক্তাপোষ, শতরঞ্চি পাতা। একপাশে আলনায় কাপড়-চোপড়। সামনের দিকে একটা ছোটো টেবিল, একখানা চেয়ার।

শচীনের স্ত্রী মায়া তক্তাপোষে পা ছড়িয়ে বসে শেলাই করছিলো, টুকরো কাপড় সামনে ছড়ানো।

নেপথ্যে—জানালার ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসে। মায়া জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে; চৌকি থেকে নেমে দাঁড়ায়, দ্রুত হাতে শেলাইয়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ভিতর দিকে প্রস্থান করে।

পরমুহূর্তে আবার ফিরে আসে। শেলাইয়ের জিনিসপত্র তখনো তার হাতেই রয়েছে। কোনক্রমে আলনা থেকে একখানা রঙিন শাড়ি পেড়ে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। কথা বলতে বলতে শচীন ও ভবতোষের প্রবেশ। জানালা দিয়ে দেখা যায়; অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদ চিমনির গায়ে আলো-ছায়ার খেলায় মেতেছে।

শচীন ॥ তুই এসেছিস আমার এখানে ছুটি কাটাবি বলে—কাব্যি করে বলতে হয় এতে আমি হাতে চাঁদ পেয়েছি। কিন্তু ছয় নয়ার একটা পোস্টকার্ড লিখে এই সংবাদটা আগে জানাতে কি হয়েছিলো তোর ?

ভবতোষ ॥ সত্যি বলছি, সময় পাইনি। [জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়।]

শচীন। বাজে বকিস না। তিন লাইন লিখতে তোর কতক্ষণ সময় লাগে রে ?

ভবতোষ ॥ (মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকায়) ছোড়াটা মালপত্তর নিয়ে পালাবে না তো ?

শচীন ॥ না। বললি না, আগে খবর দিলি না কেন ?

ভবতোষ ॥ সত্যি বলবো ? তোর এখানে আসার কথা আমি আগে ভাবিনি। প্ল্যান ছিলো, ছুটিতে রাচী যাবো। কিন্তু রওনা হওয়ার আগের দিন কাগজ খুলে দেখলাম ওখানে মারামারি হচ্ছে। কেন মারামারি, কার সঙ্গে কার মারামারি—কিছু বুঝলাম না ; কিন্তু প্ল্যান সঙ্গে সঙ্গে পালটে ফেললাম। কী দরকার হাতাহাতি মারামারির মধ্যে গিয়ে ! না কি বল ?

শচীন ॥ (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ। ঠিক।

ভবতোষ ॥ তখন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ে গেলো। ব্যস চলে এলাম।

শচীন ॥ ভালো করেছিস। হঠাৎ তুই এসে পড়াতে আমার এতো আনন্দ হচ্ছে !

ভবতোষ ॥ কার কাছে যেন শুনেছিলাম এখানের ষ্টেশনের নামটা—ব্রজরাজ নগর ; ভাগ্যিস মনে ছিলো·· হ্যাঁরে, তুই তো এখানে বেশ পপুলার লোক। নাম করতেই—

শচীন ॥ হ্যাঁ, এখানে আমরা সবাই পপুলার, অর্থাৎ সবাই সবাইকে চিনি।

ভবতোষ ॥ তাই মনে হলো। নাম করতেই একজন বললে, (থেমে যায়) হ্যাঁরে, কুলি ছোঁড়াটা তো এখনো এলো না!

শচীন ॥ এলো না, আসবে। অত ব্যস্ত হোসনি। বল, কি বলছিলি।

ভবতোষ ॥ ব্যস্ত হবো না! আমার যথাসর্বস্ব যে ওই ব্যাগের মধ্যে!

শচীন ॥ মেলা বকিস না। সিঙ্গল্ সতরঞ্চি, একটা কম্বল আর তেলচিটে বালিশ—এই তো তোর বিছানা, আর গোটা দুই জামা আর কাপড়—এই তো তোর ব্যাগের সম্পত্তি। আচ্ছা, এখনো তুই মেসেই আছিস, না—

ভবতোষ ॥ আজ্ঞে না। আমি এখন মেলা টাকা রোজগার করি।

শচীন ॥ বটে! কতো?

ভবতোষ ॥ বল তো?

শচীন ॥ কতো হবে! মেসে থাকতে তিনটে ট্যুশানিতে তোর রোজগার হতো চল্লিশ টাকা, এখন—শ'খানেক হবে।

ভবতোষ ॥ হাঃ! এক শো পঁয়তিরিশ। ভাবতে পারিস?

শচীন ॥ আমি তোর থেকে বেশি পাই।

ভবতোষ ॥ তা তো পাবিই। তুই এখানে অফিসার না? তোর

শচীন। অফিসার ঠিক না, তবে অনেকটা ওই রকমই। এখন আছিস কোথায়? সেই মেসেই, না আর কোথাও—

ভবতোষ ॥ দেশ থেকে মাকে নিয়ে এসেছি, বাসা করেছি বেলেঘাটায়।

শচীন ॥ বেশ আছিস। আমি যে আবার কতদিনে কলকাতায় যেতে পারবো!

ভবতোষ ॥ কেন, তুইও তো বেশ ভালোই আছিস। এমন পরিবেশ, সুন্দর কোয়ার্টার—দুজন মাত্র লোক। ওই শহর খিঞ্জির জন্যে মন কাঁদে কেন?

শচীন॥ কাঁদে কি আর সাধেরে ভাই! দুদিন যাক—সব বুঝবি।…যাক ওসব পরে হবে। তুই জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে নে আমি—

ভবতোষ॥ জামা কাপড় ছাড়বো কি—ছোঁড়াটা যে এখনো এলো না! আমার সব তো ওই ব্যাগের মধ্যে।

শচীন॥ (ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে) মায়া! (ভবতোষকে) ছোঁড়া আসুক। ততক্ষণ ওর সঙ্গে আলাপ কর।—মায়া।…তুই তো ওকে দেখিসনি?

ভবতোষ॥ না।

[চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মায়ার প্রবেশ। কাপটা টেবিলে রেখে ভবতোষের দিকে তাকায়।]

মায়া॥ চিনতে পারছেন?

ভবতোষ॥ (একদৃষ্টে মায়ার দিকে তাকিয়ে) দাঁড়ান, দাঁড়ান।…আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! তাই বলি, মেয়েটা হঠাৎ গেলো কোথায়? অফিসে যাওয়ার পথে রোজ দেখতাম, বনুতোলার মোড়ে বাসের জন্যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। খুবই মত দেখতে, ফরসা রং হঠাৎ একদিন দেখি, নেই; সেই চেনা মুখটা আর চোখে পড়ে না।—তাহলে শচীন, একটা খবরও তো দিতে পারতিস যে, তুই ই শেষকালে—

শচীন॥ সময় পাইনি। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো!

ভবতোষ॥ (শচীনকে, খাটো গলায়) আগে থেকেই চেনা জানা হয়েছিলো নাকি?

শচীন॥ (সশব্দে হেসে ওঠে, মায়াকে) শোন গো, ভবতোষ কি বলে।

মায়া॥ কি?

শচীন ॥ (হেসে) আমাদের আগে থেকেই চেনা জানা ছিলো কিনা জানতে চাইছে।

[শচীন হাসে, মায়াও হাসে।]

ভবতোষ ॥ বুঝলাম।—কিন্তু আমি ভাবছি, তুই থাকতি টালীগঞ্জে, আর ও মেয়ে বাসের জন্যে এসে দাঁড়াতো কলুটোলায়। তাহলে ব্যাপারটা ঘটলো কখন! কোথায়!

মায়া ॥ ডালহৌসীতে।

শচীন ॥ ডালহৌসীতে! অফিস পাড়ায়?

শচীন ॥ ওরে মুখ্যু, হ্যাঁ। টালীগঞ্জ আর কলুটোলা একদিন মুখোমুখি হয়ে গেল ডেড্ লেটার অফিসের সামনে, ডালহৌসী স্কোয়ারে। তারপর অফিসের দিকে হাঁটতে গিয়েও যতক্ষণ দেখা যায়, টালীগঞ্জ ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো কলুটোলার দিকে; আর কলুটোলা—

মায়া ॥ এই—ভালো হবে না।

শচীন ॥ কেন, মিথ্যে বলছি?

মায়া ॥ না, খুব সত্যি—

শচীন ॥ (হেসে) তারপর যা হয়। প্রথম দিন চোখাচোখি; দ্বিতীয় দিন শুধু হাসি দিয়ে সম্ভাষণ। তৃতীয় দিন—

মায়া ॥ ভাল হবে না কিন্তু!

শচীন ॥ (হেসে) ঠিক শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে; চোখাচোখি, ঠোকাঠুকি, স্ফুলিঙ্গ, আগুন—অর্থাৎ বিবাহ।

ভবতোষ ॥ ব্যস?

শচীন ॥ ব্যস।

ভবতোষ ॥ উহুঁঃ, আরো আছে।

শচীন ॥ আরো আছে! কি?

শচীন ॥ কাঁদে কি আর সাধেরে ভাই! দুদিন যাক—সব বুঝবি।…যাক ওসব পরে হবে। তুই জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে নে আমি—

ভবতোষ ॥ জামা কাপড় ছাড়বো কি—ছোঁড়াটা যে এখনো এলো না আমার সব তো ওই ব্যাগের মধ্যে।

শচীন ॥ (ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে) মায়া! (ভবতোষকে) ছোঁড় আসুক। ততক্ষণ ওর সঙ্গে আলাপ কর।—মায়া।…তুই তো ওকে দেখিসনি?

ভবতোষ ॥ না।

[চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মায়ার প্রবেশ। কাপট টেবিলে রেখে ভবতোষের দিকে তাকায়।]

মায়া ॥ চিনতে পারছেন?

ভবতোষ ॥ (একদৃষ্টে মায়ার দিকে তাকিয়ে) দাঁড়ান, দাঁড়ান।…আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপার! তাই বলি, মেয়েটা হঠাৎ গেলো কোথায়। অফিসে যাওয়ার পথে রোজ দেখতাম, বলুটোলার মোড়ে বাসের জন্যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। খুকির মত দেখতে, ফরসা রং হঠাৎ একদিন দেখি, নেই; সেই চেনা মুখটা আর চোখে পড়ে না।—তাহলে শচীন, একটা খবরও তো দিতে পারতিস যে, তুই ই শেষকালে—

শচীন ॥ সময় পাইনি। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো!

ভবতোষ ॥ (শচীনকে, খাটো গলায়) আগে থেকেই চেনা জানা হয়েছিলে নাকি?

শচীন ॥ (সশব্দে হেসে ওঠে, মায়াকে) শোন গো, ভবতোষ কি বলে।

মায়া ॥ কি?

শচীন॥ (হেসে) আমাদের আগে থেকেই চেনা জানা ছিলো কিনা জানতে চাইছে।

[শচীন হাসে, মায়াও হাসে।]

ভবতোষ॥ বুঝলাম।—কিন্তু আমি ভাবছি, তুই থাকতি টালীগঞ্জে, আর ও মেয়ে বাসের জন্যে এসে দাঁড়াতো কলুটোলায়। তাহলে ব্যাপারটা ঘটলো কখন! কোথায়!

মায়া॥ ডালহৌসীতে।

শচীন॥ ডালহৌসীতে! অফিস পাড়ায়?

শচীন॥ ওরে মুখ্যু, হ্যাঁ। টালীগঞ্জ আর কলুটোলা একদিন মুখোমুখি হয়ে গেল ডেড্ লেটার অফিসের সামনে, ডালহৌসী স্কোয়ারে। তারপর অফিসের দিকে হাঁটতে গিয়েও যতক্ষণ দেখা যায়, টালীগঞ্জ ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো কলুটোলার দিকে; আর কলুটোলা—

মায়া॥ এই—ভালো হবে না।

শচীন॥ কেন, মিথ্যে বলছি?

মায়া॥ না, খুব সত্যি—

শচীন॥ (হেসে) তারপর যা হয়। প্রথম দিন চোখাচোখি; দ্বিতীয় দিন শুধু হাসি দিয়ে সম্ভাষণ। তৃতীয় দিন—

মায়া॥ ভাল হবে না কিন্তু!

শচীন॥ (হেসে) ঠিক শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে; চোখাচোখি, ঠোকাঠুকি, স্ফুলিঙ্গ, আগুন—অর্থাৎ বিবাহ।

ভবতোষ॥ ব্যস?

শচীন॥ ব্যস।

ভবতোষ॥ উহুঁঃ, আরো আছে।

শচীন॥ আরো আছে! কি?

[মায়া সপ্রশ্ন চোখে ভবতোষের দিকে চেয়ে থাকে।]

ভবতোষ॥ বলবো?

[শচীন ও মায়া পরস্পরের দিকে তাকায়   মায়া হঠাৎ কি বুঝতে পারে, মুখে আঁচল দিয়ে ছুটে পালায় ভবতোষ হেসে ফেলে। শচীনও বুঝতে পেরে হাসে।]

ক' মাস?

শচীন॥ আট। কিন্তু কি করলি বল্ দেখি। এখন আর সহজে তোর সামনে আসতে চাইবে না।

ভবতোষ॥ কেন, আমি তো কিছুই বলিনি।

শচীন॥ যা করেছিস, বলার চেয়ে অনেক বেশী। কিছু বললেও এত লজ্জা পেতো না।—নে, চা খা; ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

[ভবতোষ চায়ে চুমুক দেয়।]

ভবতোষ॥ কিন্তু ট্রেনের জামা-কাপড় ছাড়বো কখন? তোমার কুলি ছোঁড়াটা যে এখনো এলো না। (জানালা দিয়ে বাইরে দেখে) নাঃ, ওই আসছে।

[শচীন জানালা দিয়ে দেখে।]

শচীন॥ নবাবপুত্তুরের হাটার ছিরিটা ছাখ্। (জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নবাবের ব্যাটা, পা চালিয়ে আসতে পারো না?

ভবতোষ॥ কি ব্যাপার, হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন?

শচীন॥ হঠাৎ না ভবতোষ, দেখে-শুনে আমি এদের ওপর সব সময়ই ক্ষেপে আছি।

ভবতোষ॥ ভালো না। সামাজিক মানুষের ক্রোধকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

ন ॥ শাস্ত্রবাক্য ?

তোষ ॥ না ; সামাজিক সূক্ত ।

ন ॥ সামাজিক সূক্ত ! যাক দুদিন ; সামাজিক সূক্ত কেমন মনে থাকে, দেখা যাবে ।

[মাথায় মোট নিয়ে ছোকরা কুলির প্রবেশ । বয়স ১৪-১৫ । রোগা কালো চেহারা ।]

হারামজাদা, এতক্ষণ কি করছিলি ? পা চালিয়ে আসতে বলেছিলাম না ?

[ছেলেটা কোনো জবাব না দিয়ে মাথার মোট মাটিতে রাখে । তারপর টেবিলটা নজরে পড়ে । মাটি থেকে ওগুলো তুলে টেবিলে রাখে ।]

কথা বলছিস না যে ! এতক্ষণ কি করছিলি ?

॥ (হাত পাতে) পয়সা দিও ।

ন ॥ দ্যাখ্ ভবতোষ, বলেছিলাম না, এদের সঙ্গে ব্যবহারে কোন সূক্ত খাটে না !

তোষ ॥ আঃ, তুই দেখছি একেবারে সপ্তমে চড়ে গেলি ! থাম না ।

ন ॥ থামবো কি ! জিজ্ঞেস করছি, কথার জবাব দেয় না কেন ?··· হারামজাদা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

তোষ ॥ আঃ শচীন ! কি হয়েছে ! ছেলেমানুষ, অতবড়ো বোঝা নিয়ে আসতে না-হয় একটু দেরিই করেছে । ওই নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসলি যে !

[শচীন ভবতোষের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে একটুক্ষণ চেয়ে থাকে ।]

শচীন ॥ ও ব্যাটাকে জিজ্ঞেস করবি তো, কেন এতো দেরি করলে
(কুলিকে) কি রে ?

কুলি ॥ (নির্বিকারভাবে) পয়সা দিঅ ।

[শচীন নিস্ফল ক্রোধে দুপদাপ পা ফেলে ভিতরে যায়

ভবতোষ ॥ (অল্প হাসে) তোর আসতে এতো দেরি দেখে বাবু ভীষণ
গেছে । এতো দেরি করলি কেন ?

[ছেলেটা হাত পেতে দাড়িয়ে থাকে । কোনো উ
দেয় না । ভবতোষ ওকে লক্ষ্য করে ।]

হ্যাঁরে, তুই আমাদের কথা বুঝতে পারছিস তো ?

[কুলি মাথা নেড়ে জানায়, সে বুঝতে পারছে না ।]

ওরে শচীন. দেখে যা—এ ছোঁড়া তোর একটা কথাও বুঝতে পারে
ও বাংলাই জানে না । (হাসে)

কুলি ॥ পয়সা দিঅ ।

ভবতোষ । দিচ্ছি দিচ্ছি । (পার্স বের করতে করতে) এতো অল্প ব
কাজে নেমেছিস,—বাড়িতে তোর কে আছে ?—ধ্যাৎ, কাকে বল
তুই তো কিছুই বুঝবি না । (পয়সা বের করে) কত দেবো ?

কুলি ॥ এক তঙ্কা ।

[ভবতোষ কিছু বলার আগেই শচীন হুমড়ি খেয়ে ঢোকে

শচীন ॥ (গর্জন) কতো !

ভবতোষ ॥ এক টাকা চাইছে ।

শচীন ॥ (কুলিকে) চাঁড়িয়ে তোমায় লাল করে দেবো হারামজাদা । স্টে
থেকে এইটুকু—সাত মিনিটের পথ, এক টাকা ! চালাকি পেয়েছে
(ভবতোষকে) চার আনা দেবে । (কুলিকে) যা ব্যাটা, নতুন
বলে অনেক বেশি পেয়ে গেলি ।

লি ॥ চারি আনা নাহি লিব ; এক তঙ্কা দিঅ।

চীন ॥ (ক্রুদ্ধ) কি !

লি ॥ এক তঙ্কা লিব।

চীন ॥ (তেড়ে যায়) এক তঙ্কা লিব ! ব্যাটার মার না-খেলে শিক্ষা হবে না—

বতোষ ॥ শচীন ! পয়সাটা তো আমি দেবো,—মাথা ঠাণ্ডা করে বসো তো। (কুলিকে) এই নে ; বারো আনা দিচ্ছি চুপচাপ কেটে পড় দেখি।

[শচীন স্তম্ভিত হয়ে ভবতোষের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেটা পয়সা গোনে ; ভবতোষের দিকে চেয়ে হাসি মুখে প্রস্থান করে। ভবতোষও একটু হাসে।]

রোজ রোজ তো আর দিচ্ছিনা। ছ'মাস-বছরে একদিন···যা চেহারা, আমার তো মনে হয়—কে জানে, হয়তো এই ওর সারাদিনের রোজগার।···মাথার ওপর কেউ থাকলে কি আর এই বয়সে রোজগারে বেরোয় ? খেলার বয়েস ওর।

[শচীন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলো। ভবতোষ তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ গলার স্বর চড়িয়ে]

অমন মুখ গোমড়া করে থাকিস না তো ; আমার ভারি বিশ্রী লাগে।

ীন ॥ (শান্ত কণ্ঠে) হাত-পা ধুয়ে নিবি চল।

তোষ ॥ ও আমাদের একটা কথাও বুঝতে পারেনি শচীন। তাই তো অমন জিদ করছিলো। আর আমিও ভাবলাম, না-হয় দিলামই বারো আনা ; একদিনই তো ! তাছাড়া—

[শচীন ভবতোষের বেডিং ও ব্যাগটা তুলে নিয়ে ভিতর দিকে পা বাড়ায়।]

শচীন ॥ তুই আয়। আমি এগুলো তোর ঘরে সাজিয়ে রাখছি।

ভবতোষ ॥ (গম্ভীর) শচীন! (শচীন ঘুরে তাকায়) কাছে আয়।—আ
ওগুলো রাখ না মাটিতে।

[শচীন বেডিং-ব্যাগ মাটিতে রেখে কাছে আসে। ভবতো
ওর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলকে চেয়ে দেখে।

আমি যদি ফিরতি গাড়িতে এখান থেকে চলে যাই, তাহলে তুই খ
হবি ?

শচীন ॥ তার মানে!

ভবতোষ ॥ মনে হচ্ছে, আমার কথাগুলো তোর মোটেই ভাল লাগছে না।

শচীন ॥ বাঃ! কে—কে বললে ওকথা!

ভবতোষ ॥ নইলে এই সামান্য ব্যাপাব নিয়ে মুখ ভার করে আছিস কেন ?

শচীন ॥ নাঃ, মুখ ভাব করবো কেন! মুখ ভাব করার কি আছে!

ভবতোষ ॥ দু পয়সা চার পয়সার হিসেব তো চিরকালই করি। ছুটি কাটা
বিদেশে এসেছি শরীর মন ভাল করবো বলে, এখানে এসেও যদি
নিয়ে মারামারি করবো, তাহলে এলাম কেন বল ?

শচীন ॥ দু'পয়সা চাব পয়সার হিসেব নয় ভবতোষ। কলকাতায় থা
তো,—তুই বুঝবি না, আমাদের কি জ্বালা।

ভবতোষ ॥ থাক। সব বুঝি আমি। আমাকে আর বোঝাতে হবে না।

শচীন ॥ (চেয়ারে বসে। অভিযোগের সুরে) তোর কথায় ওই ছোঁড়া
কাছে আমি যে কতখানি নিচু হয়ে গেলাম, বুঝতে পারিস ?

ভবতোষ ॥ ও বাংলা বোঝেই না।

শচীন ॥ হাঃ! এই জন্যেই বলছিলাম 'তুই এসব বুঝবি না! বাংলা বো
না! বাংলা তোকে শেখাতে পারে।

|তোষ ॥ বাচ্চা ছেলে—

ীন ॥ আরে রেখে দে তোর 'বাচ্চা ছেলে'। বাচ্চা-বুড়ো সব সমান।—থাক দুদিন; ওদের চোখ দেখে বুঝতে পারবি, আমাদের দিকে ওরা কি চোখে তাকায়।

[ভবতোষ সশব্দে হেসে ওঠে।]

হাসিস না ভবতোষ।…যতো লোকের যতো রাগ—আমাদের ওপর। কেন, বলতে পারিস? কতো লোকের কতো পাকা ধানে মই দিয়েছি আমরা, অ্যাঁ? বল না। (ভবতোষ আরও হাসে) ওই ছোঁড়াটা যে তোকে ঠকিয়ে গেলো, এটা বুঝিস?

বতোষ ॥ (হাসি থামিয়ে) ঠকিয়ে গেলো! কেমন করে?

চীন ॥ চার আনার জায়গায় তোর গালে চড় মেরে বারো আনা নিয়ে গেলো—এতে তুই ঠকলি না?

বতোষ ॥ শচীন, বুকে হাত দিয়ে তুই জোর করে বলতে পারিস—কি করলে ঠকা হয়, আর কি করলে—

চীন ॥ ক্ষ্যামা দে। ওসব তত্ত্বকথা আমার মাথায় আসে না।

বতোষ ॥ যাক। তাহলে রাগটা পড়েছে তোর?

চীন ॥ রাগ! রাগ করব কার ওপর!

বতোষ ॥ তাহলে চল ভেতরে। ট্রেনের পোশাকটা ছাড়তে না পারলে আর ভালো লাগছে না।

[শচীন বেডিং-ব্যাগ তুলে নেয়। দুজনের প্রস্থান। একটুক্ষণ স্টেজ ফাঁকা। কথা বলতে বলতে শচীন ও মায়ার প্রবেশ]

মায়া ॥ তুমি কী, বলতো ! বিদেশে এসেছেন ক'টা দিন আনন্দে কাটাবে বলে,—আর তুমি ওকে হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করার সময়টুকু দিলে না, অমনি ঝগড়া বাধিয়ে বসলে ?

শচীন ॥ না না, ঝগড়া করবো কেন ?

মায়া ॥ ঝগড়া করবো কেন ! আমি শুনিনি ?

শচীন ॥ ও একটু···ওই কুলি ছোঁড়ার বেআদপি দেখে মাথাটা হঠাৎ গর হয়ে গেলো। আমি পরে সামলে নিয়েছি। ওকে জিজ্ঞেস ক দেখো।

মায়া ॥ কি ভাবলেন, বলো দেখি !

শচীন ॥ কি আবার ভাববে ? সংসারে থাকতে গেলে এর-ওর সঙ্গে ঝগড ঝাঁটি একটু আধটু হয়ই ; আবার তা মিটেও যায়। এ নিয়ে অ

ভাবা-ভাবির কী আছে !

মায়া ॥ না, ভাবা-ভাবির কিছু নেই। তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছো দি দিন। নিজেকে অত বড়ো মনে করো কেন বলতো ? তোমা মধ্যে কি কোন দোষ থাকতে নেই ? মনে মনে—

শচীন ॥ বাঃ, আমি বড় না ?

মায়া ॥ হ্যাঁ। আমার থেকে বড়ো।

শচীন ॥ আমার মধ্যে কি দোষ দেখতে পাও ?

মায়া ॥ আমি হয়তো দেখি না। কিন্তু তোমার তো দেখা উচিত। মন তো তোমার।

শচীন ॥ মায়া, মাইরি বলছি, এই সাঁঝের বেলা জ্ঞানের কথা শুনতে একদ ভালো লাগছে না।

মায়া ॥ কথার কী ছিরি !

ীন ॥ (সশব্দে হাসে) রান্না-বান্নার কি ব্যবস্থা করেছো ? জানো, এককালে ভবতোষ ছিলো আমার বুজম্ ফ্রেণ্ড। এতকাল পরে হঠাৎ ওকে কাছে পেয়ে—ঝগড়াই করি আর যাই করি—মনে হচ্ছে, কলেজের সেই দিনগুলোকে আবার ফিরে পেলাম। সেই কফি হাউসে বসে একটা কাপ সামনে রেখে এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া—ভাবতেও ভালো লাগছে ও তখন কি বলতো জানো ? বলতো, এ যুগে—

য়া ॥ তুমি কি বলতে ?

ীন ॥ (থমকে যায়) সে অনেক কথা। যাক গে, রান্নার কি ব্যবস্থা করেছো শুনি ? খাওয়ার ব্যাপারে ভবতোষের কিন্তু পেটুক বলে দুর্নাম ছিলো।

[পোশাক পালটে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ভবতোষের প্রবেশ]

তোষ ॥ সে দুর্নাম এখনো আছে। খাওয়ার নেমন্তন্ন আমার কপালে জোটে না।

[মায়া ঘোমটা টেনে একরকম ছুটে বেরিয়ে যায়। ভবতোষ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখে]

অমন করে ছুটে পালালো কেন ?

ীন ॥ তোর সামনে লজ্জা পাচ্ছে।

তোষ ॥ কেন, আমি কি ভাসুর নাকি ?

ীন ॥ পরিচয়ের শুরুতেই যে খোঁটা দিয়েছিস,—

তোষ ॥ খোঁটা !...ও হো হো—(সশব্দে হাসে।) খোঁটা কিসের ! এতে তো মেয়ে মানুষের গর্ব হওয়া উচিত—মা হতে চলেছে, সোজা

কথা ! ভগবানের আসনে বসে আছে ও,—স্থষ্টিকর্ত্রী।—বুঝি
বলিস।

শচীন ॥ (স্মিতমুখে) আর আমি বুঝি ফালতু এলাম ?

ভবতোষ ॥ আহা, আমরা তো চিরকাল উহ্যই থেকেছি রে বোকা। বুঝি
না ? (চৌকিতে আরাম করে বসে) কি কথা হচ্ছিলো বউ-এর সঙ্গে

শচীন ॥ বলছিলাম, আমাদের সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা। কফি
হাউসে আড্ডা, গঙ্গার ধারে বসে চিনেবাদাম চিবোনো, আর মা
মাঝে থিএটার-বায়স্কোপ। বেশ কাটতো দিনগুলো। না ?

ভবতোষ ॥ এখন কি খারাপ কাটছে নাকি ?

শচীন ॥ (একটু ভেবে) তেমন ভালো না।

ভবতোষ ॥ কেন, তোর আবার অভাব কিসের ? লেখাপড়া শিখে উপা
করছিস, বিয়ে করে সংসারী হয়েছিস। সামনে তোর বাঁধা সড়
পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবি ; দিনে দিনে উন্নতি হবে। তোর ভা
না থাকার কারণটা কি ?

শচীন ॥ না না, তা নয়। আমি বলছিলাম—(থেমে যায়) ধ্যাৎতের
বলেই বা কি হবে ! (হেসে) সব তো গুলিয়ে-তালিয়ে একাকার হ
গেছে ; এখন আর ভেবে বা বলে আর লাভ কি ?

ভবতোষ ॥ শচীন, আমরা অনেক স্বপ্ন দেখতাম, না ?

শচীন ॥ হ্যাঁ ; মস্ত, বিরাট স্বপ্ন। আমার দেশ, দেশের মানুষ, তারপর
পৃথিবী—সব নিয়েই স্বপ্ন দেখতাম। আর মনে আছে তোর ?
স্বপ্নের কোনো আকার ছিলো না !

ভবতোষ ॥ স্বপ্নের কোন আকার থাকে না।

শচীন ॥ হ্যাঁ, সবটাই কেমন আবছা, ভাসা-ভাসা। তাই না ?

ভবতোষ ॥ মনে আছে ?

শচীন ॥ এক একটা টুকরো থেকে থেকে মনে পড়ে। আর তখনই বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

ভবতোষ ॥ স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা।

শচীন ॥ তা হবে। কিন্তু ভব, ভেবে ছাখ, আমাদের স্বপ্নগুলো সত্যিই কিছু অসম্ভব বা অবাস্তব ছিলো না। সত্যি হলেও হতে পারতো!

ভবতোষ ॥ তা পারতো।

শচীন ॥ কোথা-থেকে এলো যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—একটা যুগকে একেবারে মিটিয়ে দিয়ে গেলো। তখন আমরা ছোটো; কিন্তু ভাবতে শিখেছিলাম। ভেবেছিলাম, একটা যুগ গেছে, তাতে কি। আবার নতুন যুগ আসবে।—এলো সাতচল্লিশ কিন্তু আবার আমরা হেরে গেলাম। 'ইনডিয়া ওয়ান নেশান' বলে যারা চেঁচিয়ে মরতো, 'ইণ্ডিয়া মাল্টিনেসান'—এই কথাটা তাদের দিয়ে স্বীকার করানো গেলো না; কিন্তু টু-নেশান্ তারা মেনে নিলো। ফলং ?

ভবতোষ ॥ তুই কি রাজনৈতিক খসড়া আলোচনা করছিস নাকি ?

শচীন ॥ পাগল! আমি শুধু ভাবছিলাম; সাতচল্লিশে নবযুগের সৃষ্টি হতে পারতো, কিন্তু হলো না। যুগের যুদ্ধের পরে—

ভবতোষ ॥ হঠাৎ কি আরম্ভ করলি! (এতক্ষণ তক্তাপোষে শুয়ে ছিলো; উঠে বসে) ইতিহাস নিয়ে কপ্‌চাস্ কেন ? থিসিস্ লিখবি নাকি ?

শচীন ॥ মাথা খারাপ! স্মৃতি-মন্থন করছিলাম।

ভবতোষ ॥ মন্থনে কিছু হবে না। মোদ্দা কথাটা বুঝে রাখ: আমরা, মানে এই জেনারেশনটা—শেষ হয়ে'গেছি। আমাদের অস্তিত্ববোধ লোপ পেয়েছে। আমরা নিরালম্ব। তাই আমরা মন্দকে ভালো দেখি;

ভালোটা চোখে পড়ে না ; অর্থাৎ ভালো-মন্দ আমাদের চোখে একাকার। কারণ, আমরা ডেড। সুতরাং বন্ধুবর, ও রোমন্থন বাদ দাও ; আপাতত কিছু খাবার জোগাড় করো। বেজায় খিদে পেয়েছে।

শচীন ॥ দেখেছিস, বাল্যপ্রেম অবিনশ্বর।

ভবতোষ ॥ সে কি !

শচীন ॥ এতকাল পরে তোকে কাছে পেয়ে কাজের কাজটাই ভুলে বসে আছি। প্রেমের কী জ্বালা রে !—তুই বোস ; আমি চট্ করে একবার বাজারটা ঘুরে আসি। আর মায়াকে বলে যাচ্ছি—(থেমে যায় ; নাক কুঁচকে কি শোঁকে) থাক, আর বলতে হবে না। ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছিস ?

ভবতোষ ॥ তুই তো আচ্ছা লোক রে। কলকাতায় বাস করি ; ঘিয়ের গন্ধ আমি চিনবো কেমন করে ?

শচীন ॥ (সশব্দে হাসে।) তুই বোস। আসচে। কিছু যেন অবশিষ্ট থাকে, বলে দিস মায়াকে। (প্রস্থান। পুনঃপ্রবেশ।)

ভবতোষ ॥ কি হলো !

শচীন ॥ তুই যাবি আমার সঙ্গে ? ঘুরে দেখে আসতে পারতিস।

ভবতোষ ॥ আজ থাক।

শচীন ॥ ঠিক আছে। তুই বিশ্রাম কর।

[প্রস্থান। ভবতোষ একা পায়চারি করে। একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বাইরেটা দেখে। অন্ধকার নামছে—বাইরে ও ভিতরে। ভবতোষ ফিরে আসে জানালার কাছ থেকে। তক্তাপোষে বসে। গা এলিয়ে দেয়। অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়। স্টেজ প্রায় অন্ধকার। গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে মায়ার প্রবেশ। মায়া আল্‌নার কাছে যায়—গান থামে।]

ভবতোষ ॥ (শোয়া অবস্থায়ই) থামলেন কেন?

[মায়া আঁৎকে ওঠে—চিৎকার করে]

আরে, আমি—আমি—ভবতোষ।

মায়া ॥ (তখনো ভয় কাটেনি) ও। আলোটা জ্বালুন না। (ভবতোষ সুইচ খোঁজে) ওই যে, দরজার পাশে। ডানদিকে—

[ভবতোষ আলো জ্বালে। বোকার মত হাসে।]

ভবতোষ ॥ দেখুন কাণ্ড—

মায়া ॥ আমি ভেবেছিলাম, আপনি ওর সঙ্গে গেছেন বুঝি।

ভবতোষ ॥ কাল যাবো।

মায়া ॥ এমন ভয় পাইয়ে দিলেন; এখনো আমার—

ভবতোষ ॥ আমি তো ভয় পাওয়ার জন্যে বলিনি!

মায়া ॥ আপনি বসুন। আমি খাবারটা নিয়ে আসি।

ভবতোষ ॥ শচীন এলে একসঙ্গে—

মায়া ॥ ও পরে খাবে। (প্রস্থান।)

[ভবতোষ নিজের মনে হাসে। খাবার নিয়ে মায়ার প্রবেশ। টেবিলে রাখে]

নিন। উঠে আসুন।

ভবতোষ ॥ মন্দ না। এ বেশ ভালই হলো।

[ভবতোষ খেতে থাকে। মায়া একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখে]

মায়া ॥ কি?

ভবতোষ ॥ ভেবেছিলাম, আপনি আর আমার সামনে আসবেনই না।

মায়া ॥ না, তা কেন!

ভবতোষ॥ আপনার ওই হঠাৎ চিৎকারে ভয় আমিও পেয়েছিলাম।

মায়া॥ তাই বুঝি!

ভবতোষ॥ এমনই জিনিস—এই ভয়ের কথা বলছি, মুহূর্তে কেমন দূরত্বটা ঘুচিয়ে দিলে।

[শচীনের প্রবেশ। হাতে বাজারের থলে।]

শচীন॥ আমার আপত্তি আছে।

মায়া॥ কিসের?

ভবতোষ॥ এসে গেছিস?

শচীন॥ আমি আধ-ঘণ্টার জন্যে বাইরে গেছি, আর সেই সুযোগে তোমাদের দু-জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল দূরত্বটা মুহূর্তে ঘুচে গেলো—এতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে।

ভবতোষ॥ কেন?

শচীন॥ বলি, বউটাতো আমার—

মায়া॥ (মুখ ভ্যাংচায়) এঁ হেঁ হেঁ—

[বাজারের থলে শচীনের হাত থেকে নিয়ে ভিতরে প্রস্থান।]

ভবতোষ॥ মুখে কিছুই আটকায় না; কি ভাবলো, বল দেখি?

শচীন॥ আরে, ও হচ্ছে প্রেম-করা মেয়ে। অতো সহজে কিছু ভাবে না।—ভালো কথা। কলকাতা থেকে এক নতুন বাবু এসেছেন আমার বাড়িতে— খবরটা ইতিমধ্যে সারা তল্লাটে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমার অফিসার মিঃ বোসের সঙ্গে দেখা হলো, তিনি আসছেন। তোর সঙ্গে আলাপ করবেন।

[মায়ার প্রবেশ। উইংসের পাশ থেকে।]

মায়া॥ একবার ভেতরে আসবে?

শচীন॥ কেন?

মায়া॥ মাছটা কেটে দিয়ে যাও।

[শচীন ভবতোষের দিকে তাকায়। ইতস্তত করে।]

কুটে দিতে বলছি না; শুধু কেটে দিলেই চলবে।

ভবতোষ॥ যা না।

শচীন॥ (মায়াকে) তুমি পারছো না?

মায়া॥ এসো না বাপু।

শচীন॥ ত্থাখ্ কাণ্ড। একটু আগে বলছিলাম, প্রেমকরা মেয়ে। দাপটটা ত্থাখ্ একবার।

মায়া। তুমি আসবে?

শচীন॥ যাচ্ছি বাপু। (যেতে যেতে) এরপর কোনদিন বলবে, ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে দিয়ে যাও।

[ভবতোষ হাসে। শচীনের প্রস্থান। মারাঠি ভদ্রলোক গলা বাড়িয়ে দেখেন; শচীন ভিতরে যেতে সহাস্যে তিনি এগিয়ে আসেন]

ভদ্রলোক॥ আসতে পারি?

ভবতোষ॥ আসুন।

ভদ্রলোক॥ আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।

ভবতোষ॥ সে কি! আমি তো আপনাকে—

ভদ্রলোক॥ আপনিই তো সেই কলকাতার বাবু? আজ বিকেলে এসেছেন?

ভবতোষ॥ ও। শচীন অবশ্য বলেছিলো, আমি এখানে আসার খবরটা ইতিমধ্যেই সারা তল্লাটে রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

[ভদ্রলোক তক্তাপোষে চেপে বসে।]

ভদ্রলোক ॥ আমার নাম—কুলকারনি; নামেই আমার পরিচয়। আসলে কি জানেন, এই ছোটো জায়গায় পড়ে থেকে, দেশটা যে অনেক বড়ো —এই কথাটাই আমরা প্রায় ভুলে বসে আছি। বাইরে থেকে কেউ এলে তখন বুঝতে পারি, আমার নজরের বাইরেও মাটি আছে, মানুষ আছে। তাই আগ বাড়িয়ে আলাপ করতে আসা। দূরের মানুষ দেখলে মনটা খুব খুশি হয়।

ভবতোষ ॥ তা তো বটেই। কিন্তু ছোট জায়গা বলছেন কেন? এমন খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ—

কুলকারনি ॥ কিন্তু মানুষ? প্রকৃতি যতই সুন্দর হোক, মানুষ না হলে মানুষ বাচতে পারেনা। ঠিক কি না?

ভবতোষ ॥ তা ঠিক। কিন্তু মানুষেরও তো এখানে অভাব নেই। সব জাতীয় মানুষ মিলে-মিশে কেমন সুন্দর জনপদ গড়ে তুলেছেন আপনারা। ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট সংস্করণ।

কুলকারনি ॥ অ্যাঁ! (হঠাৎ সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে) বেশ বলেছেন (হাসি) ভারতবর্ষের ছোটো সংস্করণ। (হাসি) বাহ বা, বা! (হাসতে থাকে) ভারতবর্ষের ছোট সংস্করণই বটে।

ভবতোষ ॥ কথাটা কি ভুল বললাম?

কুলকারনি ॥ না মশাই, ভুল বলবেন কেন? অ্যাবসোলিউটলি কবেক্ট, আপনি এরই মধ্যে সব জেনে ফেলেছেন দেখে—(থেমে যায়) নাঃ, আপনি একেবারে খাঁটি কথাটা বলে ফেলেছেন!

ভবতোষ ॥ বুঝলাম না।

কুলকারনি ॥ একটু ভাবুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

[নেপথ্যে মাছের মাথা কাটা নিয়ে শচীন ও মায়ার মধ্যে তর্ক শুরু হয়েছে। দুজনে কান পেতে শোনে।]

আপনার নামটা কিন্তু শোনা হয় নি।

ভবতোষ ॥ ভবতোষ দত্ত।

কুলকারনি ॥ কলকাতায় চাকরি করেন বুঝি ?

ভবতোষ ॥ হ্যাঁ ; মাস্টারী। স্কুলের।

কুলকারনি ॥ বেশ আছেন।

ভবতোষ ॥ আপনারাই বা কি খারাপ আছেন ?

কুলকারনি ॥ না, খারাপ আছি—একথা বলতে পারবো না। কিন্তু কি জানেন, আমরা দিনে দিনে ছোটো হয়ে যাচ্ছি।

ভবতোষ ॥ ছোটো !

কুলকারনি ॥ মানুষ হিসেবে।

ভবতোষ ॥ ওই একটা কথা বারবার বলছেন কেন ? আমার কিন্তু জায়গাটা বেশ লাগছে।

কুলকারনি ॥ দেখলেন কতটুকু যে এরই মধ্যে বেশ লাগছে ! যাক গে ওসব কথা। আপনার বাড়িতে কে কে আছেন ?

ভবতোষ ॥ মা আর আমি।

কুলকারনি ॥ বিয়ে করেন নি ?

ভবতোষ ॥ না।

কুলকারনি ॥ বাঃ।

ভবতোষ ॥ বাঃ !

কুলকারনি ॥ মশাই, বিয়ে করে মনে হয়েছিলো দ্বিজত্ব পেলাম। কিন্তু এখন —এই দশ বারো বছর একসঙ্গে ঘর করার পর মনে হচ্ছে—আসলে দ্বিজত্ব নয়, বিয়ের দিন নিজের হাতে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই

করেছি। (ভবতোষ হাসে) হাসবেন না, অভিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, কথাটা কত সত্যি।

ভবতোষ। জানি। (হাসতে হাসতে) আমি হাসছি আপনার বলার ভাব দেখে। একেবারে বাংলা দেশের খুড়ো-জ্যাঠাদের মতন।...আপনার উনি কি—

কুলকারনি॥ বাঙালি মেয়েদের ভালো করে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে মনে হয়, আমার উনি আর আপনাদের ওনারা একই রকম।

ভবতোষ॥ বকে ?

কুলকারনি॥ কথা না শুনলে মারতে আসে।

[দুজনে সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে। চোখ-মুখ লাল করে হাসতে থাকে। কুলকারনির হঠাৎ মনে পড়ে।]

এই রে! সকাল সকাল বাজার নিয়ে ফিরতে বলেছিল। আমি চাল ভবতোষবাবু। আর দেরি করলে সত্যিই শেষে...(যেতে যেতে) রাত্রে আবার আসব। ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। (প্রস্থান।)

[শচীনের প্রবেশ।]

শচীন॥ (বলতে বলতে ঢোকে) কার সঙ্গে এতো কথা বলছিস রে ?

[কুলকারনিকে যেতে দেখে গম্ভীর হয়। ভুরু কুঁচকে জানালার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।]

ভবতোষ॥ কিরে, হাঁড়িমুখ করে আছিস—মাছ কাটতে গিয়ে হাত-পা কেটে বসিসনি তো ?

শচীন॥ নাঃ।

ভবতোষ॥ মনে হচ্ছে, ক'টা দিন আমার ভালোই কাটবে।

শচীন॥ কেন ?

তোষ ॥ কেন মানে !

ন ॥ বলছিলাম, হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে এলি কিসে ?

তোষ ॥ মিস্টার কুলকারনির সঙ্গে গল্প করে—মানে আড্ডা দিয়ে—

ন ॥ ওদের সঙ্গে ?

তোষ ॥ হ্যাঁ। (শচীন মুখ ঘুরিয়ে নেয়) কথাটা মনে ধরলো না ?

ন ॥ (এগিয়ে আসে) ভবতোষ, বল তো বাইরের চেহারা দেখে মানুষ চেনা যায় ?

তোষ ॥ না।

ন ॥ তবে ?

তোষ ॥ তবে কি ? ও, তুই বলতে চাইছিস, ওদের বাইরের চেহারা যাই হোক, ভেতরে—

ন ॥ বিষ। হ্যা, তাই। ভেতরে বিষ। মায়ার ছোট ভাইটা পাশ করে বসে আছে ; আমি চেষ্টা করছিলাম, মিস্টার বোসকে ধরে এখানে কোন প্রজেক্টে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কিনা। প্রায় হয়ে এসেছিলো, এমন সময় তোর ওই কুলকারনি—ডাইরেক্টারেটে ওর কে এক মামা আছে—তাকে দিয়ে মিস্টার বোসকে লেঙ্গি মেরে দিলে। দেশ থেকে ওর এক শালা না সম্বন্ধী এসে সেই পোস্টে বসে গেলো।

তোষ ॥ তাতে কি হলো ?

ন ॥ কি হলো মানে ? ওদের বাড়ির অবস্থা ভালো না। ওর ভাই চাকরিটা পেলে সংসারে একটু সাশ্রয় হতো।

তোষ ॥ এ কথা তো কুলকারনির বেলায়ও খাটতে পারে।

ন ॥ তুই এই বিশ্বপ্রেম নিয়েই থাক।

তোষ ॥ আসলে গোলমালটা অন্যখানে শচান।

শচীন ॥ ঠিক আছে। ওই কুলকারনি এখানে চাকরি করার পর পু
শহরতলিতে জমি কিনে বাড়ি করছে। পাঁচ ছ বছরে এত টাকা
পায় কোথায় ?

ভবতোষ ॥ কত মাইনে পায় ?

শচীন ॥ আমি না পাই।

[ভবতোষ শচীনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

হ্যাঁ, আমি তাই বলতে চাই। ওপর তলায় কে কোথায় ল
টাকার মাল পাচার করলো ; কুলকারনির ভাগের বখরা কিন্তু মারা য
না। হয় কেমন করে ?

ভবতোষ ॥ তোরা পাস না ?

শচীন। সে কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য হলো পাঁচ ছ' বছরে কত টা
রোজগার করলে একটা লোক পুণার মত জায়গায় জমি কিনে বা
করতে পারে ? চোর !

[মায়ার প্রবেশ।]

মায়া ॥ চিৎকার করছো কেন ? শুনতে পাবে যে।

শচীন ॥ শুনুক। সত্যি কথা বলবো, তাতে ভয় কিসের !

ভবতোষ ॥ সত্যি, আমি ধারণাই করতে পারি না যে—

শচীন ॥ হ্যাঁ। দুটো মিষ্টি কথা শুনে অমন করে গলে যেও না। (জানা
কাছে যায়) সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কি জানিস ? অফিসাররা—মা
ওপর তলায় যাঁরা আছেন—নিজের দেশওআলী ভাই ছাড়া আর কা
ভালো দেখতে চান না।···নইলে হিরুর চাকরিটা অমন করে ফস
যায়!

ভবতোষ ॥ (মায়াকে) আপনার রান্নার তো এখনো দেরি আছে !

মায়া ॥ একটু।

ভবতোষ ॥ শচীন, আমি এই বাইরে থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি। তুই বরং ওঁকে একটু সাহায্য কর। একা মানুষ।

শচীন ॥ কেন? এখন আবার বাইরে যাওয়ার কি হলো?

ভবতোষ ॥ (জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখায়) কলকাতায় তো এ দৃশ্য দেখা যায় না। ছাখ না, ছাখ, সেই আলেকজাণ্ডারের কথা: রাত্রে সুশীতল চন্দ্রমা উদয় হয়ে দেশটারে নাওয়ায়ে দিয়ে যাচ্ছে।

[ওর বলার ভঙ্গিতে সবাই হাসে।]

শচীন ॥ কিন্তু বেশি দেরি করিস না যেন। (ভবতোষ প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁরে ভবতোষ! (ভবতোষ ঘুরে দাঁড়ায়) রাগ করলি না তো?

ভবতোষ ॥ রাগ! কেন?

শচীন ॥ মাঝে মাঝে এমন হয়—কিছুতে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। আমি কিন্তু—

ভবতোষ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই আমাকে কিছু বলেছিস নাকি যে, আমি রাগ করবো? (প্রস্থান)

[শচীন ও মায়া পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। তখনই কেউ কোনো কথা বলতে পারে না।]

শচীন ॥ (হাসতে চেষ্টা করে) ও ছেলে খুব ভালো। আমি তো কলেজের বয়েস থেকে জানি। ভবতোষ কিছু মনে করবে না। তুমি দেখে নিও। ঘুরে আসবে হয়তো কি এক আইডিআ মাথায় নিয়ে।

মায়া ॥ আমি যাই। মাছটা এখনো বাকি আছে। (প্রস্থান)

[শচীন চৌকিতে বসে। কি যেন ভাবে। একটুক্ষণ চুপচাপ। মালকোঁচা ধুতি ও খাকি হাফশার্ট পরা মাঝবয়সী একটি লোক সন্তর্পণে প্রবেশ করে। এদিক

ওদিক দেখে। শচীন লক্ষ্য করে না। লোকটি শচীনের কাছে এসে দাঁড়ায়।]

লোকটি ॥ (মুখখানা শচীনের কানের কাছে এনে) বাবু!

শচীন ॥ (চমকে) কে! ওঃ, উদয়! কি খবর?

উদয় ॥ (ভুরু নাচিয়ে) খবর আছে।

[শচীন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। উদয়কে একপাশে ডেকে নিয়ে যায়। দু-একটা কথা হয় দুজনে; কিন্তু দর্শকরা তা শুনতে পায় না। উদয় শার্টের ভিতরের আর একটা বুক পকেট থেকে একখানা খাম বের করে শচীনের হাতে দেয়। উদয়ের মুখে হাসি। শচীন পলকে একবার ভিতর দিকটা দেখে নেয়।]

উদয় ॥ বাবু, আমার বকশিস!

[শচীন একটা টাকা দেয়।]

গতবারেও একটাকা দিয়েছিলেন। এর পরের বার কিন্তু বেশি না নিয়ে ছাড়বো না।

শচীন ॥ বাব্বা! গতবাব, মানে দেড় মাস আগে কতো দিয়েছিলাম এখনো মনে আছে?

উদয় ॥ আছে না?

শচীন ॥ আচ্ছা, এখন তুই যা। (কিন্তু ইশারায় ওকে দাঁড়াতে বলে। ভিতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসে। হঠাৎ গলা তুলে) দিচ্ছেন, দিন। কিন্তু একবারে দিলেই ভালো হতো। এই বারে বারে ঘুচ্ ঘুচ্ করে শোধ করছেন,—এতে আমারও কোন কাজে আসছে না, (উদয়কে ইশারা করে চলে যেতে) আপনারও দেনা থেকেই যাচ্ছে।

[উদয়ের প্রস্থান। শচীন তার পিছনে পিছনে উইংস পর্যন্ত যায়।]

বুঝি, একবারে দিতে অসুবিধা হয়; কিন্তু আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখুন। (উইংস-এর কাছে দাঁড়িয়ে) চেষ্টা করবেন, বাকিটা যাতে একসঙ্গে দিতে পারেন। পেলে আমার খুব উপকার হয়।

[একটুক্ষণ ওইখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ভিতর দিকে এগিয়ে আসে]

মায়া!

মায়া ॥ (ভিতর থেকে) কেন?

শচীন ॥ শুনে যাও না।

মায়া ॥ (ভিতর থেকে) যাচ্ছি।

[শচীন খামখানা ছিঁড়ে ফেলে। টুক্ করে দেখে নেয়— দশখানা দশটাকার নোট]

শচীন ॥ (স্বগতঃ) গতবার দিয়েছিলো সত্তর।

[ভাবে। কি যেন বুঝতে পারে। মাথা নাড়ে। অজান্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মায়ার প্রবেশ]

মায়া ॥ কি বলছো, তাড়াতাড়ি বলো। মাছ চাপিয়ে এসেছি।

শচীন ॥ এই টাকাটা তুলে রাখো।

মায়া ॥ টাকা। কিসের টাকা?

শচীন ॥ আঃ, টাকা, তার আবার কিসের টাকা কি?

মায়া ॥ না, বলছিলাম, আজ মাসের কতো?—তেইশ তারিখ; এই সময় টাকা এলো কোথেকে!

শচীন ॥ আকাশ থেকে। এমন করো না মাঝে মাঝে!

মায়া ॥ (শচীনের চোখের দিকে তাকিয়ে) চটছো কেন ?

শচীন ॥ চটবো না ? তুমি নিজের কানে শুনলে, ভদ্রলোক নিজে এসে দিয়ে গেলেন একবারে দিচ্ছেন না বলে অতগুলো কথা শোনালাম – তবু কিসের টাকা ? মাসের তেইশ তারিখ।—তেইশ তারিখ আঃ যেন জানি না।

মায়া ॥ (হাত পেতে) দাও।

[শচীন খামখানা মায়ার হাতে দেয়। মায়া গুণে গুণে]

মায়া ॥ কতো আছে ?

শচীন ॥ এক শো।

মায়া ॥ (চোখ তুলে) এক শো।

শচীন ॥ কেন, এক শো কি খুব বেশি হলো নাকি ?

মায়া ॥ নাঃ। (গুণতে গুণতে পস্তানোদ্যোগ করে

শচীন ॥ মায়া শোন।

[মায়া কাছে এসে দাঁড়ায়। শচীন একটু ইতস্ত করে]

বলছিলাম, টাকাটা আচমকা পেয়ে গেলাম। কিছু একটা করে যায় না এ দিয়ে ?

মায়া ॥ কি করবে ?

শচীন ॥ তুমিই বলো না ?

মায়া ॥ আমি কি বলবো। কিসে কি দরকার, তুমি তো সব জানো।

শচীন ॥ তবু বলো না তুমি ?

মায়া ॥ (এক মুহূর্ত ভেবে নেয়) আমি বলি, সামনে শীত, তুমি বরং একটা গরম কিছু তৈরি করে নাও। হবে না এতে ?

ীন ॥ না না ; গরম কাপড় যা আছে, তাতে এই শীত কেন, আরো দুটো শীত চালিয়ে দিতে পারবো। তার চেয়ে তোমার জন্যে একখানা ভাল শাড়ি আর একটা ব্লাউজ পীস্ নিয়ে আসি। মিস্টার বোসের বউ-টউরা যেমন পরে—

য়া ॥ আবার শাড়ি কেন ! আছে তো।

ীন ॥ তাহলে অল্প সোনার কিছু একটা—এই···কানের ঝুমকো জাতীয়—

য়া ॥ সব থেকে ভালো হয়, যদি—(থেমে যায়) থাক।

ীন ॥ থাক কেন ? বলো না ?

য়া। ভাবছি, উচিত হবে কি না।

ীন ॥ কি ?

য়া ॥ ভাবছিলাম, হিকটা ঠায় বসে আছে। মন মেজাজ খারাপ। ওকে একটা কিছু করে দেওয়া যায় না ?

ীন ॥ চেষ্টা তো করলাম। কপালে না থাকলে—

য়া ॥ না না, আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছিলাম, একটা কিছু নিয়ে থাকতো। তাহলে ওর—আচ্ছা, এই টাকা দিয়ে একটা ছোটো-খাটো মনোহারী দোকান বা ওই রকম একটা কিছু করে দেওয়া যায় না ?

[মায়া শচীনের উত্তরের আশায় অপেক্ষা করে। কিন্তু শচীন হ্যাঁ-না কোন উত্তর করে না। মায়ার হঠাৎ মনে পড়ে যায়।]

ওঃ, মাছের তরকারিটা বুঝি ধরে গেলো।

[টাকা শুদ্ধ খামখানা টেবিলের উপর রেখে দ্রুত প্রস্থান]

ীন ॥ হুঁ ! এখন আমার শালার খেদমৎ করতে হবে। বলে, আপনি শুতে ঠাঁই নাই শঙ্করারে ডাক।

[একা একা কথা বলতে বলতে ভবতোষের প্রবেশ।

ভবতোষ ॥ চাঁদ যা একখানা উঠেছে না! ইচ্ছে করে ভেঙে ভেঙে খাই। তোমাদের রাহুটি নেহাৎ বেরসিক ; এ জিনিস একেবারে গিলতে আছে?

শচীন ॥ ভেঙে ভেঙে খেতে হয়?

ভবতোষ ॥ হ্যাঁ একটু একটু করে। হ্যাঁরে, তোদের রথ কে রে?

শচীন ॥ রথ! ও, মিস্টার রথ? আমাদের প্রজেক্টে কাজ করে! কেন?

ভবতোষ ॥ বড়ো মজা হয়েছে। চাঁদ দেখতে দেখতে আসছিলাম। হঠাৎ কানে এলো, দুটো লোক তারস্বরে ঝগড়া করছে। একটু এগিয়ে দেখি, এক বাড়ির সামনে তোদের ওই মিস্টার রথ আর খাকি-পরা এক ভদ্রলোক—প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। উপলক্ষ্য যা বুঝলাম ওই ভদ্রলোক—

শচীন ॥ আমাদের অফিসের বেয়ারা।

ভবতোষ ॥ ও। বেয়ারা!—হ্যাঁ, ওই বেয়ারাটি কিছু একটা চাইছে। আর মিস্টার রথ বলছেন ; এ তার হকের পাওনা। ওই বেয়ারাকে উনি বকশিস বলো আর যাই বলো—কিছুই দেবে না। বেয়ারাটিও নাছোড়। এমন সময় মিস্টার রথ আমাকে মধ্যস্থ মেনে বসলেন।

[শচীন টেবিলের উপর থেকে টাকাশুদ্ধু খামখানা তুলে নিয়ে পকেটে রাখে]

আরে, আমি কী মীমাংসা করবো? আমি জানি কিছু?

শচীন ॥ ঠিক। তুই কোত্থেকে জানবি!

ভবতোষ ॥ শোনে কে! যতো বলি, আমি মশাই নতুন মানুষ, এর মধ্যে আমাকে কেন?—বলে, ওই লোকটাকে বুঝিয়ে দিন ; এর থেকে ও কিছু দাবি করতে পারে না। এ আমার হকের পাওনা।—বোঝো!

শচীন ॥ উদয় কি বললো?

ভবতোষ ॥ উদয় ! উদয় কে ?

শচীন ॥ আরে, ওই বেয়ারাটা।

ভবতোষ ॥ কিছু বললো না। আমাকে দেখে ইস্তক গুম খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একসময় চলে গেলো।

শচীন ॥ ভেরি ইন্‌টেলিজেন্ট। ওই উদয়ের কথা বলছি। রথের সঙ্গে আর কোন কথা হলো ?

ভবতোষ ॥ না। তোরা এদিকে বসে আছিস। হ্যাঁরে, তোর বউকে কি বলে ডাকবো ?

শচীন ॥ কি বলে ?

ভবতোষ ॥ বৌদি বলবো, না, বৌমা বলবো ?

শচীন ॥ যা খুশি বল।

ভবতোষ ॥ (হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে ওঠে) মায়া !

[দ্রুত মায়া'র প্রবেশ। থমকে দাঁড়ায়]

মায়া ॥ (ভবতোষকে) ও, আপনি ? আমি ভাবলাম, এমন করে কে ডাকে !

[শচীন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।]

ভবতোষ ॥ আহ্বানটা বেশ আন্তরিক হয়নি ?

মায়া ॥ (হাসিমুখে) হয়েছে।

ভবতোষ ॥ রান্না হয়েছে ?

মায়া ॥ হয়েছে।

ভবতোষ ॥ খেতে দেবে চলো। ক্ষিদেতে পেটের মধ্যে হাঁকুপাকু করছে।

মায়া ॥ আসুন। (শচীনকে) তুমিও এসো। আর রাত করে কাজ নেই।

শচীন ॥ দাঁড়াও। (এদিকে ফেরে) মিস্টার বোস আসছেন বোধ হয়। তোকে বলেছিলাম, আমার অফিসার—মিস্টার বোস, তোর সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন।—মায়া, তোমাকে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

মায়া ॥ আচ্ছা। (প্রস্থান)

শচীন ॥ তুই বোস। আমি একটু এগিয়ে যাই। আফ্টার অল্ অফিসার তো, মানে ওপরওলা— প্রস্থান)

[ভবতোষ চপচাপ বসে থাকে। নিষ্প্রদীপ। পুনরায় আলো জ্বলতে দেখা যায়] সাহেবি পোশাক পরা মাঝবয়সী মিস্টার বোস, স্টেজের মাঝখানে দণ্ডায়মান। শচীন ও ভবতোষ উপবিষ্ট। একটুক্ষণ চুপচাপ কাটে।

বোস ॥ আবার আমাদের এখানে চুরি হয়েছে।

শচীন ॥ (উঠে দাঁড়ায়) চুরি!

বোস ॥ হ্যাঁ।

শচীন ॥ এই তো দেড়মাস আগে একবার হয়ে গেলো।

বোস ॥ আবার হলো।

শচীন ॥ এবারে কি জিনিস স্যার?

বোস ॥ সঠিক খবর এখনো পাইনি। তবে মনে হচ্ছে, গাঁইতি-বেল্চা-নাট্-বল্ট জাতীয় কিছু হবে।

শচীন ॥ ওঃ, তাহলে এমন কিছু দামী জিনিস না।

বোস ॥ পনেরো হাজার টাকা। তাই বা কম কি!

শচীন ॥ আচ্ছা স্যার, এটা বন্ধ করবার কোনো ব্যবস্থা হয় না?

বোস ॥ কি ব্যবস্থা হবে?

শচীন ॥ পুলিশে খবর-টবর দিয়ে—

বোস ॥ পুলিশ কি করবে ! যারা চুরি করে, তারা তো একা যায় না; অনেককে ভাগ দিতে হয়। পুলিশে খবর দিলে আর একটা ভাগ বাড়বে ; চুরির কোন হদিশ হবে না।

শচীন ॥ আর ভাগ যারা পায়, তাদের অংশটাও প্রোপোরসনেটলি কমে যাবে।

বোস ॥ (শচীনকে লক্ষ্য করে) তা যাবে বৈকি ।

শচীন ॥ সত্যি, এ বড় অসহ্য অবস্থা। চুরি হয়, তার হদিশ হয় না ; লোক ঠকে কিন্তু ঠকের সন্ধান মেলে না। গোলমালটা কোথায় বলতে পারেন স্যার ?

বোস ॥ আমি কেমন করে জানবো ? আমি কি সমাজতাত্ত্বিক না মনস্তত্ত্ববিদ ?

শচীন ॥ (আড় চোখে একবার ভবতোষকে দেখে নেয়, বোসের কাছে এগিয়ে আসে) আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয় ?

বোস ॥ সন্দেহ কাকে করবো বলো ? করলে তো সবাইকেই সন্দেহ করতে হয় ; নিজেও তার থেকে বাদ পড়ি না।

শচীন ॥ ঠিক।

বোস ॥ তবে ওই যে প্যাটেল বলে একটা নতুন অফিসার এসেছে, সে এবং সিং—সিংকে তো তুমি চেনো।

শচীন ॥ (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ।

বোস ॥ এই দুজনে মিলে কিছু একটা করে থাকতে পারে।

শচীন ॥ কুলকারনিদের কেউ নেই বলছেন ?

বোস ॥ থাকতে পারে ; বিচিত্র কি ! যা দিনকাল পড়েছে—কাউকেই তো আর বিশ্বাস করা যায় না।

শচীন ॥ তা বটে।

বোস॥ তুমি কিন্তু ওদের একটু এড়িয়ে চলো। কোথা থেকে কি সাপ বেরিয়ে পড়ে, বলা তো যায় না। পুলিশ না-হয় না-জানলো; কি ডিপার্টমেণ্ট তো ছেড়ে কথা কইবে না। হয়তো এমন কেউ ফেঁ যাবে যা তুমি কোনদিন ভাবতেই পারোনি।

শচীন॥ না স্যার। ওদের সঙ্গে আমার এমনি তো বনিবনা নেই। তা ওপর দেড় মাসের মধ্যে আবার এই চুরির ঘটনা। বাপ রে! ওদের সঙ্গে আমি মিশবো!

[ভবতোষ তখন থেকে একভাবে বসে আছে, শচীন তাকে লক্ষ্য করে]

দাঁড়ান স্যার, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এ হচ্ছে আমার ছেলেবেলার বন্ধু—ভবতোষ। এর কথাই আপনাকে বলছিলাম। আর ইনি হচ্ছেন—

ভবতোষ॥ (উঠে দাঁড়ায়) এঁর কথাও আমাকে বলেছিস। নমস্কার, মিস্টার বোস।

[হাঁক পাড়তে পাড়তে কুলকারনির প্রবেশ]

কুলকারনি॥ ভবতোষবাবু, ঘুমিয়ে পড়েন নি তো! (ঢুকেই মিষ্টার বোসকে দেখে থতমত খায়।) ওঃ, আপনি এখানে, আমি জানতাম না স্যার। গুড্ ইভনিং স্যার। আচ্ছা চলি ভবতোষবাবু। কাল দেখা হবে।

ভবতোষ॥ আহা, এলেনই যখন, বসুন না।

কুলকারনি॥ (শচীন ও মিস্টার বোসের দিকে তাকায়) বসবো!

ভবতোষ॥ (প্রায় জোর করে বসায়) বসুন, বসুন। খাওয়া হয়েছে?

কুলকারনি॥ (সঙ্কুচিত ভাব) হ্যাঁ।

ভবতোষ॥ আপনার উনি কি করছেন?

বোস॥ মিস্টার কুলকারনি।

কুলকারনি ॥ আজ্ঞে স্যার।

বোস ॥ আপনার কোন আইডিআ আছে এবারের চুরিটা কেমন করে হলো?

কুলকারনি ॥ চুরি! আবার?

বোস ॥ কেন, আপনি জানতেন না?

কুলকারনি ॥ ও, হ্যাঁ। উদয় আমার বাড়িতে গিয়েছিলো বটে—আপনি কিসের আইডিআর কথা বলছেন স্যার?

বোস ॥ বলছি, কে বা কারা এই চুরির ব্যাপারে ইনভল্‌ভ্‌ড, আপনার কোন আইডিআ আছে?

কুলকারনি ॥ কারা ইনভল্‌ভ্‌ড!

বোস ॥ মানে, আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

কুলকারনি ॥ (সজোরে মাথা নেড়ে) না স্যার, আমার কাউকে সন্দেহ হয় না।

বোস ॥ অথচ চুরি যে হব, এটা আপনারা জানেন।

কুলকারনি ॥ কি করব স্যার! ঘটনা ঘটেছে—এটা সবাই যেমন জানে, আমিও সেইরকমই জানি।—আমি চলি স্যার। কাল আবার দেখা হবে ভবতোষবাবু। (প্রস্থান)

বোস ॥ (শচানকে) এর শালাই না ওঃ নতুন পোস্টটা হাতিয়ে নিয়েছিলো?

শচীন ॥ হ্যাঁ, স্যার।

[তারস্বরে চিৎকার করতে করতে মিস্টার রথের প্রবেশ।]

রথ ॥ না মশাই। আপনি বাইরের লোক—আপনার উপর আমার ফুল কন্‌ফিডেন্স। আপনাকেই মীমাংসা করে দিতে হবে! (বোসকে দেখে) নমস্কার স্যার। (ভবতোষকে) আপনি তো মশাই চলে এলেন। কিন্তু ও ব্যাটা কাছেই কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে বসেছিলো। দরজা বন্ধ করতে যাবো, এমন সময় লাফ দিয়ে সামনে এসে বললে:

আমার বকশিস? যতো বলি : তোমার পাওনা তুমি পেয়েছো, আমার পাওনা আমি পেলাম—এর মধ্যে বকশিসের কথা আসে কোত্থেকে? কিন্তু—কিছুতে শুনবে না!

বোস ॥ কি হয়েছে?

রথ ॥ ওই উদয় বেয়ারাটাকে আপনি স্যাক্ করুন স্যার। যাচ্ছেতাই রকম ইম্পারটিনেণ্ট্।

বোস ॥ (কঠিন স্বরে) কি হয়েছে?

রথ ॥ কি হয়েছে! আমার হকের পাওনা আমার হাতে পৌছে দিয়েছে, এ জন্যে আমি ওকে বকশিস দেবো কেন?

বোস ॥ বেশ, না-ই দিলেন।

রথ ॥ কিন্তু জুলুম করবে কেন? এটা কি মগের দেশ?

[শচীন ও বোস মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।]

(ভবতোষকে) মশাই, গতবার আমি পুরো একশো পেয়েছিলাম এবার পেয়েছি ষাট। সামনে শীত আসছে; গিন্নীকে একটা গরম কিছু কিনে দেওয়া দরকার। বোন আসবে লিখেছে কটক থেকে বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে নিয়ে। জামাই বেটাও আসতে পারে।—এই অবস্থায় আপনিই বলুন তো, ওই কটি টাকা কি খুব এমন বেশি যে, পাঁচজনকে বিতরণ করে আমায় হাল্কা হতে হবে!

বোস ॥ (শচীনকে) পাগল নাকি?

শচীন ॥ পাগল না স্যার, বদমাস।

রথ ॥ গতবারে বেশ হয়েছিলো। দু ডিপার্টমেণ্ট থেকে দুখানা খাম পেয়েছিলাম, একটায় একশ টাকা, আর একটায় ছিলো পঁচাত্তর। বেশ কিছুদিন দুধে-মাছে কেটেছিলো, মশায়।

ভবতোষ ॥ এগুলো তো আপনার উপরি পাওনা?

রথ ॥ হ্যাঁ, উপরি পাওনা ; কিন্তু আমার একার হবে কেন ? এ তো সবাই পায়।

ভবতোষ ॥ সবাই পায় !

রথ ॥ হ্যাঁ। আরে মশাই, এ তো আর দু-এক শো টাকার সাফাই না। হাজার নয়তো লাখের উপর দিয়ে যায়। ডিপার্টমেন্টে লোক কটা ? সবাইকে কিছু কিছু করে দিলেও শেষ পর্যন্ত যা অবশিষ্ট থাকে—আরে, মজা তো, হল ওপরতলায় যারা—

বোস ॥ (আর চুপ করে থাকতে পারে না) মিস্টার রথ, আপনি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করছেন। কিছু মনে করবেন না ভবতোষবাবু। (রথকে) অফিস সিক্রেসি বজায় রাখার দায়িত্ব বোধহয়—

রথ ॥ আমি তো অফিসের কিছু আলোচনা করছি না।

বোস ॥ (ধমক দিয়ে) তবে কী করছেন ? আমি আপনার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে পারি জানেন ?

রথ ॥ (ভয় পায়। উঠে দাঁড়ায়।) ইয়েস স্যার। সরি স্যার।

বোস ॥ কিছু বলি না বলে মাথায় উঠে যাচ্ছেন দিনদিন।

রথ ॥ আর কোনোদিন করবো না স্যার। এইবারটা মাপ করে দিন স্যার। আই অ্যাম ভেরি সরি স্যার।

বোস ॥ (রথকে একটুক্ষণ লক্ষ্য করে) অন্য কথা বলুন।

রথ ॥ আমি বাড়ি যাই স্যার।

বোস ॥ তাই যান।

[রথ প্রণাম ঠুকে বিদায় নেয়।]

শচীন ॥ (সহাস্যে) ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। পাবলিকের টাকায় গভর্মেন্টের প্রজেক্ট। থেকে থেকে এই রকম চুরি হচ্ছে—কোথায় গভীরভাবে এ নিয়ে চিন্তা করা দরকার, তা না, যত আজে বাজে কথা !

ভবতোষ ॥ চুরির খবরটা মিস্টার রথ জানে ?

শচীন ॥ জানে না মানে ? উদয় ওর বাড়িতে কেন গিয়েছিলো ?

[ভবতোষ হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে থাকে। শচীন ওর কাছে যায়।]

হাসছিস কেন ভবতোষ ? আমি হাসির কথা কী বলছি, অ্যাঃ ?

[ভবতোষ তখনো হাসে।]

গ্যাখ, কী হল তোর ? ভবতোষ—

বোস ॥ (দাঁতে দাঁত চেপে শচীনের উদ্দেশ্যে) আহাম্মুখ ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

শচীন ॥ আপনি চলে যাচ্ছেন স্যার ?

[সিপাহীর প্রবেশ। বোসকে প্রণাম করে তার হাতে এক টুকরো কাগজ দেয়।]

সিপাহী ॥ বড়বাবু এই চিঠিটা আপনাকে—

[বোস সিপাহীর হাত থেকে চিঠি নিয়ে খোলে। পড়তে থাকে। শচীন তার পিছনে এসে উঁকি দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।]

বোস ॥ (শচীনকে) থানার বড়বাবু দেখা করতে বলেছেন।

শচীন ॥ কাকে ?

বোস ॥ (সিপাহীকে) চলো।

[সিপাহী ও বোসের প্রস্থান।]

শচীন ॥ আমিও আপনার সঙ্গে যাবো স্যার।—ভবতোষ, তুই আর বসে থাকিস না, খেয়ে শুয়ে পড়। আমি আসছি থানা থেকে...একবার যাওয়া দরকার। মিস্টার বোসের তলব—

[শচীন ও বোসের প্রস্থান। ভবতোষ গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে। গাইতে গাইতে তক্তাপোষের উপর শুয়ে পড়ে। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে গান গেয়ে চলে। মায়ার প্রবেশ। ভবতোষকে গাইতে দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভবতোষ একসময় গান থামায়।]

মায়া ॥ থামলেন কেন ?

ভবতোষ ॥ (তড়াক্ করে উঠে বসে) কে ! ও, তুমি ? রীতিমত চমকে দিয়েছিলে।

মায়া ॥ আপনি হাসছিলেন কেন ?

ভবতোষ ॥ হাসছিলাম ! কখন ?

মায়া। একটু আগে।

ভবতোষ ॥ ও এমনি। মাঝে মাঝে আমার অমন হাসির উদ্রেক হয়। কেন, আমি নিজেই বুঝি না।

মায়া ॥ এখানে অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, তাই না ?

ভবতোষ ॥ হ্যাঁরে মায়া,—(জিভ কাটে) এই রে, তোকে যে তুই বলে ফেললাম !

মায়া ॥ দাঁড়ান, একটা পেন্নাম করে নি। (এগিয়ে আসে)

ভবতোষ ॥ (হাত তুলে বাধা দেয়) মনে মনে কর। আমি কাউকে পায়ের ধুলো দিই না।

মায়া ॥ কি বলছিলেন যেন !

ভবতোষ ॥ ও, হ্যাঁ। বলছিলাম, সত্যি করে বলতো, তোরা সবাই এখানে কেমন আছিস ?

মায়া ॥ আমি যে একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

ভবতোষ ॥ কি ?

মায়া ॥ এখানে অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, তাই না ?

ভবতোষ ॥ (একটু ভাবে) দুটোর জবাব কিন্তু একই।

মায়া ॥ কি ?

ভবতোষ ॥ গুছিয়ে বলতে পারবো না। সে ক্ষমতা নেই আমার। কি বুঝতে তুইও পারছিস ; আমিও বুঝছি। দুটো প্রশ্নের একটা উ আমাদের দুজনের কাছেই স্পষ্ট। স্পষ্ট না ?

মায়া ॥ মাঝে মাঝে বড়ো কষ্ট হয়। এই তিল তিল করে নষ্ট হয়ে যা —আমরা তো একটু একটু করে মরে যাচ্ছি, দাদা।

ভবতোষ ॥ মরছিস বলেই তো বাঁচার পথ পরিষ্কার হচ্ছে, এটা বুঝিসনা! (নাচিয়ে) ফিলসফি করলাম।

মায়া ॥ মাথায় ঢোকে না। চলুন, আপনাকে খেতে দি। ও পরে খাবে'খন

ভবতোষ ॥ আচ্ছা।

[ভবতোষ উঠতে যাবে, এমন সময় বাইরে অনে লোকের কথাবার্তা শোনা যায়। ভবতোষ জানালা দি দেখে।]

এই দিকেই আসছে রে। তুই ভেতরে যা। আমিও পরে যাব।

[মায়ার ভিতরে প্রস্থান। একসঙ্গে অনেক লোকে প্রবেশ। তার মধ্যে শচীন, মিস্টার বোস, কুলকারনি রথকে আমরা আগেই দেখেছি। এরা ছাড়া নতুন লো যাঁরা এসেছেন, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ ভবতারণবাবু, মিস্টা মিত্র, মিস্টার দুবে ও সিংজীর চেহারা নজরে পড় মতো। আরো আছে কয়েকজন ছোট কেরানি ছোট অফিসার। যে যার জায়গা নিয়ে বসে। কয়েকজ দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় দেখা যায় উদয়ও এক কো জায়গা করে দাঁড়িয়ে গেছে]

বতারণবাবু ॥ রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে।

বে ॥ সিংজী, আপনার পাগড়ীটা ভাল করে ঝেড়ে নিন। যা রকম দেখছি, শেষকালে, হয়তো বলবে'খন ওর মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

বতারণবাবু ॥ তা পারে। কোথা থেকে এলো মশাই এ মালটি ?

॥ কে জানে। বলছে তো হাজারীবাগ !

বে ॥ পাখি পালিয়েছে বলছিলো না ? কী পাখি ?

তারণবাবু ॥ গরুড় পক্ষী। বামগরুড়। মশাই, রাত্তির হয়েছে, কোথায় খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বে। তা না, এখন বসে বসে সুবচনীর বচন শুনতে হবে।

ত্র ॥ দে আর মাস্ট বি সামথিং সিরিআস। তা নইলে এই রাত্রে এতগুলো লোককে ডেকে পাঠাবে কেন ?

তারণ ॥ আপনি আর তাল দেবেন না তো। ইয়ং ম্যান্, আপনি কি বুঝবেন !

ত্র ॥ (সহাস্যে) আমার বয়েস পঁয়তাল্লিশ।

তারণ ॥ (হাত দিয়ে হাটু দেখায়) হাটু। হাটু। আমার সাতষট্টি।

॥ কোথায় ? মিস্টার শার্লক হোমস্ 'আসছি' বলে কই এখনো তো এলেন না ?

তারণ ॥ দেখ, পথে কার চুলের কাঁটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

[সবাই হাসে।]

বে ॥ সবই কপাল মশাই। আমাদের এই সহরে চুরি বলুন, খুন-জখম-রাহাজানি চার-শো-বিশ—কিছু নেই। মিথ্যে কথা বলতে আমরা ভুলে গেছি। এমন কি একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট পর্যন্ত হয় না। অথচ যত উৎপাত

এসে জেটে আমাদের কপালে।—আরে উদয়, তুইও এসেছিস ? (উদ
হাসে) দেখে যা মজাটা, এসেছিস যখন ।

শচীন ॥ (ভবতোষকে) তুই এখনো বসে আছিস কেন ? যা না, খেয়ে-দে
শুয়ে পড় ।

ভবতোষ ॥ এতক্ষণই রইলাম যখন, দেখেই যাই না মজাটা ।

[রথ উঠে গিয়ে ভবতোষের পাশে বসে ।]

ভবতারণ ॥ যা বলেছেন । আপনিই আজ কলকাতা থেকে এসেছেন না
(ভবতোষ মাথা নাড়ে) দেখে যান মশাই, দেখে যান । এমন বিচি
জিনিস আর কোথাও পাবেন না ।

ভবতোষ ॥ (হাসিমুখে) খুঁজলে সবখানেই পাওয়া যায় ।

ভবতারণ ॥ তাই নাকি ?

রথ ॥ (ভবতোষকে) আপনি বুঝলেন, কাল সকালে একবার আমার বাড়ি
আসুন—কোয়ার্টার সি-১১২, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে ।

দুবে ॥ আচ্ছা, এর কোন মানে হয় ? কতক্ষণ বসে থাকবো মশায় ?

ভবতারণ ॥ বসুন, বসুন, এসেছেন যখন ।

রথ ॥ কে রে ?

[জানালার কাছে কুলি ছোকরার মুখখানা দেখা যায়

ভবতারণ ॥ বা রে, বা ! তোকেও ডেকেছে নাকি ?

বোস ॥ সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন নোংরা লাগছে । আমরা কি
কুলি মজুর, না চোর-গাঁটকাটা যে, যখন যেখানে যতক্ষণ খুশি বসিয়ে
রাখবে ?

শচীন ॥ চা খাবেন স্যার ?

বোস ॥ নাঃ ।

শচীন ॥ আপনারা কেউ খাবেন ?

বতোষ ॥ মায়া বলছিলো, দুধ নেই। একটু আগে আমি চেয়েছিলাম কি না।

চীন ॥ সে বন্দোবস্ত করা যাবে। বলুন না, খাবেন কেউ?

বে ॥ নাঃ। থাক।

বতারণ ॥ আমি দশ গুনবো। তারমধ্যে যদি তোমাদের মিস্টার শার্লক হোমস্ না-আসেন, আমি বাড়ি চলে যাবো। এক—

কাবনি ॥ (ভবতোষকে) এই ঝামেলার জন্যে আপনার সঙ্গে আজ আর কথা বলা গেলো না!

॥ দেখে-শুনে আমি একেবারে তাজ্জব।

তারণ ॥ দুই—

াস ॥ তোমার কি মনে হয় শচীন?

॥ ইকুয়েডর।

॥ প্যাসিফিক না?

তারণ ॥ তিন—

বে ॥ প্রোডাকসনের অবস্থা—

॥ বললে মশাই কথা শোনে না!

তারণ ॥ চার—

ত্রি ॥ হবে কেমন করে! ফরেন এক্সচেঞ্জ—

॥ ভালো না।

তারণ ॥ পাঁচ—

বে। যত চ-চ-চ—মানে চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ। বাঙালি ভাইদের কাছে শুনেছি।

ত্রি ॥ বাঙালি আপনার ভাই নাকি?

তারণ ॥ ছয়—

মিত্র ॥ নতুন শুনলাম।

[এবম্বিধ আলাপ তথা কথোপকথন ক্রমশ গুঞ্জনে পবি
হয়। ভবতারণবাবু আট পর্যন্ত গোনেন ; এমন স
থানার অফিসার মিস্টার দাস প্রবেশ করেন ; স
প্রৌঢ়গোছের এক ভদ্রলোক। চুলের দুপাশে পা
ধরেছে। বয়সে পঞ্চাশ। পরনে ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবি
লোকটি বেজায় রোগা ও লম্বা। নাম মিস্টার আগ
ওয়াল। ওর হাতে এ্যাটাচিকেস। এরা ঢুকতে হট্টগো
থেমে যায়।]

দাস ॥ আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো। এক ব্যাটা সাইকেল রিক্
একটা বাচ্চাকে চাপা দিয়েছে।

দুবে ॥ বাচ্চা! এতরাতে বাচ্চা এলো কোথা থেকে ?

ভবতারণ ॥ ওভার রান ?

মিত্র ॥ ওভার রান নয়, রান ওভার।

ভবতারণ ॥ ওই হলো। মানে, ওপর দিয়ে চলে গেছে ?

দাস ॥ না। সামান্য চোট লেগেছে।

দুবে ॥ রিক্সাওয়ালাকে ফাঁসিয়েছেন তো ?

দাস ॥ হ্যাঁ। ব্যাটার রিক্সায় আলো ছিলো না।

ভবতারণ ॥ (পাশেরজনকে) সাইকেল রিক্সাও ওঁর ব্যাটা, রিক্সাওয়ালা
ওঁর ব্যাটা।

দাস ॥ কি বলছেন, ভবতারণবাবু ?

ভবতারণ ॥ বলছিলাম, আপনারা মশাই ভাগ্যবান। পুলিশে চাকরি ক
তো ; তাই চারদিক একেবারে ব্যাটার ছড়াছড়ি। যাকে বলে ব্যাট
জগৎ।

স॥ (বোকার মতো হাসে) আলো ছিলো না।

ত্র॥ আলো থাকলেও দেখতে পেতো না।

স॥ (চটে যায়) তাই বলে একজনকে চাপা দিয়ে নির্বিবাদে চলে যাবে ?

বতারণ॥ ওভার রান তো হয়নি।

স॥ না, ওভার রান নয় হয়নি ; কিন্তু যা হয়েছে—

গরওয়াল॥ আমরা কি এই আলোচনা করার জন্যে এইখানে এসেছি, মিস্টার দাস ?

স॥ কিন্তু ওঁরাই তো কথাটা তুললেন !

বতারণ॥ তুলে ফেলেছি যখন, একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই ভালো হতো না ?

গরওয়াল॥ না। আমার সময় কম।

বে॥ আমাদের কিন্তু অঢেল সময়।

[আগরওয়াল দাসকে ইশারা করে।]

স॥ শুনুন। সত্যি আমাদের হাতে সময় কম।

॥ তাহলে এত দেরি করে এলেন কেন মশায় ? সেই কখন থেকে বসে আছি।

স॥ বললাম যে। অ্যাক্সিডেন্ট।

বে॥ নিন নিন, বলুন কি বলার আছে।

স॥ আপনারা একটু মন দিয়ে শুনুন, তাহলেই তো বলতে পারি।

ত্র॥ তার মানে ? আপনি কি বলতে চান—আমরা আপনার কথা শুনছি না ?

স॥ আহা, আমি তো তা বলছি না। আমি বলছি, বিষয়টা গুরুতর ! ইনি—মানে, মিস্টার আগরওয়াল এসেছেন বাইরে থেকে।

বতারণ॥ কোন্ বাইরে ?

স॥ ধ্যাৎ ! আপনারা বড়ো গোলমাল করেন।

বোস ॥ আপনার যা বলার, আপনি বলে ফেলুন না।

দাস ॥ এইরকম বারবার বিরক্ত করলে কখনো বলা যায় ?

ভবতারণ ॥ (বোসকে) আসলে, ব্যাটা ঠেঙিয়ে এত বড়োটা হয়েছে ; গুছি

কথা বলা তো কোনদিন অভ্যেস করেননি !

াস ॥ নাঃ, গুছিয়ে কথা বলার অভ্যেস যতো আপনারাই করেছেন।

[ভবতোষ সশব্দে হেসে ওঠে। সবাই ওর দিকে তাকা

ভবতোষ গম্ভীর হয়।]

আগরওয়াল ॥ (দাসকে) মিস্টার দাস, আপনি বসুন।

[দাস একটু ইতস্তত করে বসে। আগরওয়াল উপস্থি

সবাইকে উদ্দেশ্য করে —]

শুনুন। আপনাদের অনেকক্ষণ এভাবে বসিয়ে রাখতে হয়েছে, এজ

আমরা দুঃখিত। কিন্তু উপায় ছিলো না ; কারন—মিস্টার দা

বলেছেন—অ্যাকসিডেন্ট। অ্যাকসিডেন্ট সত্যিই—

ভবতারণ ॥ ও ব্যাপারে আমরা কনভিন্সড্।

আগরওয়াল ॥ গুড্। আমার নাম আগরওয়াল। মিস্টার দাস বলেছেন,

আমি বাইরে থেকে এসেছি।

ভবতারণ ॥ বাইরে মানে ?

দাস ॥ (চরম বিরক্ত) মঙ্গল গ্রহ।—এমন প্রশ্ন করেন না—

আগরওয়াল ॥ আপনি চুপ করুন মিস্টার দাস। (দাস মুখ ব্যাজার কর

বসে থাকে) বাইরে মানে, এই শহরের বাইরে থেকে।

মিত্র ॥ হেতু ?

আগরওয়াল ॥ বলছি।

[দাসের কাছ থেকে ফাইলটা চেয়ে নেয়। একখান

কাগজ বের করে চোখ বুলিয়ে]

দিন কয়েক আগে কাগজে আপনারা একটা সংবাদ দেখে থাকবেন। সংবাদটা ছিল এইরকম ঃ হাজারীবাগ জেল হইতে কয়েদীর অন্তর্ধান।

ভবতারণ ॥ ধরা পড়েছে?

…বে ॥ অত সহজ নয়। যে পালায়, সে কি ধরা দেওয়ার জন্যে পালায় মশায়? লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট—

আগরওয়াল ॥ কাগজে যেটুকু বেরিয়েছে, তথ্য হিসেবে তা নিতান্তই সামান্য। আসলে, আমার ব্যক্তিগত মত, কয়েদী হলেও—লোকটি অসাধারণ। কারণ, সে লোক ঠকাতো, সে চুরি করতো, সে ডাকাতি করতো—কিন্তু খুন না করে : স্ত্রী লোক সম্পর্কে তার কুৎসিৎ রকম দুর্বলতা,—খারাপ অর্থে বলছি। এক কথায়, হেন কুকর্ম নেই, যা সে করেনি।

মিত্র ॥ এত খবর আপনি জানলেন কেমন করে?

আগরওয়াল ॥ আমার রিপোর্ট বলছে।

…ল ॥ বাঃ! বেশ রিপোর্ট।

…ণ ॥ আচ্ছা, আমাদের এখানে যে মাঝে মাঝে চুরি হয়—এই দেড়মাস আগে একবার হয়েছিলো ; ক'দিন আগে আর একবার হয়েছে ; এরা সবাই জানেন ;—

[সবাই ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে]।

গভর্নমেন্টের, মানে প্রজেক্টের মাল—আচ্ছা, এই চুরি সম্পর্কে আপনার কাছে কোন রিপোর্ট নেই?

আগরওয়াল ॥ সে রিপোর্ট তো আমার কাছে যাবে না।

…ণ ॥ তবে?

আগরওয়াল ॥ যাবে (দাসকে দেখিয়ে) ওঁর কাছে।

ভবতারণ ॥ সেরেছে! আপনি বলুন, তারপর কি বলছিলেন।

আগরওয়াল ॥ হ্যাঁ।—হেন কুকর্ম নেই, যা সে করেনি। কিন্তু মজা হচ্ছে, কেউ তাকে ধরতে পারতো না। কারণ, (একটু থেমে) কেউ তাকে চিনতোই না।

বোস ॥ সে কি!

আগরওয়াল ॥ হ্যাঁ। কেউ তাকে চিনতো না। চিনবে কেমন করে? নাম কি তার একটা! এই খবর পাওয়া গেলো, হারানচন্দ্র নাম নিয়ে কি একটা করে এসেছে; ধরতে গিয়ে দেখলাম, হারানচন্দ্র বলে সেখানে কেউ নেই; কে এক মজিদ মিঞা—

ভবতারণ। বাঙালি?

কুলকারনি ॥ হলোই বা।

আগরওয়াল ॥ বুঝতেই পারেন; তখন আবার মজিদ মিঞার খোঁজ শুরু হলো। কিন্তু কোথায় মজিদ মিঞা! সে তখন মুদালিয়র নাম নিয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ভাবে তার অন্তত দশটি নাম আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া, আসামী, ইউ-পি, দক্ষিণ ভারত—প্রায় কোনটাই সে বাদ দেয়নি।

ভবতারণ ॥ মহামতি।

আগরওয়াল ॥ ঠিক। ভাষা জানে আটটা। ভাবতে পারেন? আজ কলকাতা কাল পাটনা, পরশু লাখনৌ। কোথায় নেই সে! এই খবর পেলেন, সে বোম্বাই গেছে। আপনি ধাওয়া করে বোম্বাই গেলেন, কিন্তু শুনলেন, সে তখন বিশাখাপট্টমে এক ব্যবসাদারকে ফাঁসিয়ে বসে আছে।

বোস ॥ এত খবর কি সত্যিই আপনার রিপোর্টে আছে?

আগরওয়াল ॥ আছে বৈকি! নইলে আমি বলছি কেমন করে? মোদ্দা কথা, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আমরা তাকে ধরতে পারিনি।

দুবে ॥ তবে ?

আগরওয়াল ॥ সে নিজে ধরা দিয়েছিলো।

বোস ॥ বাঃ, শুনলেও ভালো লাগে।

আগরওয়াল ॥ কিন্তু ধরে রাখা গেলো না যে। জেল হলো বারো বছর। কিন্তু বছর দুই ঘানি টেনেই বোধহয় সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। হাজারী-বাগের মতো অমন কড়া জেল থেকে কেমন করে পালিয়ে গেলো।

বোস ॥ আশ্চর্য।

নরনারণ ॥ তা মশাই এমন একজন অসাধারণ আসামীকে ঘানি টানানোই বা কেন? বসিয়ে খাওয়ালেই তো হতো।

আগরওয়াল ॥ তা হতো। কিন্তু এখন সে কথা ভেবে কোন লাভ আছে কি?

সিং ॥ আমাদের কিছুতেই লাভ নেই মশাই! এই যে আপনি বসে বসে গপপ করছেন, এ শুনেই বা আমাদের কী লাভ।

দাস ॥ সিংজী পাগড়ীটা খুলে বসুন মাথা আপনার গরম হয়ে আছে।

সিং ॥ (দাসকে প্রচণ্ড ধমক দেয়) সাট আপ।

বথ ॥ (সিংকে) আপনি ওকে বকছেন?

নরনারণ ॥ শুধু উনি কেন, মিস্টার দাসকে বকলে আমরা অনেকেই বকতে পারি, ইচ্ছে হলে গালও দিতে পারি। তাই না?

[বোসের দিকে তাকায় • বোস অস্বস্তি বোধ করে]

(দাসকে) কি যে পুলিশের চাকরি নিয়েছেন মশায় গাল খেয়েই জীবন গেলো।

বোস ॥ শুধু গাল খাবেন কেন। আমরা ওঁকে ভালবাসি না?

দাস ॥ আপনাদের ভালবাসাই তো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আগরওয়াল ॥ কিন্তু কয়েদীটি যে জেল থেকে পালিয়ে গেলো—এখন কি করা যায়?

সিং॥ ইট ইজ ইওর হেডেক্।

আগড়ওয়াল॥ একা আমার?

সিং॥ নয়তো কি?

ভবতারণ॥ হ্যাঁ মশাই, কয়েদী পালিয়ে গেলো বলে কি আমাদের ধরে ধরে জেলে পুরবেন নাকি?

আগরওয়াল॥ না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার একটা আবেদন। এই আসামীকে খুঁজে বের করার কাজে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

ভবতারণ॥ লাও ঠ্যালা। আমরা কী সাহায্য করবো?

আগরওয়াল॥ আমি আগেই বলেছি: তার অনেক নাম—হাবানচন্দ্র, মির্জা মিঞা, ছট্টু সিং, মুদালিয়ার, পানিগ্রাহী, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মিস্টার ডেভিস, ওড়িয়া মিস্টার দাস; আরো অনেক সে বহুরূপী, কখনো সে বাঙালি, কখনো তার নুর দাড়ি, কখনো তার মোটা গোফ—বিহারী ছট্টু সিং, কখনো তার কপালে চন্দন—মুদালিয়র; আরো অনেক তার দুষ্কর্মের খতিয়ান আমি আগে দিয়েছি। এইবার আপনারা ভেবে বলুন, কি ভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

বোস॥ বড় মজা হলো দেখছি! মিস্টার আগরওয়াল, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

আগরওয়াল॥ নিশ্চয়ই পারেন। আর সেই জন্যেই তো আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

[কেউ কিছু বুঝতে পারে না; পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।]

আপনারা ভাবছেন, তিরিশ মাইল দূরে হাজারীবাগ জেল—সেখান থেকে আসামী পালালো, এতে আপনাদের কি দরকার থাকতে পারে। তাই না?

বোস ॥ ঠিক তাই।

আগরওয়াল ॥ আসামীটি এই দিকেই এসেছে। আমার—

বোস ॥ এই দিকে!

আগরওয়াল ॥ হ্যাঁ। আমার রিপোর্ট হচ্ছে, (উপস্থিত সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়; তারপর ধীরে ধীরে) আসামী এই শহরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।

সং ॥ (চিৎকার) ইম্পাসবল।

মিত্র ॥ (বোসকে) নেশা টেশা করেনি তো?

বোস ॥ (মিত্রকে) পুলিশের লোক সেজে এইসব আজেবাজে বকছে; ইম্পারসোনিফিকেশান নয় তো?

ডবে ॥ ঠিক কোনখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে, এটা আপনার রিপোর্টে নেই?

আগরওয়াল ॥ আনফরচুনেটলি না। (জোর দিয়ে) কিন্তু সে যে এই শহরেই অবস্থান করছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ আমার রিপোর্ট তাই বলছে।

ভবতোষ ॥ রিপোর্টে থাকলেও, সে যে এই সহরের বাইরে আর কোথাও নেই, একথা কি খুব জোর দিয়ে বলা যায়?

আগরওয়াল ॥ তা হয়তো যায় না। কিন্তু আমার রিপোর্ট যখন—

ভবতারণ ॥ আপনি এখন কী করতে চান?

আগরওয়াল ॥ (হেসে) ভয় নেই; আপনাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চাই না। কিন্তু আমার আবেদন এই ধরনের একটি প্রচ্ছন্ন আসামী

—প্রচ্ছন্ন বলছি এই কারণে যে, ওকে কখনো স্পষ্ট করে চেনা গেলে না। আমার আবেদন, আপনারা ওকে ধরিয়ে দিন।

ভবতারণ॥ কিছু বুঝতে পারছি না।

আগরওয়াল॥ আসামীর অনেক নাম। কিন্তু সে এইখানে লুকিয়ে আছে। আপনারা তাকে ধরিয়ে দিন।···কোন্ কোন্ দুষ্কর্মে সে লিপ্ত থাকে, আপনারা জানেন। আপনারা তাকে ধরিয়ে দিন।···আসলে সে কি —বাঙালি, না বিহারী, না ওড়িয়া, না আসামী, না আর কিছু,—ও আপনারা জানেন। আপনারা তাকে ধরিয়ে দিন।

ভবতারণ॥ ওই একটা কথা কেন বারবার বলে আমাদের রাত্রের ঘুম ছুটিয়ে দিচ্ছেন ?

আগরওয়াল॥ আপনারা তাকে ধরিয়ে দিন।

সিং॥ (চিৎকার করে) আই অবজেক্ট।

আগরওয়াল॥ (গলা তুলে) সেই বহুরূপী পলাতক আসামী আপনাদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে আছে। আপনারা তাকে ধরিয়ে দিন। (একে একে সবাইকে লক্ষ্য করে) আপনারা তাকে চেনেন। তার সব অপকর্মের খবর আপনারা রাখেন। আপনাদের এখানেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে সে। আপনারা তাকে—(হেসে) ধরিয়ে দেবেন না ?

[আগরওয়াল যেন উত্তরের অপেক্ষা করে। কিন্তু কেউ কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে কাটে কিছুক্ষণ। আগরওয়াল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।]

বেশ। আপনাদের দায়িত্ব আপনারা পালন করলেন না। ভাল কথা, আমি বাইরে থেকে এসেছি। আসামী ধরার জন্যে আমি কী করতে পারি বলুন !—দাস, ছবিগুলো দেখ।

[দাস ফাইলটা থেকে খামে মোড়া কয়েকটা ফটো আগরওয়ালের হাতে দেয়। আগরওয়াল খাম খুলে ছবিগুলো দেখে।]

আপনাদের সুবিধের জন্যে আসামীর খানকয়েক ছবি—যা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি—এখানে রেখে গেলাম। আপনারা দেখুন, যদি চিনতে পারেন। (খামখানা টেবিলের উপর রেখে।)—চলুন দাস, আমরা যাই। [দাস ও আগওয়ালের প্রস্থান।]

[সবাই ওদের গমন পথের দিকে তাকায়; তারপরে নজর যায় টেবিলের উপর খামখানার দিকে। কয়েকমুহূর্ত কাটে। তারপর সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার উপর। 'আমি আগে'—'দেখি দেখি' ইত্যাদি সোরগোল। সবাই আগে দেখতে চায়। বিশৃঙ্খলা। সিং-এর হাতে এসে পড়ে খামখান। সিং টেনে সবাইকে দূরে সরিয়ে দেয়; একটা একটা করে ছবি দেখতে থাকে। ভবতোষ চুপচাপ লক্ষ্য করে যায়।]

সিং ॥ এটা বাঙালি।

শচীন ॥ খুব মজা লাগছে, না?

সিং ॥ এ নিশ্চয় ওড়িয়া।

বং ॥ (ভবতোষকে) আপনিই বলুন মশাই—

[সিং ছবিগুলো ভবতারণের হাতে দেয়। একসঙ্গে কয়েকজন ছবি দেখে।]

ভবতারণ ॥ বাঙালির মত দেখতে, কিন্তু নিশ্চয়ই আসামী কিম্বা ওড়িয়া!

গুবে ॥ এই যে, পাঞ্জাবী। কি সিংজী—

সিং ॥ (গর্জন) খবরদার!

[কয়েকজন ছবি দেখে। মন্তব্য শোনা যায়—ভোজপুরী। ইউ-পি। বিহারী। ওড়িয়া। বিহারী। মাদ্রাজী। মিস্টার ডেভিস।—আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সবাই একসঙ্গে কথা বলে। নিজের জাতের সম্পর্কে কোন মন্তব্য শুনতে কেউ রাজি নয়। হাত পা ছুঁড়ে তারস্বরে চিৎকার করে। স্টেজের উপর চরম বিশৃঙ্খল—প্রায় দক্ষযজ্ঞের সূচনা হয়। মায়ার প্রবেশ। ভবতো চুপচাপ বসে ছিলো। মায়া পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। ভবতোষের হাত ধরে টেনে তোলে। ইশারায় হাতখানা মুখের কাছে এনে জানতে চায়—'খেতে হবে না?' ভবতোষ ইশারায় বলে—'চলো।'

পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে দুজনের ভিতর দিকে প্রস্থান। স্টেজের উপর তখন তুমুল কাণ্ড চলছে।]

পর্দা

ধূসর দিগন্ত

রচনাকাল : ১৬ই জুন '৫৮ থেকে ১৯শে জুন '৫৮।

প্রথম অভিনয় : ২৮শে আগষ্ট '৫৯

প্রযোজনা : বঙ্গীয় নাট্য সংসদ

পরিচালনা : শ্রীষোড়শীকুমার মজুমদার

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

অভিনেতৃবৃন্দ

সীমা : শ্রীউমা দাশগুপ্ত

চয়ন : শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (পরে রমেন লাহিড়ী)

সন্দীপ : শ্রীরমেন লাহিড়ী (পরে দিলীপ রুদ্র)

সাণ্ডেল : শ্রীচিনু গোস্বামী (পরে ষোড়শী কুমার মজুমদার)

ডাক্তার : শ্রীঅদিৎ কুণ্ডু

[সাণ্ডেল মশাইয়ের বসবার ঘর। ঘরটি আসবাবপত্রের বাহুল্য বর্জিত। নাদিকে একটি আরাম কেদারা। আর একদিকে একটি ছোট টেবিল ঘিরে দুটি চেয়ার। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে একটি মাঝারি সাইজের বুকসেল্‌ফ। কিছু বই, সংবাদ পত্র। আরাম কেদারার সামনের দিকে একটি নীচু মোড়া। রে দুটি দরজা। একটি দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়, অপরটি দিয়ে ভিতরে। পেছনের দেওয়ালের মাঝ বরাবর একটি জানালা—পর্দা ঝোলান। দেওয়ালে 'টি ছবি। একটি সুইচবোর্ড।

পটোত্তলিত হ'লে দেখা গেল সাণ্ডেলমশাই আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে ব'সে—কি যেন ভাবনায় তন্ময়। নীল আলো জ্বলছে। দূর থেকে বিয়ে বাড়ীর শানাই-এর সুর ভেসে আসছে।

বাইরে থেকে চয়ন এলো। একটু পরে শানাই থেমে গেল।]

চয়ন ॥ একি ! আপনি এখনও বসে ! (সুইচ টিপে বড় আলো জ্বালালো)
মেসোমশাই ? শুনছেন ?

সাগুেল ॥ উঁ ।

চয়ন ॥ তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নিন । এখনি মামাবাবু এসে পড়বেন !

সাগুেল ॥ হুঁ ।

চয়ন ॥ হুঁ কি ? আর কত রাত ক'রে বিয়ে বাড়ী যাবেন ?

সাগুেল ॥ আঃ চুপ কর না চয়ন । গানটা শুনতে দে ।

চয়ন ॥ গান ! ক'ই গান ? গান তো থেমে গেছে ।

সাগুেল ॥ থেমে গেছে ! তাইতো । কি ভুল দেখ, আমি ভাবছিলাম বুঝি...
কিন্তু কেন থামলো বল দেখি ?

চয়ন ॥ ভাবনা কি ? এখনি আবার শুরু হবে । পয়সা খরচ ক'রে এমপ্লিফায়া
বসিয়েছে—যন্তরটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত থামবে নাকি । কিন্তু আপি
আর ব'সে থাকবেন না । তৈরী হ'য়ে নিন । (বুকসেল্‌ফ থেে
একটা প্যাড আর কলম টেনে নিল । পকেট থেকে একটা চিঠি বা
ক'রে দেখতে লাগলো) কি হলো ? আবার কি ভাবতে শুরু করলেন!

সাগুেল ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)—নাঃ । ভাবিনি কিছুই ।

চয়ন ॥ তবে ?

সাগুেল ॥ জানিস চয়ন, শানাই শুনতে শুনতে পুরোনো দিনের কত কথা
যে মনে পড়ছিলো !...কিন্তু কেমন যেন সব এলোমেলো...ছাড়াছাড়া
...কাউকে যদি এক এক ক'রে শোনাতে পেতাম সব—বেশ হ'তো।
(একটু চুপ । চয়ন চিঠিতে মন দিল) তুই শুনবি চয়ন ? কেউ
জানেনা সে সব কথা ।

চয়ন ॥ তাহ'লে আমারও জেনে দরকার নেই । (চেয়ারে বসলো । চি
পড়তে সুরু করলো ।)

গেল ॥ কিন্তু অনেক কথাই যে আমার বলার আছে রে। কথাগুলো যেন বুকের মাঝে জমাট বেঁধে আছে। আর বেশী দিন না ব'লে থাকতে হ'লে আমি ঠিক দমবন্ধ হ'য়ে মারা যাবো।

ন ॥ (নরম সুরে) বেশ তো, কাল শুনবো। তাহ'লে হবে তো।

[আবার একটু চুপচাপ। চয়ন চিঠি লিখতে লাগলো!
সাণ্ডেল কি ভাবতে লাগলেন। বেহালা শুরু হলো।]

ণ্ডেল ॥ (একটু খুশী) ঐ শোন চয়ন, আবার সুরু হ'য়েছে। বেশ বাজাচ্ছে নারে?···(ক্রমশঃ বিষণ্ণ) কিন্তু সুরটা এত করুণ। কেবলই মনে হ'চ্ছে, কে যেন একটি মেয়ে অনেক দুঃখ পেয়ে একটানা কেঁদে চলেছে। তুই শুনতে পাচ্ছিস নে চয়ন! (অস্বস্তি বাড়ছে তাঁর)

ন ॥ আবার শুরু করলেন তো? বেশ, যা খুশী করুন, আমি আর কিছু বলবো না।

ণ্ডেল ॥ তুই রাগ করছিস চয়ন।

য়ন ॥ রাগ কি আর সাধে করি? দিন রাত যত সব আজে বাজে কথা ভেবে নিজের মনকে অস্থির করবেন, আমাদেরও স্বস্তিতে থাকতে দেবেন না। আর, একবার ব'কতে শুরু করলে তো থামবার নামও করেন না।

াণ্ডেল ॥ থামবো রে, থামবো যেদিন চুপ করবো সেদিন একেবারে চুপ করবো। যতদিন বেঁচে আছি, মন খুলে দুটে কথা ব'লে নিতে দে। কত কথা যে বলার আছে।

য়ন ॥ সব কথা আজ ব'লে দিলে কাল কি বলবেন? তার চেয়ে একটু চুপচাপ ব'সে গান শুনুন। আমি ততক্ষণ সীমার চিঠির জবাবটা শেষ ক'রে নিই। (আবার লিখতে শুরু করলো।)

সাণ্ডেল ॥ সন্ধ্যে থেকে তো কেবল একটা চিঠিই লিখছিস। কি লিখলি পড় না শুনি।

[একটু চুপচাপ। বিয়ে বাড়ীতে এখন অন্য গা বাজছে]

চয়ন ॥ দাঁড়ান শেষ ক'রে নিই। তারপর শোনাবো।

সাণ্ডেল ॥ আচ্ছা। (আবার গা এলিয়ে দিলেন। চুপচাপ। শুধু বি বাড়ীর গান ভেসে আসছে।) আচ্ছা, সীমাকেও তো ওরা নেম ক'রেছিলো। ও এলো না কেন বল তো ?

চয়ন ॥ (হেসে) ক'লকাতা থেকে বর্ধমানে নেমন্তন্ন খেতে আসবে ! লো যে পাগল বলবে।

সাণ্ডেল ॥ ও এলে কিন্তু বেশ হ'তো। কতদিন যে ওকে দেখিনি ! তু এক কাজ কর চয়ন। ঐ চিঠিতেই লিখে দে পত্রপাঠ যেন চ'লে আসে

চয়ন ॥ আমারও তো সেই ইচ্ছে। কিন্তু মামাবাবুর হুকুম তো জানেন ছ'মাস অন্তর ও এখানে আসতে পাবে। এখনও পাঁচ মাস হয় ও গিয়েছে। এখনি আবার আসতে লিখলে উনি যদি রাগ করেন ?

সাণ্ডেল ॥ কিচ্ছু করবে না। আমার মেয়েকে আমি আসতে লিখবো, বারণ ক'রবে কেন ? না না, তুই আজই ওকে আসতে লিখে দে পত্রপাঠ যেন চ'লে আসে।

চয়ন ॥ সন্দীপকে সংগে নিয়ে আসতে লিখি ?

সাণ্ডেল ॥ সন্দীপকে ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বড় ভাল ছেলে সন্দীপ। স্মা ইয়ংম্যান। ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

চয়ন ॥ আচ্ছা মেসোমশাই, সন্দীপকে তো আপনি, ডাক্তারমামা দুজনে খুব ভালবাসেন। ওর সংগে সীমার বিয়ে দিলে কেমন হয় ?

গুল ॥ বিয়ে ! সীমার ! !

ন ॥ হ্যাঁ, সন্দীপের সংগে বিয়ে হ'লে সীমা খুব সুখী হবে।

গুল ॥ না, না। ও আমি কিছু জানিনা। ডাক্তার যা বলবে তাই হবে।

ন ॥ তিনি আবার কি বলবেন ? মেয়ে তো আপনারই। আমি বলি কি, ওদের বিয়ে দিয়ে দিন। তারপর—

গুল ॥ আঃ, চুপ করনা চয়ন। সেই থেকে কি বিয়ে বিয়ে ক'রছিস !

ন ॥ (অসন্তুষ্ট) বেশ, আমি চুপ করলাম। পরে আমাকে এ বিষয়ে হাজার কথা জিগ্যেস করলেও আমি একটিও উত্তর দেবো না।

গুল ॥ আচ্ছা, আচ্ছ যা। ভারী মাতব্বর হ'য়েছিস। আমার মেয়ে, আমি যা ভালো বুঝবো, তাই করবো···ব্যস।

ন ॥ তা করলেও তো বুঝি। কিন্তু করেন ক'ই ? সব ভার তো ডাক্তার-মামার উপর ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ ব'সে আছেন।

গুল ॥ (হেসে) আরে বোকা ! তাতে যে আমারই লাভ তা বুঝিস না ? ছেলে মেয়ে মানুষ করা কি কম ঝামেলার কাজ ! ডাক্তার বোকা, তাই গায়ে প'ড়ে এত করে। (হাসতে লাগলেন)

ন ॥ ও, মেয়ের ভবিষ্যৎ ভালো মন্দের চেয়ে নিজের আরামটাই বড়ো হ'লো ! আচ্ছা, সীমা আসুক এবার। আমি তাকে সব ঠিক ব'লে দেবো।

গুল ॥ বেশ, বেশ। দিসনা ব'লে। সে কি আমার মাথা কেটে নেবে নাকি ? তেমন মেয়েই সে নয়। এদিক থেকে ঠিক ওর মায়ের স্বভাবটি পেয়েছে। (হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে) ক'ই কি লিখছিস দেখি ? আমায় কলমটা দে—

ন ॥ থাক, আমিই লিখে দিচ্ছি। আর একটুখানি আছে। আপনি চুপচাপ ব'সে থাকুন। আমি লেখা শেষ ক'রে নিই।

সাণ্ডেল ॥ আচ্ছা। (কেদারায় গা ভাসিয়ে দিলেন। চয়ন লিখতে লাগল'। দূর থেকে গান ভেসে আসছে। সাণ্ডেলমশাই একটু চুপ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—) আচ্ছা শ্যামলীর কথা তোর মনে আছে চয়ন ?

চয়ন ॥ (চিঠি থেকে মুখ না তুলেই)—আঃ।

সাণ্ডেল ॥ আহা, একটা জবাব তো দিবি ?

চয়ন ॥ কবে ছোট বেলায় দু' একবার তাঁকে দেখেছি। এখনও মনে থাকে? বাড়াতে তো একটা ছবি পর্য্যন্ত নেই।

সাণ্ডেল ॥ আমারও তো হয়েছে সেই মুশকিল। কত চেষ্টা করি তার মুখখানা স্পষ্ট ক'রে ভাবতে কিছুতেই পারি না।

চয়ন ॥ ডাক্তারমামার এইসব কাজগুলো আমারও অদ্ভুত লাগে। কেন যে উনি মাসীমার একটা ছবিও বাড়ীতে রাখেননি······কেন যে উনি সীমাকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতে চান—তার মানেই খুঁজে পাই না আমি। অথচ জিজ্ঞেস করলেও কোন উত্তর দেন না।

সাণ্ডেল ॥ (হেসে) আসলে, ডাক্তারের একটু মাথার দোষ আছে বুঝলি। দেখনা, সীমাকে চিরটা কাল রেখে দিল কলকাতায় হোস্টেলে হোস্টেলে —আর পাটনা থেকে তোকে নিয়ে এলো এখানে আমার দেখা শোনা করার জন্যে ! আচ্ছা তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি বল ? নিজের মেয়ের চেয়ে তো তুই আপন ন'স ?

চয়ন ॥ তা এসব কথা আমাকে ব'লে লাভ কি ? ডাক্তার মামাকে ব'লতে পারেন না ? তিনি সামনে এলে তো একেবারে বোবা হয়ে যান। (বাইরে থেকে ডাক্তারের সাড়া পাওয়া গেল—চয়ন)

—ঐ ডাক্তারমামা এসে পড়েছেন। এখনও তৈরী হ'য়ে নেন নি দেখলে ঠিক বকাবকি করবেন।

সাণ্ডেল ॥ (সন্ত্রস্তভাবে) তা আমি কি করবো ? সেই থেকে পাঞ্জাবীটা খুঁজছি—পাচ্ছি না। কোথায় যে সব রাখিস—

চয়ন ॥ (চেয়ারের ওপর থেকে জামা তুলে নিয়ে) এই তো, হাতের কাছেই রয়েছে। নিন। (জামাটা দিল। সাণ্ডেল প'রে ফেললেন। কথা বলতে বলতে ডাক্তার এলেন।)

ডাক্তার ॥ Are you ready সাণ্ডেলমশাই ? (ভেতরে এলেন) বাঃ, এইতো তৈরী দেখছি। গয়নাটা কিনতে গিয়ে একটু দেরী হ'য়ে গেল। (পকেট থেকে দুলের বাক্সটা বার ক'রে) এই দেখ।

সাণ্ডেল ॥ (হাতে নিয়ে) বা: ! চমৎকার !

চয়ন ॥ বাঃ বেশ সুন্দর তো। সীমার জন্যও কিনলেন না কেন।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, ওকে না দেখিয়ে কিনি। তারপর ডিজাইন ভাল না, অবড়জং —এই সব সাত কথা শুনতে শুনতে মরি আর কি। কি বলো সাণ্ডেল মশাই ?

সাণ্ডেল ॥ (এতক্ষণ গয়না দেখছিলেন) সীমার বিয়ের সময় আমিও তাকে এমনি একটা গয়না দেব ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ (হেসে) দূর, কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই।

সাণ্ডেল ॥ কেন ? চয়ন যে বলছিলো সন্দীপের সংগে সীমার বিয়ের কথা !

ডাক্তার ॥ (গম্ভীরভাবে) চয়ন ?

চয়ন ॥ (বিব্রত হ'য়ে) আমি—আমি বলছিলাম ওদের বিয়ে দিলে কেমন হয়—

ডাক্তার ॥ এসব কথা নিয়ে ওঁর সংগে আর কোন দিন কোনও আলোচনা ক'রবে না।

সাণ্ডেল ॥ কিন্তু, ওরা যে মনে বড়ো কষ্ট পাবে ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ ওরা যাতে কষ্ট না পায়, সে ব্যবস্থা আমিই করবো। সীমা তোমাকেও কিছু লিখেছে নাকি চয়ন ?

চয়ন ॥ পর্শু একটা চিঠি পেয়েছি ওর। সরাসরি কিছু লেখেনি। তবে ওর চিঠির ভাবে মনে হ'লো—

ডাক্তার ॥ না, না। ওকে ওসব বাজে ভাবনা ক'রতে বারণ ক'রে চিঠি লিখে দাও। পড়াশুনোর ভাবনা চলোয় গেল—। আচ্ছা কি তুমি ওকে যত শীগ্‌গির সম্ভব একবার আসতে লিখে দাও। ওকে অনেক দরকারী কথা বলার আছে। সেই ভাল হবে কি বলো সাণ্ডেল মশাই ?

সাণ্ডেল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল। যতসব বাজে ভাবনা নিয়ে সময় নষ্ট করা। তুই আজই চিঠিটা লিখে রাখ চয়ন। আমি ফিরে এসে সই ক'রে দেব। চলো ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ চলো। দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাও চয়ন।

[সাণ্ডেল ও ডাক্তার চ'লে গেলেন। চয়ন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো বিরক্ত মনে।]

চয়ন ॥ দুজনেরই তো হুকুম হ'লো মেয়েকে আসতে লিখতে। কিন্তু তিনি যে কি মূর্তিতে আসবেন কে জানে ?—যাকগে আমার লেখার কথা, লিখেতো দিই। তারপর যা হয় হবে। (চিঠি লিখতে বসলো। প্রথমে অসমাপ্ত চিঠিটা পড়লো) "সন্দীপকে কেন্দ্র ক'রে তোমার মনে যে বেশ একটি আবর্তের সৃষ্টি হ'য়েছে—তা তোমার চিঠিটা পড়েই বুঝেছি। মনে মনে ডাক্তারমামাকে বিরুদ্ধ পক্ষ স্থির ক'রে নিয়ে যে সব কথা লিখেছো, তা প'ড়ে রীতিমত শংকিত হ'য়েছি। আমার মনে হয়—কোথায় যেন কি একটা বোঝার ভুল হ'চ্ছে তোমার। সামনে থাকলে হয়তো প্রবল তর্ক করতে পারতাম। তা যখন নেই, তখন দূর থেকে দুটি কথাই ব'লতে পারি শুধু—"ক্রোধের তুল্য শত্রু নাই"।

আর "পরের জন্যে ঘর ভাঙ্গা বুদ্ধিমানের কাজ নয়"। যাই হোক, তোমার কথাগুলো মেসোমশাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছি। তবে ডাক্তারমামাকে রাজী করাতে না পারলে কোনও কাজই হবে না।

[পা টিপে টিপে বাইরের দোরে সীমা এলো। তার হাতে স্যুটকেশ, ভ্যানিটি ব্যাগ]

কিন্তু ভাবছি, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?"

সীমা ॥ কেন, আমি !

চয়ন ॥ (চমকে উঠলো।) আরেঃ সীমা! তুমি! কি আশ্চর্য্য সাড়া দিয়ে আসতে হয় ?

সীমা ॥ বেশ তো বাড়ী পাহারা দিচ্ছিলে! তা কি পড়া হচ্ছিল ?

চয়ন ॥ চিঠি। তোমাকেই লিখছিলাম।

সীমা ॥ সত্যি! দেখি, দেখি। (সীমা নিতে গেল। চয়ন সেটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো।)

চয়ন ॥ না, না। এ আর দেখে কাজ নেই।......শেষ পর্য্যন্ত তুমি তাহ'লে সত্যিই এলে, এ্যাঁ!

সীমা ॥ বাঃরে, আমার বন্ধুর বিয়ে, আর আমিই আসবো না!

চয়ন ॥ তাই বলে নেমন্তন্ন খেতে ক'লকাতা থেকে বর্দ্ধমান! লোকে শুনলে হাসবে যে! (সীমা ভেতর দিকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো)—তা এলেই যখন সন্দীপকে নিয়ে এলে না কেন ?

সীমা ॥ এসেছে তো! বাজারে ফুল কিনতে পাঠিয়েছি।—বাড়ীতে কারো সাড়া শব্দ পাচ্ছি না যে ?

চয়ন ॥ ওঁরা এই মাত্র অসীমাদের বাড়ী গেলেন।

সীমা ॥ ও। (চেয়ারে ব'সে) বাবার শরীর এখন কেমন আছে ?

চয়ন ॥ ঐ যেমন থাকে। ক'দিন বেশ ভালো থাকেন। তারপর হঠাৎ কি হয়—দিনরাত আবোল তাবোল ব'কতে থাকেন। রাতে ভালো ঘুম হয় না। বর্তমানে এই অবস্থাই চলছে—তবে একটু ভালো।

সীমা ॥ আচ্ছা চয়নদা, বাবার অসুখটা ঠিক কি বলো তো? যতবারই আসি এই এক কথাই তো বলো।

চয়ন ॥ ডাক্তারমামা বলেন—ওঁর এটা এক ধরনের মানসিক রোগ। মাসীমা হঠাৎ মারা যাওয়াতে খুব একটা শক পেয়েছিলেন। সেই থেকে রোগটা দাঁড়িয়ে গেছে।

সীমা ॥ ধ্যাৎ! সেই পুরোনো কথা। আমাকে তোমরা ছেলেমানুষ মনে করেছো না?—কিচ্ছু বুঝি না—

চয়ন ॥ বেশতো, তুমি নিজেই ডাক্তারমামাকে জিগ্যেস করো।

সীমা ॥ ওঁকেও জিগ্যেস ক'রে দেখেছি—ঐ এক কথাই বলেন। যাই হোক আমি ঠিক ক'রেছি বাবাকে এবার সঙ্গে ক'রে ক'লকাতায় নিয়ে যাবো। সেখানে ভালো ডাক্তার দেখানোও হবে—আর আমি কাছে কাছে থাকলে ঠিকমত সেবাযত্নও পাবেন। তুমি কি বলো?

চয়ন ॥ হ্যাঁ, যুক্তিটা তো ভালোই। কিন্তু ডাক্তারমামা কি রাজী হবেন?

সীমা ॥ রাজী হন ভালোই। না হলে আমি জোর ক'রে বাবাকে সংগে নিয়ে যাবো।

চয়ন ॥ কিন্তু এ কাজটা করা যে কত অসম্ভব—

সীমা ॥ (ক্রমশঃ উত্তেজিত) এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে পারি কিনা তুমি দেখো। এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করার জন্যেই আমি আজ এসেছি। বেশ বুঝছি ওঁর খেয়াল খুশী মত চলতে গেলে—সর্বনাশ হয়ে যাবে। যাক. আমি যাই। রাস্তার পোষাকটা বদলে আসি।

(স্যুটকেশ নিয়ে চ'লে গেল। সীমার উত্তেজনা দেখে চয়ন বিস্মিত। চিঠিটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে যেন আপন মনেই বললে—)

চয়ন ॥ ঝড়ের পূর্বাভাস! (চিঠি ছিঁড়তে লাগলো। সন্দীপ এলো। পরনে প্যাণ্টশার্ট। হাতে একগোছা রজনীগন্ধা)

সন্দীপ ॥ (দোরের কাছ থেকে) আসতে পারি!

চয়ন ॥ (সন্দীপকে দেখে বিস্মিত আনন্দে) আরে সন্দীপ! এসো, এসো। How nice of you to come! (তার হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিল)—ব'সো। ব'সো।

সন্দীপ ॥ (ব'সতে ব'সতে) একা ঘরে ব'সে ভাবছিলে কি অত?

চয়ন ॥ (হাসতে হাসতে) তোমাদের আসার কথাই!

সন্দীপ ॥ আচ্ছা! টেলিপ্যাথী!

চয়ন ॥ কতকটা তাই বটে! আজকেই তোমাদের আসতে বলার কথা হচ্ছিল।

সন্দীপ ॥ (এদিক ওদিক দেখে) সীমা কই? এসে পৌঁছয় নি?

চয়ন ॥ হ্যাঁ। ঐ যে (বুকসেলফে রাখা তার ভ্যানিটী ব্যাগটা দেখালো। দুজনে খুব হাসলো) ওঘরে গেছে। ও এলে তুমিও রাস্তার পোষাকটা বদলে ফেল। একষ্ট্রা জামা কাপড় এনেছো তো?

সন্দীপ ॥ সীমাই জানে। ওই তো স্যুটকেশ গুছিয়েছে। নিয়েছে নিশ্চয়ই।

চয়ন ॥ বাব্বাঃ, এখনও তবু বিয়ে হয় নি! হ'লে যে কি করবে! (সন্দীপ লজ্জা পেল) কিন্তু এতখানি পর-নির্ভরশীলতা ভাল নয় সন্দীপ।

সন্দীপ ॥ কেন? ওর ওপর নির্ভর ক'রে তো আমার বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না।

চয়ন ॥ সে না হয় আজ হ'চ্ছে না। কিন্তু ধরো, যদি কোনও কারণে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়—তখন কি করবে? ভবিতব্যের কথা তো

বলা যায় না কিছু। (সন্দীপকে বিমর্ষ দেখে) কি হ'লো? বিচ্ছেদের নাম শুনেই মন ভেঙ্গে গেল!

সন্দীপ॥ না, না সেজন্যে নয়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল—তাই।

চয়ন॥ কি কথা শুনতে পারি?

সন্দীপ॥ শোনাতে আমার আপত্তি নেই। তবে এখনই শোনানো উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি।

চয়ন॥ (হাল্কা সুরে) কি ব্যাপার বলো তো! তোমার কথার মাঝে একটা যেন রীতিমত বিস্ময়ের আভাস পাচ্ছি! খুব জটিল কোন সমস্যায় পড়ে থাকো তো বলে ফেলো। প্রয়োজনমত দু' দশটা উপদেশ দিলেও দিতে পারি!

সন্দীপঃ তা হয়তো পারো। কিন্তু মনে হ'চ্ছে—যথেষ্ট দেরী হ'য়ে গেছে।

চয়ন॥ আরেঃ তাতে কি হয়েছে? Better late than never, তুমি বলে ফেলো দেখি কথাটা।

সন্দীপ॥ (একটু হেসে) ব্যাপারটা তুমি যত হাল্কা ভাবে নিচ্ছো চয়নদা, সত্যিই কিন্তু ততটা হাল্কা নয়।

চয়ন॥ নিশ্চয়ই! প্রেমিক প্রেমিকাদের হৃদয় সংক্রান্ত সমস্যা কখনও হাল্কা হ'তে পারে! তুমি বলো শুনি। (সন্দীপ ইতস্ততঃ করতে থাকে) আবেঃ, তবু ইতস্ততঃ করে দেখ! (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে) বেশ নাও—আমি গম্ভীর হ'য়েই শুনছি। কি বলবে বলো?

সন্দীপ॥ (থেমে থেমে) ক'দিন হ'লো সীমা হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাড়ী চ'লে এসেছে।

চয়ন॥ (খুবই বিস্মিত) সে কি! কেন?

সন্দীপ॥ সে কথা তুমি ওকেই জিগ্যেস করো।

চয়ন॥ কিন্তু…তুমি ঠাট্টা করছো না তো সন্দীপ?

সন্দীপ ॥ না।

চয়ন ॥ সীমা যে এভাবে তোমাদের বাড়ী চলে গেল, তোমার মা বাবা কিছু বলেন নি ?

সন্দীপ ॥ সে অনেক কথা। সব কথা বলবে ব'লে সীমা তৈরী হ'য়েই এসেছে।

চয়ন ॥ (বিরক্ত) তুমিই বা তাকে বাধা দাও নি কেন ? ছিঃ ছিঃ, ডাক্তার-মামা, মেসোমশাই এসব কথা শুনলে কি বলবেন বলো তো ? তোমাদের কি সব তাতেই ছেলেমানুষী ! (চয়ন উত্তেজিত হ'য়ে উঠে গেল একদিকে) সীমা যে শেষ পর্য্যন্ত এমনি একটা কাণ্ড ক'রে বসবে তা আমি ভাবতেই পারি নি।

সন্দীপ ॥ (বিপন্নভাবে) দোষ হয়তো আমারই সব থেকে বেশী। সে জন্যে আমি যে মনে মনে কত অপরাধী হ'য়ে আছি ! চিন্তায় চিন্তায় আমি অস্থির হ'য়ে গেলাম। এখন তুমি ছাড়া আমি আর কোনও অবলম্বনই দেখছি না চয়ন দা।

চয়ন ॥ কিন্তু আমি আর কতদূর কি করতে পারি বলো ? যা করবার তাতো করেই ফেলেছো। ভালোভাবে বললে হয়তো বিয়েতে ওঁদের মত করানো যেত। কিন্তু এই কাণ্ডের পর ব্যাপার যে কতদূর গড়াবে তা কে জানে ! (সন্দীপ হতাশ হয়ে ব'সে পড়েছে)—আরে তুমি যে সত্যিই বড় মুষড়ে পড়লে ! অন্যায়টা ক'রেছে সে, অথচ এমন করছো যেন সব দোষ তোমার ! You are too nervous I see !

[ভেতর থেকে সীমা আসছিলো। সে শুনতে পেল শেষের কথাটা।)

সীমা ॥ ঠিক বলেছো চয়নদা ওর মত এমন নার্ভাস লোক আমি আর দেখি নি। (সন্দীপ সন্ত্রস্ত হ'লো) আমার যেটুকু সাহস আছে—ওর সেটুকুও নেই।

চয়ন ॥ পুরুষমানুষদের অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয় সীমা। তোমাদের মত দুঃসাহসী হ'লে চলে না।

সীমা ॥ (ব্যঙ্গ ক'রে) হুঁ—উনি যে কত ভেবে চিন্তে কাজ করেন তা আমার বেশ জানা আছে। (সন্দীপকে) যাও, হাত মুখ ধুয়ে পোষাকটা বদলে এসো। ওঘরে সুটকেশটা আছে।

চয়ন ॥ তাই যাও সন্দীপ। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। ওঁরা এলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। Don't worry, (সন্দীপ ভেতরে গেল।)

সীমা ॥ (হেসে) সন্দীপ বুঝি তোমার কাছে আমার নামে যা তা লাগাচ্ছিলো? (চয়ন চুপ) কি হলো? কথা বলছো না যে?

চয়ন ॥ নাঃ হয়নি কিছু।

সীমা ॥ তবে? আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় বুঝি খুশী হও নি?

চয়ন ॥ না, তা নয়। আমি অন্য কথা ভাবছি।

সীমা ॥ অন্য কথা!

চয়ন ॥ তোমার অনেক কাজ আর কথা আমরা এতদিন ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু সন্দীপের মুখে আজ সব কথা শুনে—

সীমা ॥ (গম্ভীর হ'য়ে গেল) ও! সন্দীপ তা'হলে সব কথা ব'লে দিয়েছে! Treacherous!

চয়ন ॥ তুমি ব'লতে চাও আমাদের কাকেও কিছু না জানিয়ে হোস্টেল ছাড়াটা তোমার অন্যায় হয় নি?

সীমা ॥ (একটু চুপ থেকে) আর কিছু বলে নি ও? বেশ রং চড়িয়ে, ফলাও ক'রে—নিজের কোনও দোষ নেই তা প্রমাণ করার জন্যে?

চয়ন ॥ তুমি তো খুব ভাল করেই জানো, কারো নামে অযথা দোষ দেবার ছেলেই নয় সে। এমন কি তোমার এই কাজের জন্যে ও নিজেকেই

দোষী মনে করে।... আমি শুধু ভাবছি সীমা, এতখানি বেপরোয়া তুমি হ'লে কেমন ক'রে!

সীমা ॥ হোষ্টেল তো আমাকে একদিন ছাড়তেই হতো। দু'দিন আগে আর পরে—তাতে কি আসে যায়?

চয়ন ॥ তা আসে যায় বৈকি। আর সেটা যে তুমিও না জানো তা নয়।

সীমা ॥ আমাকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে তোমাদের যে খুব সুবিধে হয় তা আমি জানি। কিন্তু তোমরা কি সত্যিই ভেবেছিলে আমি চিরটাকাল এমনি হোষ্টেলে হোষ্টেলেই কাটিয়ে দেব!

চয়ন ॥ সীমা!

সীমা ॥ বলো কি বলতে চাও? তবে দোহাই—আর উপদেশ দিও না। তোমাদের উপদেশ শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।

চয়ন ॥ (ক্ষুব্ধভাবে) নাঃ, উপদেশ আমি দেব না। সে অধিকারও সম্ভবতঃ আমার নেই। তবে একটা অনুরোধ করবো—আর কোনও হঠকারিতা করার আগে ডাক্তারমামার মতটুকু অন্ততঃ নিও।

সীমা ॥ মামাবাবুর মতামতের ওপর আমার আর একটুও শ্রদ্ধা নেই চয়নদা। নিজের ভালোমন্দের ভার তাই এবার থেকে নিজের হাতেই নেব ঠিক ক'রেছি!

চয়ন ॥ (বিস্মিত) এ তোমার হলো কি সীমা! তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনবো—তা যে আমি ভাবতেই পারি নি!

সীমা ॥ (বিষণ্ণভাবে) আমিই কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম চয়নদা যে, শেষ পর্য্যন্ত আমাকে এই কাজ করতে হবে! কিন্তু তবু করতে হলো। কেন জানো? মামাবাবুর অর্থহীন একগুঁয়েমীর জন্যে। কিছুদিন আগে বিয়েতে মত জানতে চেয়ে ওঁকে চিঠি দিয়েছিলাম।

চয়ন ॥ তুমি আলাদা ক'রে ওঁকে চিঠি দিয়েছিলে! আমি তো কিছুই জানিনা। কি জবাব দিয়েছিলেন উনি?

সীমা ॥ মামাবাবু যে শুধু অমতই জানিয়েছিলেন তা নয়। হুকুমও দিয়েছিলেন, আমি যেন সন্দীপের সঙ্গে মেলামেশা করা বা ওঁদের বাড়ীতে যাওয়া আসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিই। সন্দীপের বাবাকেও উনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটাও আমার হাতে পড়েছে। দেখবে সে চিঠিগুলো?

চয়ন ॥ না—থাক।

সীমা ॥ আমি জানি মনে মনে তুমি আমার ওপর রাগ করেছো। কিন্তু আমার অবস্থায় যে না পড়েছে সে বুঝবে না কেন আমি এ কাণ্ড ক'রেছি। যাই হোক, শেষবারের মত আর একবার ওঁর মত চাইবো। মত দেন ভালই, না দেন রেজিস্ট্রি বিয়ের পথ তো কেউ আটকাতে পারবে না।

চয়ন ॥ থামো, থামো। তুমি যে এতখানি বেহায়া নির্লজ্জ হ'তে পারো তা আমি ভাবতেই পারি না।

সীমা ॥ (সমান উত্তেজনায়) আত্মরক্ষার জন্যে মানুষে মানুষ খুন ক'রতে পারে, আর আমি একটু নির্লজ্জ হ'লেই যত দোষ? ওঁদের দুজনের ইচ্ছে অনিচ্ছের ভরসায় থেকে তো আর আমি আমার জীবনটাকে ভাসিয়ে দিতে পারি না! পারি কি? তুমিই বলো?

চয়ন ॥ কি জানি সীমা, তোমার মত ভালোমন্দের বিচার করার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমার নেই। (প্রস্থানোদ্যত)

সীমা ॥ তুমি আমার ওপর রাগ ক'রলে চয়নদা?

চয়ন ॥ নিজের ভালো হবে মনে ক'রে তুমি যদি কোন কাজ করো—তাতে আমার রাগ করার তো কিছুই থাকতে পারে না।

সীমা ॥ আমার দুঃখের কথাটা কি তুমিও বুঝবে না চয়নদা! সেই কোন ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। এতটুকু বয়স থেকে জীবন কাটছে

হোস্টেলে হোস্টেলে। বাবার কাছে থাকবার হুকুমও নেই। ঘরের সুখের জন্যে আমার মন কি একটুও চঞ্চল হয় না মনে করো! (তার স্বর ক্রমশঃ ভারী হলো)

(সান্ত্বনার সুরে) সব বুঝি সীমা—তোমার দুঃখের কথা আমরা সবাই বুঝি! তোমার দুর্ভাগ্যের কথা তুলে কতদিন মামাবাবুকে আক্ষেপ ক'রতে শুনেছি। মেসোমশাই সম্পূর্ণ অন্য আর এক জগতের মানুষ। তবু তাঁকেও মাঝে মাঝে তোমার জন্যে ভাবতে দেখেছি। তুমি বিশ্বাস করো, এঁরা সত্যিই তোমার ভালো চান। তাঁদের ভুল বুঝে কিংবা উত্তেজনার ঝোঁকে শুধু নিজের একটুখানি সুখের জন্য কোন কাজ ক'রে তাঁদের দুঃখ দেওয়া কি তোমার উচিত হবে? বলো?

ওঁদের দুঃখ দেওয়ার কথা আমিও ভাবতে পারি না। কিন্তু আমারও যে ফেরবার কোনও উপায় নেই চয়নদা—কোনও উপায় নেই! (কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো)

আরেঃ! এ তুমি কি ছেলেমানুষী শুরু করলে বলোতো! ছিঃ মুখ তোল, মুখ তোল বলছি। (জোর ক'রে তার মুখটা তুলে ধরলো) তুমি তো আচ্ছা বোকা! কি না কি ব'লেছি—আর অমনি চোখে জল এসে গেল! চোখ মোছ। মোছ শিগগির। (সীমা রুমালে চোখ মুছল) তোমাদের যত বড় বড় কথা কেবল মুখে। আরে, অত ভাবনা কি এঁ্যা? ওঁরা দুই বুড়ো একদিকে, আমরা তিন জোয়ান আর একদিকে। জিত্‌তো আমাদের হবেই! (সীমা হাসলো) যাক বাবা—হাসি ফুটেছে এতক্ষণে! বিয়ে বাড়ী যাবে। কোথায় মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। তা না, যত সব আজে বাজে কথা ভেবে মন খারাপ করা। এদিক থেকে বাপের স্বভাবটা পুরোপুরি পেয়েছো দেখছি।

সীমা ॥ থামো। থামো।

সন্দীপ ॥ (সন্দীপ কথা ব'লতে ব'লতে এলো, পরনে ধুতি পাঞ্জাবী) I am ready চয়নদা।

চয়ন ॥ ধুতি পাঞ্জাবী পরে সন্দীপকে কি ভালোই না দেখাচ্ছে দেখ সীমা।

সীমা ॥ তুমি নিজে ভালো কিনা—তাই সব কিছুর মধ্যেই ভালো বৈ মং কিছু দেখতে পাও না।

সন্দীপ ॥ Exactly! তুমি ঠিক আমার মনের কথাটিই বলেছো সীমা। দেখেছো চয়নদা, আমাদের দুজনের মনেব কত মিল?

চয়ন ॥ তাইতো দেখছি। যাক তোমবা বসো—আমি এক্ষুনি তৈরী হ'য়ে নিচ্ছি। (যেতে গিয়েও ফিবে) আর সীমা—অমনি মুখ গোঁজ ক'রে বসে না থেকে তুমি বরং দু' একটা গান তৈবী করে নাও! কি জানি ওরা যদি বাসরে গাইতে বলে! কি বল সন্দীপ?

সন্দীপ ॥ নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

সীমা ॥ হ্যাঁ, এখন আমার গান গাইবার সময়ই বটে। তুমি যাও তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নাও।

চয়ন ॥ তথাস্তু। (চলে গেল)

সন্দীপ ॥ (সীমার কাছে এসে) চয়নদা সত্যিই ভারী ভালো লোক—কি বলো? (উত্তর নেই) কি হ'লো? তুমি হঠাৎ এত গম্ভীর হ'য়ে গেলে যে! চয়নদার প্রশংসা করে অন্যায় করেছি! বেশতো বলো, এখনি ওর নামে ঝুড়ি ঝুড়ি......

সীমা ॥ (হঠাৎ) আমি যে হোষ্টেল ছেড়ে দিয়েছি, সে কথা এক্ষুনি তুমি ওকে জানাতে গেলে কেন?

সন্দীপ ॥ ওঃ তাই! (একটু হাল্কা সুরে) কিন্তু কত আর লুকোবে তুমি সীমা? জানাজানি তো একদিন হ'বেই?

সীমা ॥ সে যখন হ'তো, তখন হ'তো। তাছাড়া এঁদের সব কথা জানানোর ভার তো আমি নিজেই নিয়েছি।

সন্দীপ ॥ (তেমনই হাল্কাভাবে)। কিন্তু এই লুকোচুরি আমার আর ভালো লাগছে না সীমা। কোনও দোষ না ক'রেও যেন মস্ত দোষী হ'য়ে আছি।

সীমা ॥ ও—যত দোষ বুঝি আমিই করেছি?

সন্দীপ ॥ (বিব্রত ভাবে) না, না। আমি তা বলিনি। ব্যাপার কি জানো, গোড়াতেই একটু ভুল হয়ে গেছে—

সীমা ॥ আর সে জন্য আজ আফশোষের শেষ নেই—তাই না? বেশ তো, অত ভাবনার কি আছে? তোমার ফেরার পথ তো খোলাই আছে।

সন্দীপ ॥ (বিস্মিত) এ তুমি কি বলছো সীমা!

সীমা ॥ কেন, অন্যায় ব'লেছি কিছু?

সন্দীপ ॥ (সীমার কাছে গিয়ে) আশ্চর্য! তুমি আজও আমাকে বিশ্বাস করতে পারো না!

সীমা ॥ (কঠিন ব্যঙ্গে) কি জানি সন্দীপ, পুরুষমানুষদের যে কখন বিশ্বাস করা যায়, কখন যায় না—তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

সন্দীপ ॥ (আহত) সীমা!

সীমা ॥ (যেন রুখে দাঁড়ালো) বলো, কি ব'লতে চাও?

সন্দীপ ॥ (কয়েকমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে তাকে দেখে, ক্ষুব্ধ স্বরে) তুমি যে আমাকে কোনদিন এভাবে অপমান করতে পারো—তা আমি ভাবতেও পারি নি সীমা।

সীমা ॥ (ভুল বুঝে অনুতপ্ত) আমাকে তুমি ক্ষমা করো সন্দীপ। তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। কিন্তু চয়নদা এমন সব কথা বললে, যা শুনে মনটা বড় দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। কেবলই

মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আজ আর আমার এমন কেউ নেই, যার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি।

সন্দীপ॥ আরেঃ, তুমি তো আচ্ছা পাগল! এই সব আজে বাজে ভাবনায় মনকে দুর্বল ক'রে লাভ কি? বিশ্বাস করো সীমা,—(বাইরে থেকে সাণ্ডেল ডাকলেন—কইরে চয়ন, কোথায় গেলি?)

সীমা॥ ঐ বাবা এলেন। (দোরের কাছে গেল। সাণ্ডেল এলেন) বাবা! (নমস্কার করলো)

সাণ্ডেল॥ আরেঃ সীমু! তুই! আমি জানি তুই আসবি। চয়নটা কেবলই বলে আসবে না। (সন্দীপ নমস্কার করলো) বাঃ বাঃ বেশ। তোমা এসেছো দেখে আমি খুব খুশী হ'য়েছি! এসো, এসো। বসো।

[চয়ন এলো।]

চয়ন॥ আপনি একা ফিরলেন যে! ডাক্তারমামা কোথায়?

সাণ্ডেল॥ এই দেখ চয়ন, এরা এলো কিনা? তুই তো কেবলই বলছি আসবে না। তারপর, my young hero—কেমন আছো?

সন্দীপ॥ ভালোই। আপনি?

সাণ্ডেল॥ আমি! আমি কেমন আছি তা বলতে পারে ডাক্তার আর চয়ন। আমি এখন কেমন আছিরে চয়ন? (সকলে হাসলো।)

চয়ন॥ ভালো। খুব ভালো।

সাণ্ডেল॥ শুনলি তো মা? ডাক্তার কেবলই বলে আমার শরীর ভালো নয় আরে, তাই ব'লে নেমন্তন্ন বাড়ীতে আমায় খুশী মত কিছু খেতেই দিলে না।

চয়ন॥ ভারী অন্যায় করেছেন তিনি না? রাত্তিরে আপনি কোনদিন বেশী খান? না, খেলে সহ্য হয়?

সাণ্ডেল॥ বেশ বাবা বেশ, এবার থেকে রাত্তিরে আমি না খেয়ে থাকবো—হলো তো? (সকলে হাসল)

চয়ন ॥ বেশ, চেষ্টা করে দেখবেন। তোমরা বসো, এখনই আসছি। (চয়ন চলে গেল।)

সাণ্ডেল ॥ যাকগে, মরুকগে। সব লোককে রুগী ভাবাটাই যে ডাক্তারদের প্রধান রোগ—তা কে না জানে এ্যাঁ? (হাই তুললেন) আঃ এত ঘুম পাচ্ছে।

সীমা ॥ সেকি! এরই মধ্যে ঘুম পাচ্ছে! আমরা যে ভেবেছিলাম আজ অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে তোমার সঙ্গে গল্প করবো!

সাণ্ডেল ॥ (খুব খুশীতে) সত্যি বলছিস মা! আমি তাহ'লে এখন আর কিছুতেই শোব না।

সন্দীপ ॥ না, না আপনি শুয়ে পড়ুন। অনিয়ম করলে হয়তো আবার শরীর খারাপ হবে।

সাণ্ডেল ॥ না হে না। কিচ্ছু হবে না আমার।···তাছাড়া শুলেই বা কি হবে? হয়তো সারারাত ঘুমই আসবে না।

সন্দীপ ॥ কেন, ঘুম হবে না কেন? রাত তো কম হয়নি?

সাণ্ডেল ॥ তা নয়। সন্ধ্যের পরই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে! আটটা বাজতে না বাজতেই শুয়ে পড়ি। কিন্তু এক একদিন মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যায়। সারারাত আর ঘুমই আসে না।

সীমা ॥ সে কি! সারারাত তুমি না ঘুমিয়ে থাকো!

সন্দীপ ॥ কেন এমন হয় বলুন তো?

সাণ্ডেল ॥ কি জানি, ঠিক বুঝতে পারি না। আমি শুয়ে পড়লেই চয়ন ঘরের নীল আলোটা জ্বেলে দিয়ে চলে যায়। আমি চোখ বুজে শুয়ে থাকি। প্রথমে চোখের সামনে সব অন্ধকার হ'য়ে যায়। তারপর ক্রমশঃ ঘরখানা যেন নীল নীল কুয়াশায় ভ'রে যায়।···কারা যেন সব ছায়ার

মত ঘুরে বেড়ায়।···কিছুক্ষণ পর কার একটা মুখ ভেসে ওঠে···অস্পষ্ট। চুলের রাশ ছড়িয়ে থাকে···মনে হয় সে যেন কাঁদছে। অনেক দূর থেকে তার কান্নার রেশ ভেসে আসে।···বুকের ভেতর তখন কেমন ক'রতে থাকে। দম বন্ধ হ'য়ে আসে যেন। ধড়মড় ক'রে উঠে বসি। তারপর আর কিছুতেই ঘুম আসে না। (অভিভূতের মত বলে যান। এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলে হাঁপাতে থাকেন। সীমা বাবার গায়ে হাত বোলাতে থাকে।)

সীমা॥ এ সব কথাতো আগে কখনো বলো নি বাবা !

সাণ্ডেল॥ রোজ তো হয় না···মাঝে মাঝে এমনি হয়। আবার দু'একদিনের মধ্যে সেরে যায়। তখন আর কিছু মনে থাকে না।

সীমা॥ মামাবাবু, চয়নদা··· এরা সবাই জানে একথা !

সাণ্ডেল॥ জানে বৈ কি ! ওরা বলে আমি নাকি স্বপ্ন দেখি ! আমিও ভাবি...হয়তো সত্যিই তাই। মাঝে মাঝে ডাক্তার এসে কি একটা ইঞ্জেকসান দেয়। তারপর অনেকদিন আর কিছু হয় না।

সীমা॥ না, না বাবা। এসব খাপছাড়া চিকিৎসায় কোন ফল হবে না। এবার তোমাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো। সেখানে বড় ডাক্তার দেখাবো। আর আমার কাছে থাকলে ভালো সেবা যত্নও হবে।

সন্দীপ॥ সীমা ঠিকই বলেছে। রোগ যেমনই হোক, তাকে উপেক্ষা করা কোন কাজের কথা নয়।

সীমা॥ কি বলো বাবা ? যাবে তো ?

সাণ্ডেল॥ কোথায় !

সীমা॥ ক'লকাতায় ?

সাণ্ডেল॥ ক'লকাতায় ! কেন ?···না, না আমি এখানে বেশ আছি।

সন্দীপ॥ কিন্তু সেখানে গেলে আরও ভালো থাকতে পারবেন।···কিছুদিন থেকে ভালো না লাগে, না হয় আবার চলে আসবেন।

সীমা ॥ হ্যাঁ বাবা। এবার তোমাকে আমার সঙ্গে ক'লকাতায় যেতেই হবে।

সাণ্ডেল ॥ না, না। আমি ক'লকাতায় যাবো না। সেখানে যা ভীড় আর গোলমাল। তিনদিন থাকতে হ'লেই আমি পাগল হ'য়ে যাবো।

সীমা ॥ ও, ক'লকাতায় যারা থাকে তারা বুঝি সবাই পাগল!

সাণ্ডেল ॥ পাগলই তো! নইলে ঐ ভীড় আর গোলমালের মধ্যে থাকে কি ক'রে! ডাক্তার ঠিক কথাই বলে—

সীমা ॥ আচ্ছা তুমি কি বাবা! মামাবাবু যে ঐ সব আজে বাজে কথা ব'লে তোমাকে এখানে আটকে রাখতে চান—তা বুঝতে পারো না?

সাণ্ডেল ॥ দূর বোকা মেয়ে, কি যে বলিস পাগলের মত!

সীমা ॥ (উত্তেজিত) পাগলের মত নয় বাবা, আমি ঠিক কথাই ব'লছি। মামাবাবু চান না—তুমি সেরে ওঠো। তিনি চান না, আমি তোমার কাছে কাছে থাকি। তিনি চান···

সাণ্ডেল ॥ আঃ চুপ করো···চুপ করো।

সীমা ॥ তুমি কি বাবা! চিরটাকাল এমনি চুপ ক'রে থেকে থেকেই তো নিজের এতবড় সর্বনাশ ঘটিয়েছো! এখনও বুঝতে শিখলে না!

সাণ্ডেল ॥ উঃ। (দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন।)

সন্দীপ ॥ চুপ করো সীমা। দেখছো না উনি—

সীমা ॥ চুপ করবো! কেন? কার ভয়ে? চুপ ক'রে থেকে থেকে অনেক ঠকেছি। আমি আর ঠকতে রাজী নই। বলো, বলো বাবা তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সাণ্ডেল ॥ (হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন) না, না।

সীমা ॥ বাবা! (চয়ন ছুটে এলো)।

চয়ন ॥ কি হ'লো মেসোমশাই!

সাণ্ডেল ॥ আঃ, কোথায় থাকিস চয়ন !·· ডেকে ডেকে সাড়াই পাওয়া যায় না। আমার কাছে একটু বোস। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে··· বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।

চয়ন ॥ তাহ'লে চলুন শুয়ে পড়বেন। ঘুমোলেই সব সেরে যাবে। নিন, উঠুন।

সাণ্ডেল ॥ উঠবো কি ক'রে! দেখছিস না ঘরখানা কেমন দুলছে!...হ্যাঁরে আবার ভূমিকম্প শুরু হ'লো নাকি!···আমার হাতটা ধর···হাতটা ধর।

[বাইরে থেকে ডাক্তার এলেন]

ডাক্তার ॥ কি ব্যাপার চয়ন!

চয়ন ॥ আবার সেই রকম শুরু ক'রেছেন। এদের সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ—

সাণ্ডেল ॥ না, না। আমি এদের কিছু বলিনি ডাক্তার। কাউকে কিছু বলিনি—

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গে। অনেক রাত হ'লো। যাও—

চয়ন ॥ আসুন—

সীমা ॥ চলো—আমিও যাচ্ছি।

সাণ্ডেল ॥ কে! (সীমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন)

ডাক্তার ॥ কি হলো? কি দেখছো অমন ক'রে?

সাণ্ডেল ॥ কি আশ্চর্য্য মিল দেখেছো ডাক্তার! সেই মুখ, সেই চোখ—ঠিক সেই মত—শ্যামলী, শ্যামলী! (উন্মত্ত আবেগে সীমার কাঁধ চেপে ধরলেন)

সীমা ॥ (আতংকে) বাবা!

ডাক্তার ॥ কি করছো সাণ্ডেল ! ও তো সীমা ! (ডাক্তার তাঁকে সরিয়ে নিলেন ।)

সাণ্ডেল ॥ সীমা ! হ্যাঁ সীমা…ওঃ কি ভুল দেখেছো ! থেকে থেকে এমন সব গোলমাল হয়ে যায়…

চয়ন ॥ চলুন, শোবেন চলুন ।

সাণ্ডেল ॥ জানিস চয়ন, আমি যেন একটা মস্ত জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি । কত চেষ্টা করি সেটা কেটে বেরিয়ে আসতে কিন্তু কিছুতেই পারি না… কিছুতেই পারি না । (সাণ্ডেলকে নিয়ে চয়ন চ'লে গেল)

[সবাই স্তব্ধ । একটু পরে ডাক্তার নীরবতা ভাঙলেন]

ডাক্তার ॥ (আবহাওয়াটা লঘু করতে চেষ্টা ক'রলেন) সাণ্ডেল থেকে থেকে এমন ছেলেমানুষী করে !…যাক, সীমু তোরা কতক্ষণ এলি রে ?

সীমা ॥ বাবার কি হ'য়েছে মামাবাবু ?

ডাক্তার ॥ নতুন কিছু নয় । মাঝে মাঝে এমনি এক একটা অদ্ভুত ঝোঁক চাপে ওর । তবে ভাবনার কিছু নেই । রাতটুকু ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে । আয়, আমরা বসি ।

সীমা ॥ আপনি লুকোতে চাইলে কি হবে ? আমি সব জানতে পেরেছি ।

ডাক্তার ॥ (সচকিত) জানতে পেরেছো ! তার মানে ? কি জানতে পেরেছো !

সীমা ॥ মায়ের শোক বাবা আজও ভুলতে পারেন নি । তিনি চান একটু শান্তি, একটু সান্ত্বনা । বাবা আমাকে কাছে কাছে পেতে চান । কিন্তু আপনার ভয়ে কিছু ব'লতে পারেন না । শোকে দুঃখে ভাবনায় ভয়ে বাবা দিন দিন পাগলের মত হয়ে যাচ্ছেন

ডাক্তার ॥ দূর ! কি যা তা বলিস !

সীমা॥ যা তা নয়। আমি ঠিকই বলছি। অনেকদিন আগেই সব বুঝতে পেরেছিলাম। এবার আমি মনস্থির ক'রে এসেছি। বাবাকে আমাব সঙ্গে নিয়ে যাবো। (ডাক্তার চিন্তিত)

সন্দীপ॥ সীমা চুপ করো। এ বিষয়ে পরে কথা বললেও চলবে।

[চয়ন ঘরে ঢুকলো। হাতে সিরিঞ্জ।]

সীমা॥ পরে নয়, আমি এখনই একটা মীমাংসা ক'রতে চাই।

ডাক্তার॥ ওঁকে ক'লকাতায় নিয়ে গেলে তোমার লেখাপড়ার কি হবে ?

সীমা॥ কি হবে লেখাপড়া শিখে, আমাব সব থেকে আপনজন যিনি, তাঁকেই যদি সুখী করতে না পারি ?

ডাক্তার॥ কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিলে আমরা কত দুঃখ পাবো তা তুমি জানো ? আমাদের দুঃখ দিতে তোমার বাধবে না ?

সীমা॥ (নরম হ'য়ে গেল) আপনাদের দুঃখ দেওয়ার কথা আমিও ভাবতে পারি না মামাবাবু। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এভাবে সব ছেড়ে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

চয়ন॥ তুমি কেবল স্বার্থপরের মত নিজের কথাটাই ভাবছো সীমা।

সীমা॥ (আবার রেগে গেল) স্বার্থপরের মত !···হ্যাঁ তাই। কেন আমি স্বার্থপর হবো না ব'লতে পারো ? সেই এতটুকু বয়েস থেকে আমাকে সবাই দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। নিজের কথা ছাড়া, আমাকে অন্য কারো কথা ভাববার সুযোগ দিয়েছেন কেউ ?

ডাক্তার॥ সে তোর ভালোর জন্যেই করেছি মা।

সীমা॥ তাতে যে আমার ভালোর চেয়ে মন্দই হ'য়েছে বেশী সে খবর কি কেউ রাখেন আপনারা ? এখনও যদি স্বার্থপরের মত নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রতে না পারি, তাহ'লে মরণ ছাড়া আমার আর কোনও গতি থাকবে না। (স্বর ভারী হ'লো কান্নায়)

চয়ন ॥ আরেঃ, এ তুমি কি ছেলেমানুষী শুরু করলে সীমা!

সীমা ॥ ছেলেমানুষী নয় চয়নদা। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে যে কি দুর্ভাবনার মধ্যে কাটাতে হয় তা যদি জানতে!

[সীমা কেঁদে ফেললো। ভেতর থেকে সাণ্ডেলের আর্ত্তনাদ শোনা গেল⋯ঐ শোন চয়ন⋯সেই কান্না⋯ আঃ চয়ন, ওকে চুপ ক'রতে বল⋯চুপ ক'রতে বল।]

চয়ন ॥ ঐ বুঝি উনি আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। যাই দেখি—

সীমা ॥ চলো, আমিও যাবো।

চয়ন ॥ না, না। তোমাকে দেখলে হয়তো আবার—

সীমা ॥ আমি যাবোই। (সীমা ভেতরে গেল)

ডাক্তার ॥ যাও চয়ন, দেখো ও যেন বেশী বিরক্ত না করে।

চয়ন ॥ ইঞ্জেকসানটা তৈরী ক'রে রাখি?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ।

[চয়ন চলে গেল। সন্দীপ অবাক। ডাক্তার একটু চুপচাপ রইলেন।]

—যাক, এসো সন্দীপ। বসো। আরেঃ কি ভাবছো অত! তুমিও বুঝি সীমার মত—

সন্দীপ ॥ কিছু মনে করবেন না মামাবাবু। আমারও মনে হ'চ্ছে, আপনি যেন ইচ্ছে ক'রেই একটা কোনও কথা আমাদের কাছে গোপন রাখতে চাইছেন।

ডাক্তার ॥ (একটু চুপ থেকে) তোমার অনুমান সত্যি সন্দীপ। সীমার মা মারা যাবার পর থেকেই একটা অতি নির্ম্মম সত্যকে আমি সবায়ের কাছ থেকে গোপন ক'রে এসেছি। ভেবেছিলাম আরও কিছুদিন পর

সীমাকে বলবো সব। কিন্তু,...এখন মনে হ'চ্ছে সব কথা তোমারই জানা দরকার।

সন্দীপ॥ বেশতো বলুন।

ডাক্তার॥ (আরও একটু ভেবে) আমি জানি সন্দীপ, তোমার বাবা মা সীমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমাদেরও তোমাকে খুবই ভালো লাগে। সবথেকে বড় কথা, তুমি আর সীমা পরস্পরকে চাও। না, না—এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমি ব'লছি না তোমরা কোনও অন্যায় করেছো। তবুও সন্দীপ, তোমাদের দূরে দূরেই থাকতে হবে।

সন্দীপ॥ কিন্তু মামাবাবু,—

ডাক্তার॥ হ্যাঁ সন্দীপ, আমি জানি এ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া তোমার পক্ষে ক'ত শক্ত। এ ব্যবস্থা মেনে নিতে বলা আমার পক্ষেও কম কষ্টের নয়। তবুও, তোমার নিজের ভালোর জন্যে, সীমার মঙ্গলের জন্য এ ব্যবস্থা তোমাকে মেনে নিতেই হবে।

সন্দীপ॥ উপায় থাকলে আমি হয়তো আপনার কথা মেনে নিতে পারতাম—কিন্তু আর তা সম্ভব নয়।

ডাক্তার॥ সম্ভব নয়! কেন?

সন্দীপ॥ আমাদের...বিয়ে হ'য়ে গেছে।

ডাক্তার॥ বিয়ে হ'য়ে গেছে! কি বলছো তুমি!

সন্দীপ॥ হ্যাঁ মামাবাবু। তিনমাস আগে...রেজিস্ট্রি ক'রে।

ডাক্তার॥ তিনমাস আগে! রেজিস্ট্রি ক'রে।...তোমার মা বাবা সব জানতেন?

সন্দীপ॥ তাঁরা সম্প্রতি জেনেছেন। প্রথমে তাঁদেরও একটু আপত্তি ছিল। এখন এ বিয়ে মেনে নিতে তাঁদের আপত্তি নেই। বাবা এই চিঠিটা দিয়েছেন। পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। (মাণিব্যাগ থেকে চিঠি বার ক'রে দিল।)

ডাক্তার ॥ (চিঠি পড়ে প্রচণ্ড বিস্ময়ে) সন্দীপ! (একটু চুপ) আঃ…এ তোমরা কি ক'রলে সন্দীপ। ঝোঁকের মাথায় একি ভুল তোমরা ক'রলে।

সন্দীপ ॥ আপনাকে না জানিয়ে এভাবে বিয়ে করা আমাদের সত্যিই অন্যায় হ'য়েছে। কিন্তু সব কথা শুনলে—

ডাক্তার ॥ (দারুণ হতাশায়) আমার এতদিনের এত সতর্কতা যে এমনিভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে…তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওঃ কি নির্মম এই নিয়তির পরিহাস। (দুঃখে ভাবনায় ব্যাকুল হ'লেন)

সন্দীপ ॥ (একটু চুপ থেকে) আপনি মিথ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মন খারাপ ক'রছেন মামাবাবু। আমরা যদি সত্যপথে থাকি, তবে কোনও কিছুই আমাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে পারবে না।

ডাক্তার ॥ নাঃ, আমি আর ভাবতেও পারছি না। (একটু পায়চারি ক'রলেন। তারপর হঠাৎ যেন খানিক আশ্বাস খুঁজে পেলেন) সন্দীপ, জীবনে যা সত্য ব'লে জেনেছো পারবে তাকে চিরকাল মেনে চলতে?

সন্দীপ ॥ হ্যাঁ, পারবো।

ডাক্তার ॥ কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হবে না? পরস্পরের ওপর বিশ্বাস হারাবে না?

সন্দীপ ॥ না।

ডাক্তার ॥ তবে কথা দাও, ধর্ম সাক্ষী ক'রে জীবনে যাকে গ্রহন করেছো কোনও অবস্থাতেই তাকে ত্যাগ করবে না!

সন্দীপ ॥ সীমাকে ত্যাগ করবো! কেন? কি দোষ করেছে ও?

ডাক্তার ॥ না, না। ও কোনও দোষ করেনি। সব দোষ, সব অপরাধ আমার। অনেক আগেই তোমাকে সব কথা বলা উচিত ছিল।

সন্দীপ ॥ বেশ তো এখন বলুন।

ডাক্তার॥ হ্যাঁ বলবো। তোমাকেই শুনতে হবে সব। যে দারুণ অভিশাপ সীমার জীবনে জড়িয়ে আছে, নিজের অজ্ঞাস্তে আজ তুমিও সেই অভিশাপের জালে জড়িয়ে পড়েছো।

সন্দীপ॥ অভিশাপের জালে জড়িয়ে পড়েছি! (ভয় গেল)

ডাক্তার॥ সাণ্ডেলের অসুখটা কি তা তুমি অনুমান ক'রতে পারো?

সন্দীপ॥ সবাই তো বলে উনি একধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন। খুব বড় একটা শোক বা আঘাত পেলে যেমন হয়।

ডাক্তার॥ হ্যাঁ সবাই তাই জানে। আমিই সকলকে বলেছি সীমার মা'র হঠাৎ মৃত্যুর শোক ওকে অমনি উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে।

সন্দীপ॥ তবে কি ও কথা সত্যি নয়!

ডাক্তার॥ না সন্দীপ, সত্যি নয়। ওর সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে দেবার আগে আমরাও জানতাম না যে, ও পাগল। বংশগত পাগলামির বিষ ওর রক্তে।

সন্দীপ॥ সীমার বাবা পাগল! বংশগত পাগলামির বিষ ওঁর রক্তে!! এ আপনি কি ব'লছেন!

ডাক্তার॥ (পূর্ব্বের সূত্র ধ'রে বলে চললেন) সব টের পেলাম—সীমার জন্মের তিন মাস পর।…এক বর্ষার রাতে…ও যখন পাগলামির ঝোঁকে শ্যামলীকে গলা টিপে মারলো…

সন্দীপ॥ (আতংকিত) সীমার বাবা খুনী!…পাগল!…বংশগত পাগলামির বিষ ওঁর রক্তে!…আর আপনি সব জেনে শুনেও এতদিন চুপ করে বসেছিলেন!…ইস, কি করি…এখন আমি কি করি!

[কেউ লক্ষ্য করেনি, সীমা ইতোমধ্যে কখন দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ দারুণ দুঃসংবাদ যেন তাকে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে! মনে মনে আশা ছিল

সন্দীপ হয়ত তাকে আশ্বাস দেবে। কিন্তু সন্দীপের আক্ষেপ শুনে সে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হলো।)

সীমা ॥ কি আবার ক'রবে ! বুদ্ধিমানের মত স'রে পড়ো।

ডাক্তার ॥ সীমু !

[সন্দীপ অবাক্ হ'য়ে চেয়েছিল সীমার দিকে। যেন নতুন দেখছে তাকে।]

সীমা ॥ কি, দেখছো কি অমন ক'রে ? চিনতে পারছো না তো আমাকে !··· চেনবার চেষ্টাও করো না। শুনলে না, আমার বাবা খুনী।···বংশগত পাগলামির বিষ আমার রক্তে !···যাও, যাও···পালাও···পালিয়ে যাও।

সন্দীপ ॥ তুমি আমাকে ভুল বুঝছো সীমা। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

সীমা ॥ থাক্। কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে আমার মন ভোলানোর দরকার নেই। তোমাদের সবাইকে আমি চিনে নিয়েছি। এবার দয়া করে আমাকে রেহাই দাও।

সন্দীপ ॥ তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও সীমা !

সীমা ॥ বাঃরে, আমি তাড়াবো কেন ! তুমিই তো কি করবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিলে।

ডাক্তার ॥ সীমু চুপ কর মা। শান্ত হ'। শুধু শুধু মাথা গরম ক'রে—

সীমা ॥ মাথা গরম ! আপনি কি ভেবেছেন আপনার ঐ আষাঢ়ে গল্প শুনে আমার মাথা গরম হ'য়ে গেছে ! মোটেই না। আপনার কথার একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।

ডাক্তার ॥ আমিও তো ব'লছি, বিশ্বাস করতে হবে না। তুই শান্ত হ'। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন—

সীমা॥ থাক। আপনার উপদেশ দেবার আর দরকার নেই। আপনার কথা শুনে শুনে বাবার জীবন নষ্ট হ'য়েছে, এবার আমার জীবনটাও নষ্ট করতে চান ?

সন্দীপ॥ আঃ সীমা—কি যা-তা ব'লছো পাগলের মত !

সীমা॥ মত কেন ? বলো না, আমিও পাগল হ'য়ে গেছি। তাহ'লেই তো তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

সন্দীপ॥ তুমি যদি চুপ না করো সীমা, তা'হলে আমি সত্যিই চলে যাবো।

সীমা॥ ভয় দেখাচ্ছো ! যাও না, যাও। কে তোমাকে থাকবার জন্যে পায়ে ধ'রে সেধেছে !

সন্দীপ॥ সীমা !

সীমা॥ যাও, বেরিয়ে যাও বলছি। বেরিয়ে যাও।

ডাক্তার॥ সীমু ছিঃ মা—(সীমাকে কাছে টেনে নিতে গেলেন। সীমা ছিটকে বেরিয়ে গেল।)

সীমা॥ খবরদার, আপনি আমাকে ছোঁবেন না। আপনারা সবাই আমার শত্রু। যাও যাও, তোমরা সবাই দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। যাও।

[চয়ন দ্রুত এলো]

চয়ন॥ কি হলো সীমা ! হঠাৎ এমন চীৎকার করছো কেন ?

সীমা॥ (উদ্‌ভ্রান্তের মত) শুনেছো চয়নদা···বাবা নাকি মা'কে গলা টিপে মেরে ফেলেছে ! (কাঁদতে গিয়ে হঠাৎ হাসিতে গড়িয়ে পড়লো।)··· এমন মজার কথা শুনেছো কখনও।···বাবা নাকি পাগল !

চয়ন॥ (ঠাট্টা ক'রে) মেসোমশাই পাগল হ'ন না হ'ন, তুমি যে একটি বদ্ধ পাগল সে বিষয়ে আর আমার কোন সন্দেহ নেই।

সীমা॥ (হঠাৎ হাসি থামিয়ে) চয়নদা !···তুমি !···তুমিও বলছো আমি পাগল হ'য়ে গেছি ! তুমিও ওদের দলে !

ন্র ॥ (ভয় পেল') সীমা···কি যাতা বলছো ! চুপ করো।

মা ॥ (শূন্য আরাম কেদারার কাছে এসে)···শুনেছো বাবা চয়নদাও বলছে···তুমি পাগল ! আমিও নাকি পাগল্ হয়ে গেছি !

[হাসতে থাকে]

য়ন ॥ সীমা !

ীমা ॥ ইস্—চুপ। বাবার ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে।···কি হ'লো বাবা ?···খুব কষ্ট হ'চ্ছে বুঝি ! আচ্ছা, তুমি ঘুমোতে চেষ্টা করো···আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।···এই আমি তোমার কাছে বসলাম। কেউ আর আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না।···জানো বাবা, কতদিন পরে তোমার কাছে ব'সেছি···তোমার সঙ্গে কথা বলছি··· আমার কী ভালোই যে লাগছে। আঃ···আঃ...

[ব'লতে ব'লতে ইজি চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে শুলো। যেন সত্যিই সে তার বাবার কাছে অনেক দিন পরে ব'সতে পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। চয়ন, সন্দীপ, ডাক্তার বেদনাহত বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। দূর থেকে বিয়ে বাড়ীর শানাই ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এলো।]

———

চরিত্র

মাধব — ফটিক
যাদব — বামছবি
বিনয় — হৃদয়
কানাই — নরেন
বংশী — মালতী
নিতাই

জীবনকথা

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

[মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র বাড়তি ঘর। দৃশ্যত এটা পড়ার ঘর। সময় বিশেষে এটাই বৈঠকখানা। কখনো বা শোবার ঘর। একপাশে একটা টেবিল। তার দুই পাশে কয়েকটি চেয়ার। টেবিলে গোছানো এবং না-গোছানো অবস্থায় রয়েছে বই-খাতা ইত্যাদি। এক কোণ ঘেঁষে বিছানা সমেত একটি খাট। ঘরটার দরজা দুটো। একটা বাইরে থেকে ভেতরে আসার। আর একটা ঐ ঘর থেকে ভেতর বাড়ীতে যাবার জন্য।

[পর্দা ওঠার পর মঞ্চ প্রথমে ফাঁকাই থাকবে। তারপর প্রবেশ করবেন মাধববাবু।]

মাধব ॥ কানাই। এই কানাই। —বিনে! (কোন সাড়া নেই। আর একটু জোরে) কানাই। —বিনে! আঃ—হতচ্ছাড়া বাঁদর দুটো আবার গেল কোথায়?···বিনে—এই বিনে!······

[ভেতরবাড়ী থেকে যাদবের প্রবেশ।]

যাদব ॥ নেই। কানাই বা বিনে কেউই বাড়ী নেই।

মাধব ॥ নেই—সে তো বুঝতেই পারছি। তা—বাঁদর দুটো গেল কোথায়?

যাদব ॥ তা আমি কি করে জানবো। তুই মামা-ভাগ্নে মিলে কোথায় যায় না-যায় সে কি আমার জানার কথা!

মাধব ॥ তা বাড়ীর খোঁজ খবর তো একটু রাখবি। —ওদিকে পাড়ার রকে বকাটে ছোঁড়াগুলো কি সব মতলব আঁটছে। আসতে আসতে কানাই-বিনের নামটা কানে এলো।

যাদব ॥ দেখো কোথায় আবার কি বাধিয়েছে।

মাধব ॥ তা—সেগুলোও কি আমাকেই দেখতে হবে? সংসারের সব দায় কি আমার একার? তোরা বড় হয়েছিস। তুইও তো ওদের দেখবি।

যাদব ॥ দেখার কিছু নেই। ও সবাই লায়েক হয়ে গেছে। গোঁফ বেরোতে না বেবোতেই ওদেব পাখা গজিয়েছে।

মাধব ॥ তা—শাসন করবি তো। ওরা না হয় অবুঝ। —তাই বলে আমাদের তো আর অবুঝ হলে চলে না।

যাদব ॥ সে কথা বৌদিকে বোঝাও গিয়ে।

মাধব ॥ তোর বৌদি আবাব কি করলো?

যাদব ॥ ঐ বৌদির মন্ত্রণাতেই তো দুটো বিগড়োচ্ছে। তোমার আর কি? হতচ্ছাড়াদুটো মাসে দুবার মাথা ফাটিয়ে আসবে—আর পাড়ার লোক এসে কথা শোনাবে আমাকে। আর বৌদিকে বলতে গেলে বলবে —"বেশ করেছে।"

মাধব ॥ যাকৃগে—ওসব কথা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। —যা—বাঁদর দুটোকে ধরে নিয়ে আয়। তিলে-নিমুদের মতলব আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না।

যাদব ॥ কোত্থেকে আনবো ওদের?

মাধব ॥ যা—না। একটু খুঁজে দেখ। কাছে পিঠেই কোথাও আছে। শেষমেষ একটা কিছু যদি বাধিয়ে বসে তাহলে আবার মুস্কিলে পড়বো।

ওসব গুণ্ডা প্রকৃতির ছোকরাদের ঘাঁটানো মহাপাপ। কানাই আর বিনেটার তো ওসব বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। হতচ্ছাড়াদের বার বার বলি—একটু শান্ত হয়ে চল। একটু বুঝে সুঝে চল।

যাদব ॥ কষে বেত লাগাতে পারো না? ওসব ভাল কথায় ওরা বুঝবে নাকি! (ভেতর বাড়ী থেকে মালতীর প্রবেশ।) বেশ ঘা কতক পিঠে পড়লে তবে ওদের চৈতন্য হবে।

মালতী ॥ (ঘরের কাজ করতে করতে) কার কথা হচ্ছে?

যাদব ॥ কার আবার—তোমার আদরের ছোট ঠাকুর-পো আর ভাগ্নের কথা হচ্ছে।

মালতী ॥ সে তো গর্জন শুনেই বুঝতে পারছি। তোমাদের দাদা ভায়ের যত বীরত্ব ঐ দুটো বাচ্চার ওপর।

মাধব ॥ দেখো—যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এসোনা।

মালতী ॥ তোমাদের বোঝার মধ্যে তো ছেলে দুটোকে খামাখা ধরে ধরে ঠ্যাঙ্গানো। তা—এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে?

মাধব ॥ আমরা কি সাধ করে ঠেঙ্গাই! না—ঠ্যাঙ্গাতে আমাদের খুব ভাল লাগে?

মালতী ॥ (কাছে এসে দৃঢ় স্বরে) কেন ঠ্যাঙ্গাও?

মাধব ॥ (ঈষৎ উষ্ণ) শাসন করার জন্যে।

মালতী ॥ কেন? কি অন্যায় ওরা করেছে?

যাদব ॥ নাও—এবার সামলাও। এখন সওয়াল জবাব করো।

মাধব ॥ তুই যা না। বাঁদর দুটোকে ধরে নিয়ে আয়।

যাদব ॥ কি হবে ধরে এনে। বৌদির মত উকিল থাকতে···

মালতী ॥ নিজেরা তো হয়েছে কোলকুঁজো আর ঘরকুনো। দুটো তাজা ছেলের ডানপিটেপনা সহ্য করতে পারো না। ওরা তো তোমাদের

কোন ক্ষতি করেনি। কারো কোন ক্ষতি করেনি। আমি বুঝিনা ওদের ওপর তোমাদের এত রাগ কেন ?

মাধব ॥ রকের ছোঁড়াগুলো ওদের ঠ্যাঙাবার মতলব করছে কেন ?

মালতী ॥ যদি সাহস থাকে—সেটা রকের ছোঁড়াগুলোকে গিয়ে জিগ্যেস করো।

যাদব ॥ যাও—এবার ওদের হয়ে ঐ হারামজাদাগুলোর সঙ্গে ঝগড়া করো। আর কি—বুড়ো বয়সে এবার মারামারি করতে নামো।

মালতী ॥ সে মুরোদ তোমাদের নেই। তোমরা ঘরে বসে গজরাতে পারবে। কোনদিন সামনা সামনি লড়তে পারবে না।

মাধব ॥ তা—খামাখা লড়তেই বা যাবো কেন ?

মালতী ॥ তা খামাখা কানাই-বিনেকে মারতেই বা যাবে কেন ?

যাদব ॥ দোষ করলে হাজার বার মারবো। আজ আসুক না—চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেবো।

মালতী ॥ ঐটাই পারবে ॥ (প্রস্থানোদ্যত)

মাধব ॥ কানাই-বিনে কোথায় গেছে ?

মালতী ॥ সন্ধ্যাকে পৌঁছে দিতে গেছে।

মাধব ॥ কেন ? সন্ধ্যাকে পৌঁছে দেবার জন্য ওরা গেছে কেন ?

যাদব ॥ দুজন বডিগার্ড না হলে রাজনন্দিনীর সম্মান থাকে না !

মালতী ॥ (দৃপ্তভাবে) না—থাকে না। যে পাড়ায় বাস করো সে পাড়ায় সন্ধ্যার বয়েসী মেয়েরা মান নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না।

মাধব ॥ তা—তা—ওদের পাঠালে কেন ?

মালতী ॥ ওদের পাঠাবো না তো কাকে পাঠাবো ?

মাধব ॥ যাদব তো ছিলো।

মালতী ॥ না। ছিলো না।—ঠিক সময় মত সরে পড়েছিলো।

যাদব ॥ দেখো বৌদি ।...

মালতী ॥ থাক। এর মধ্যে দেখার কিছু নেই। তোমার দৌড় আমার জানা আছে। একটা মাতালের ধমকে তুমি দৌড়ে পালাও ।...

যাদব ॥ না—সেখানে দাঁড়িয়ে মাতালের সঙ্গে ঝগড়া করবো।

মালতী ॥ হ্যাঁ। হ্যাঁ—করবে।......তোমাদের লজ্জা করে না! পাড়ায় এতগুলো পুরুষ মানুষ থাকতেও এ পাড়ায় একটা মেয়ে নিরাপদে হাঁটতে পারে না। রাত্রি বেলায় কোন অচেনা লোক পার হয়ে যেতে পারে না। খিস্তি-খেউড়—ঘড়ি কেড়ে নেওয়া—টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া।—ছি-ছি-ছি—! তোমরা আবার ঐ ডাকাবুকো ছেলে ছুটোকে শাসন করতে যাও! আগে অন্যায়কে শাসন করো—তারপর ওদের গায়ে হাত তুলবে। আগে নিজেদের বিচার করো...

মাধব ॥ বড় বড় কথা বোলো না। ওদের শাসন করার ভার আমাদের নয়। দেশে পুলিশ আছে। কোর্ট আছে।

মালতী ॥ শুধু মানুষ নেই। [প্রস্থান]

যাদব ॥ দেখলে তো। এই বৌদির আস্কারাতেই—আর কথার কি ছিরি! আমরা যেন মানুষই নই।

মাধব ॥ নাঃ—পাড়াটাও বদ হয়ে উঠেছে। যদুবাবুর ছেলেটা তো একেবারে বকে গেছে।

যাদব ॥ সে তো আমাদের দেখবার দরকার নেই।...

[হঠাৎ বাইরে প্রচণ্ড গোলমাল। ছুটোছুটি মারামারির শব্দ ভেসে আসে।]

: মার। মার শালাকে।

: লাগা। লাগা। একেবারে হড়কে দে।

: আই বাপ! শালা দারুন জমিয়েছে মাইরী।

: তলে—এই শালা তিলে। দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?

: এই কি হচ্ছে! পাড়ার মধ্যে এসব কি হচ্ছে?

: চুপ বে। রোয়াব লেবে তো—খাল খিঁচে লেবো।

: টেনে নিয়ে চ’। মদনের ঘরে লিয়ে বেশ কচুয়া দিয়ে দে।

: আবে—আধলা জমিয়েছে।

: এ্যাই—এ্যাই। খবরদার।

: পালা—পালা।

: টেনে নিয়ে চ’।

: ছাড়িস নি।

: ভাগলো—এক শালা ভাগলো।

: এ শালাকে ছাড়িস নি। টেনে লিয়ে চ’।

: আই বাপ! শালা এখনো লড়ছে।

: সাবাস বাচ্চু। আরো দুই ঠুস্‌সা ভুগিয়ে দে।

[গোলমাল ক্রমশঃ কমে আসে, রেশ তখনো চলে। হাঁপাতে হাঁপাতে বিনয়ের প্রবেশ।]

বিনয়॥ বড় মামা! ওরা—ওরা কানাই মামাকে ধরে মারছে, কানাই মামাকে···

মাধব॥ বেশ করছে। বে—শ করছে।

বিনয়॥ (নিরুপায়ভাবে) মেজো মামা!

যাদব॥ কি? কি? কেন?—মেজোমামাকে কেন? মারামারি করার সময় মেজোমামার পরামর্শ নিয়েছিলি? কে বলেছে তোদের মারামারি করতে?

বিনয়॥ বারে! সন্ধ্যাদিকে ওরা যা-তা বললো···

[মালতীর প্রবেশ।]

যাদব ॥ আর কি ? তোদের গায়ে একেবারে ফোস্কা পড়ে গেল !

মালতী ॥ (চাপা আক্রোশে) ঠাকুর-পো !

যাদব ॥ ধমকাবে না। অত ধমকাবে না। তোমার আস্কারাতেই···

মালতী ॥ থাক। থাক। তোমাদেব ঐ পৌরুষ আর বীরত্ব শিকেয় তু রেখে দাও।

বিনয় ॥ কানাই মামাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল মামী।

মালতী ॥ সেকি ?—চল, আমি যাবো।

মাধব ॥ খবরদার। বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।

মালতী ॥ হয় তোমরা যাও—না হয় আমাকে যেতে দাও।

মাধব ॥ যাদব—পাড়ার লোকদেব ডাকতো···

মালতী ॥ চমৎকার !—এ পাড়ায় কি মানুষ আছে নাকি ? সবাই তোমাদে মত বীবপুরুষ !

যাদব ॥ বৌদি !···

মাধব ॥ (বিনয় পায়ে পায়ে বেবিয়ে যাচ্ছে দেখে) এ্যাই ? এ্যাই—তু কোথায় যাচ্ছিস ?

বিনয় ॥ ছোট মামার কাছে।

মাধব ॥ (হুংকার) দেখ বিনে...

বিনয় ॥ তোমরা কি বড়মামা ! কানাই মামাতো কোন অন্যায় করেনি।—ওদিকে ওকে টেনে নিয়ে গেল আর তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে ?

[প্রস্থানোদ্যত]

মাধব ॥ বিনে !

বিনয় ॥ না—কানাই মামা মার খাবে—আর আমি এখানে চুপ করে দাঁড়ি থাকবো সে হবে না। আমি একাই যাবো।

মাধব ॥ তা হলে এ বাড়ীতে আর ঢুকতে হবে না।

বিনয় ॥ ঠিক আছে। ঢুকবো না। [প্রস্থান]

যাদব ॥ একেই বলে মাথা গরম।...

মালতী ॥ তোমাদের মাথা তো ঠাণ্ডা বরফ! ছি-ছি-ছি—! লোকে শুনলে গায়ে থুথু দেবে। ঐ বিনের যা সাহস—সেটুকুও তোমাদের নেই। তোমরা আবার বিচারের বড়াই করো!

মাধব ॥ (চিৎকার) তুমি থামবে?

মালতী ॥ কেন? থামবো কেন? কার ভয়ে থামবো? তোমাদের ভয়ে?

মাধব ॥ তুমি—তুমিই তো সব কিছুর মূলে। এখন বেমক্কা গোলমাল পাকিয়ে পাড়ায় বাস করা দায় হল। ওগুলো হল গুণ্ডা বদমাইস···

[বংশীবাবুর প্রবেশ]

বংশী ॥ কি ব্যাপার মাধববাবু? কানাই হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল!···

মাধব ॥ (মালতীকে) ভেতরে যাও।

মালতী ॥ (কর্ণপাত করে না) কানাইয়ের আত্মসম্মান জ্ঞানটা বেশী।

[প্রস্থান]

বংশী ॥ সে তো বটেই। সে তো বটেই। তা—মাধববাবু, ব্যাপারটা তেমন সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। মানে—এই মেয়েঘটিত ব্যাপারে···

যাদব ॥ এর ভেতরে "মেয়ে ঘটিত" এলো কোত্থেকে?

বংশী ॥ এসে গেছে বাবা—এসে গেছে। সেই যে এক জজ ছিলো না—যে কোন ফৌজদারী মামলায় জিগ্যেস করতো "হয়ার ইজ দ্যাট উওম্যান?" —সেই ব্যাপার আর কি!

মাধব ॥ না-না। ওসব কিছু নয়।

বংশী ॥ না বললে তো হবে না! আমি নিজের কানে সব শুনেছি। নিজের চোখে সব দেখেছি। বাবা! তুই ইয়ং গ্রুপে লড়াই? সঙ্গে

আবার গনগনে আগুন! তা—মশাই পুলিশে একটা ফোন করুন। আগে থেকে থানায় ডায়েরী করে রাখুন।

মাধব ॥ না—না। ওসব ঝামেলায় কাজ নেই। ও থানা-পুলিশ···মানে ওসব হুজ্জত পোষাবে না। তার চেয়ে—মানে—যাদব, তুই একবার যা···

যাদব ॥ যেতে হয় তুমি যাও। এসব উটকো ব্যাপারে আমি নেই।

বংশী ॥ নেই বললে তো হবে না বাবা! হাজার হোক তোমাদেরই ভাই। হাঙ্গামাতো তোমাদেরই পোয়াতে হবে। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তার ঠিক কি?

যাদব ॥ যতো দোষ তো ঐ বৌদির···

মাধব ॥ কানের কাছে "বৌদি-বৌদি" করবি না। কিছু পাবিস তো কর।—না পারিস সব দূর হয়ে যা। (বংশীকে) সংসারের সব ঝামেলা যেন আমার একার!

যাদব ॥ তা—তুমি যাও না। যাও—কানাই-বিনের সঙ্গে তুমি ওদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে এসো।

বংশী ॥ না—না বাবা। ওসব বলে না। ছি-ছি মারামারি! ওদের সব ছুরিছোরার কারবার। তার চেয়ে পুলিশে একটা···

[মালতীর প্রবেশ]

মাধব ॥ না—এপাড়াতে যখন বাস করতে হবে···

মালতী ॥ তখন ওদের পায়ে ধরেই বাস করতে হবে! (বাইরের দিকে প্রস্থানোদ্যত।)

মাধব ॥ তুমি আবার কোথায় যাচ্ছো?

মালতী ॥ থানায় ফোন করবো।···

মাধব ॥ নাঃ—আবার এক কেলেংকারী বাধাবে দেখছি।

মালতী ॥ তোমরা ঘরের কোণে বসে বসে কেলেংকারী সামলাও! এদিকে যা বাধাবার আমিই বাধাবো।

মাধব ॥ দেখো যা বোঝ না…

মালতী ॥ আর বুঝতেও চাই না। তোমাদের বোঝার ঠেলায় সংসারে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

মাধব ॥ (ক্ষেপে যায়) আর একটা সংসার খুঁজে নাও।

মালতী ॥ (চাপা দৃঢ় স্বরে) চুপ করো।…

মাধব ॥ কেন? কি? কি ভেবেছো তোমরা?—তোমার অনেক বাড় আমি সহ্য করেছি।

বংশী ॥ না—না—মাধববাবু। এটা আপনার ঠিক উচিত হচ্ছে না। হাজার হোক বৌমা ঠিকই বলেছেন।…

মাধব ॥ নিকুচি করেছে ঠিকের। আরে মশাই দুনিয়াটা কি ঠিকের ওপর চলছে নাকি? ওসব ঠিক-বেঠিক ছাড়ান দিন। আজকের দিনে মাথাটা বাঁচিয়ে চলতে হবে তো।

বংশী ॥ তা—সে কথাও ঠিক। মাথা বলে কথা! সেটা তো বাঁচাতেই হবে।

যাদব ॥ ঐ থার্ডক্লাস লোফারগুলোর সঙ্গে মারামারি করার কোন মানেই হয় না।

মালতী ॥ ঘরে বসে বসে মাথা আর পিঠ বাঁচানোর খুব মানে হয়!…

যাদব ॥ বড় বড় কথা বলবে না বৌদি। ওসব কথা ঢের শুনেছি।

মালতী ॥ শুনেছো—কিন্তু বোঝনি।

বংশী ॥ ব্যাপারটা শুধু বোঝার নয় বৌমা—ব্যাপারটা ভাবার।

মালতী ॥ তা—তিন জনে বসে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবুন। (প্রস্থানোদ্যত)

মাধব ॥ (চিৎকার) না—ওসব পুলিশ টুলিশ ডাকা চলবে না। ও—ছেলে ছোকরার মারামারি—অমন সব পাড়াতেই হয়…

[বাইরে আবার গোলমাল। এবার দৌড়াদৌড়ি কম উত্তেজনাও কম।]

: ব্যাপারটা ভাল হোল না নিতাই দা।

: বেঘোরে স্ট্রেচার বানিয়ে দেবো !

: কানের কাছে তড়পাবি না। যা পারিস—করে নিস।

: রাত-বিরেতে এপাড়া দিয়েই যেতে হবে।

: যা—কোথায় কে আছে ডেকে নিয়ে আয়। এই পাড়া দিয়ে তে ফিরবো।

: ঠিক আছে। কানাইকে আমরা ছাড়বো না।

: আর শালা বিনেকে...

: গায়ে হাত দিলে—হাত ভেঙে দেবো।

: ভুল বকছো নিতাই দা।...

: নিতাই বাঘ বাজে ভয় পায় না।

[গোলমালটা এগিয়ে আসে। মাধববাবুদের কথাবার্তা মধ্যেও গোলমালটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে এগি আসে।]

বংশী ॥ সর্বনাশ ! নিতাই আবার এর মধ্যে জুটেছে !...

মাধব ॥ কে নিতাই ?

যাদব ॥ রায় বাড়ীর মেজো ছেলে।

বংশী ॥ গুণ্ডা মশাই—ডাকসাইটে গুণ্ডা।...

মাধব ॥ সেকি !—রায় বাড়ীর মেজো ছেলে তো যথেষ্ট ভদ্র !...

বংশী ॥ ভড়ং। ওসব হোল ভড়ং।—না মশাই, আমি চলি। এবার হয়ে কুরুক্ষেত্র লাগবে।

[গোলমালটা একেবারে দরজার কাছে এসে পড়ে টুকরো কথা ভেসে আসে।]

য় ॥ বলিহারী বুদ্ধি তোর কানাই ! তুই গেছিস ওদের সঙ্গে লাগতে !

ক ॥ ছি-ছি—তোরাও শেষে…

মহরি ॥ আহা—পথটা ছেড়ে দাও না…

[কানাইকে ধরে একে একে নিতাই-বিনয়-হৃদয়বাবু-রামহরিবাবুর প্রবেশ। ঘরে প্রবেশ করে নিতাই কানাইকে বিনয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়ায়। বাইরে তখনো সামান্য গণ্ডগোল।]

তাই ॥ আপনারা দয়া করে আর ভীড় করবেন না।……(মঞ্চে অন্য অংশে অভিনয় চলার সময়েও নিতাই কথা বলে চলেছে। অর্থাৎ নিতাই কথা বলছে বাইরের জনতার সঙ্গে। অন্যান্য সকলে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।) আঃ—কেন গোলমাল করছেন ? যা হবার তা হয়ে গেছে। আর মজা দেখাব কিছু নেই। ……না। আর কারোকেই ঢুকতে দেবো না।

লতা ॥ [মঞ্চের এই অভিনয় অংশ কানাইকে চেয়ারে বসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ—নিতাইয়ের অভিনয়ের অপেক্ষায় না থেকে মঞ্চাভিনয় আপন গতিতেই চলবে।]

(আহত কানাইয়ের মাথায় হাত রেখে অবরুদ্ধ স্বরে) কানাই।

নাই ॥ সন্ধ্যাকে ওরা যা-তা বলছিলো বৌদি।

দয় ॥ তাই বলে ঐ বকাটেদের সঙ্গে তুই মারামারি লাগাবি ? আরে বাবা—ওদের যমে ভয় পায়।……

ধব ॥ সে কথা কে বোঝায় ?

তাই ॥ (বিনয়কে) ঘরে তুলো-ব্যাণ্ডেজ-আইডিন আছে ?

দব ॥ এটাতো আর গুণ্ডার আখড়া নয়—যে তুলো ব্যাণ্ডেজ আইডিন সব সাজানো থাকবে।

নিতাই ॥ (কড়া জবাব দিতে গিয়েও শান্ত স্বরে) ওঃ ! তা—আনতে দিন।

মাধব ॥ (যাদবের দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দেয়।) যা—নিয়ে আয়।

যাদব ॥ ঐ—ঐ বিনেকে দাও।......

নিতাই ॥ আপনিই যান না। এখন বিনয়ের বাইরে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

যাদব ॥ আর আমার বাইরে যাওয়াটা ঠিক হবে ?

নিতাই ॥ আহা—আপনাকে তো ওরা কিছু বলবে না।

যাদব ॥ ও—বিনেকেও কিছু বলবে না।...

বংশী ॥ এটা বাবা ঠিক বললে না। হাজার হোক—একেবারে টাটকা মারামারিটা......

মাধব ॥ তা—একজন কেউ যাবে তো ....

বিনয় ॥ দাও।

মালতী ॥ (দৃপ্তভাবে) হ্যাঁ—ও-ই যাবে। যা বিনয়—(বিনয় প্রস্থানোদ্যত) আর শোন—এবার যদি ওরা আসে, খবরদার—শুধু মার খেয়ে আসবি না।...... [বিনয়ের হাসতে হাসতে প্রস্থান]

বংশী ॥ এটা তোমার ঠিক হোল না বৌমা।

রামহরি ॥ ঠিকই হয়েছে। এমনি করেই ওদের টিট করা দরকার।

যাদব ॥ পরের কাঁধে বন্দুক রেখে গুলী ছুঁড়তে খুব আরাম।

রাম ॥ তার মানে ?

যাদব ॥ আপনার সঙ্গে যখন লেগেছিল—তখন তো দশ টাকার মিষ্টি খাইয়ে বেশ মিটমাট করে নিয়েছিলেন।

হৃদয় ॥ তা—মিটমাট করবে না তো কি ? জলে বাস করে কি আর কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় ?

নিতাই ॥ জলে যারা বাস করে—তারা হাঙর কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করেই বাস করে।

বংশী ॥ লাখ কথার এক কথা বাবা—লাখ কথার এক কথা। আহা, কত কাল এমন এমন ভাল ভাল কথা শুনিনি।

নিতাই ॥ ঠাট্টা করছেন নাকি?

বংশী ॥ না বাবা—না। কি জানো—আমাদের তেমন বুকের পাটা নেই। তাই বুকের পাটাওলা মানুষ দেখলে কেমন ভড়কে যাই।

নিতাই ॥ আপনি ভড়কাবার লোক নন মিত্তির মশাই। কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছেন। জানেন তো আমার আবার মুখের কোন আগল নেই। খামাখা ঘাঁটাবেন না ······

বংশী ॥ এই—দেখো। পাগল কোথাকার! আরে বাবা—আমি তোমার সুখ্যাত করছি। তোমার সাহস যা···

নিতাই ॥ (কর্ণপাত না করে মালতীকে) ঘরে ডেটল আছে?

মালতী ॥ আছে।

নিতাই ॥ তাহলে কানাইকে নিয়ে ভেতরে যান। ভাল করে ডেটল দিয়ে ওয়াশ করে দিন।

মালতী ॥ কানাই—কানাই।

কানাই ॥ (মাথা গুঁজে বসেছিল) এ্যাঁ!

মালতী ॥ ভেতরে চল।

কানাই ॥ (উঠবার চেষ্টা করে) আ-আমাকে একটু ধর বৌদি।

মাধব ॥ (ভেংচে) আ-আমাকে একটু ধর বৌদি। চাবকে আমি তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলবো।

মালতী ॥ (চাপাস্বরে) আঃ—কি হচ্ছে।

মাধব ॥ থামো—থামো। পাড়ায় আমার মুখ দেখাবার উপায় রইলো না।

মালতী ॥ (কানাইকে নিয়ে যেতে যেতে) যদি কোন দিন মুখ দেখাতে পারো সে—ঐ কানাই বিনেরই জন্যেই পারবে। [প্রস্থান]

যাদব ॥ শুনলে—শুনলে কথাটা। তার মানে আমি—মানে আমরা সব···

বংশী ॥ যেতে দাও বাবা—যেতে দাও। ওসব মেয়েদের কথায় উত্তেজিত হলে জীবনে শান্তি পাবে না। ওদের কথা এক কান দিয়ে ঢুকতে আর এককান দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

নিতাই ॥ একেবারে বীজমন্ত্র! [যাদবের ভেতর বাড়ীতে প্রস্থান]

বংশী ॥ বিয়ে থা করো নি বাবা। ওসব গভীর তত্ত্ব ঠিক বুঝবে না।

নিতাই ॥ মাপ করবেন মিত্তিব মশাই। আপনাদের ঐ গভীর জলের তত্ত্ব আমি ঠিক বুঝি না। সাদা মনে চলি ফিরি। বাড়ীতে ভাত খাই আর গালাগালি খাই।……

বংশী ॥ ভালো কাজ কবো বাবা—খুব ভালো কাজ করো। তোমার মত দু'চারটে ছেলে পাড়ায় থাকলে পাড়ার চেহারাটাই পাল্টে যেতো।

নিতাই ॥ বলা যায় না—আপনাদের পাড়ায় থাকলে হয়তো আমার মতিগতিই পাল্টে যেত।

ফটিক ॥ একটু ঘুরিয়ে বদনাম করছো মনে হচ্ছে।

নিতাই ॥ আজ্ঞে না। ঘুরিয়ে বুঝছেন তাই বুঝতে দেরী হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবেই বদনাম করছি।—মিত্তির মশাই বলছিলেন না—আমাব মত আর কটা ছেলে থাকলে পাড়ার চেহারাটাই পাল্টে যেত! না—যেত না। আপনাবা যেখানে আছেন—সে পাড়ার চেহারা এই রকমই।…

হৃদয় ॥ বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছো ছোক্‌রা।

নিতাই ॥ আমার চাইতেও অনেক বড় বড় কথা আপনারা বলেন। ঘরোয়া বৈঠকে আপনাদের বড় বড় কথা আমি অনেক শুনেছি। একটা কথা বলুন তো—চোখের সামনে অন্যায় দেখলে আপনারা কজন তার প্রতিবাদ করতে পারেন? আজ আপনাদের চোখের সামনে ওরা কানাইকে ধরে মেরেছে। আপনারা দাঁড়িয়ে দেখেছেন। একজনও কানাইকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসেননি।

ংশী ॥ তা বাবা—আসিনি সেটা ঠিক। কিন্তু এগিয়ে আসার আগে জানা দরকার কে ঠিক আর কে বেঠিক। প্রতিবাদ করার আগে জানা দরকার ন্যায়ের প্রতিবাদ করছি না অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি।

নতাই ॥ মিত্তির মশাই—ওটা হোল সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাবার কূটবুদ্ধি। আজ কানাই একা মার খেয়েছে। যেদিন পালে বাঘ পড়বে সেদিন দেখবেন—আপনিও একা।

ৃদয় ॥ তাই বলে আগ বাড়িয়ে মার খেতে হবে ?

নিতাই ॥ শুধু মারই বা খাবেন কেন ? মার দেবেন।......

ৃদয় ॥ ওসব কথা শুনতেই ভাল।......

[হঠাৎ বাইরে বোমা ফাটানোর আওয়াজ। কিছু চিৎকার—ছুটোছুটি, একটানা গোলমাল। বাইরের গোলমালেব সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চে অভিনয় চলবে।]

ঃ ধর। ধর—ধর শালাদের।

ঃ পালালো। পালালো।

ঃ এ্যাঁক রাজত্বে বাস করছি মশাই !

ঃ এসব রাজনীতির ফল। চ্যাংড়াদের মাথায় তোলার মাশুল।

ঃ মরেছে। ও ছোকরা খোঁড়াচ্ছে কেন ?

ঃ এঃ ! পা বেয়ে কি রক্ত পড়ছে দেখেছেন !

ঃ ছি-ছি-ছি ! ভদ্র পাড়ায় দিন দুপুরে এসব কি কাণ্ড !

ঃ রাখুন মশায় আপনার দিনদুপুর আর রাত দুপুর। এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ী যান।

ঃ কেটে পড়ি বাবা। শেষে আবার সাক্ষী মেনে বসবে।

[গোলামালটা কিছু সময় ধরে চলতেই থাকে। মঞ্চে অভিনয় চলে সমানভাবে। অর্থাৎ—বোমা ফাটানোর শব্দের পরে সামান্য নীরবতার পরই অভিনয় চলে।]

বংশী ॥ বোমা ফাটালো বলে মনে হচ্ছে।

নিতাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। বলা যায় না হয়তো দু একটা মাথাও ফেটেছে।

রাম ॥ ডোবালে দেখছি। এখন বাড়ী ফেরাও তো বিপজ্জনক।

নিতাই ॥ তা—ধরুন এখানে থাকাটাও বিপজ্জনক। যতদূর মনে হচ্ছে, ওদের রোখটা এখন আমার ওপর।

রাম ॥ এতো ভালো বিপদে পড়লাম। কোথায় মাধববাবুর বিপদ দেখে সাহায্য করতে ছুটে এলাম···

নিতাই ॥ কেন বাজে কথা বলছেন। মাধববাবুর বিপদ দেখে মজা দেখতে ছুটে এসেছেন।

রাম ॥ দে-দেখো ছোকরা···

নিতাই ॥ ভয় দেখাবেন না—ভয় দেখাবেন না। ওটা আমার তেমন নেই···

বংশী ॥ যেতে দাও হে রামবাবু—যেতে দাও। এ তোমার ঘণ্টা-বিশু নয় যে দশটাকার মিষ্টি খাইয়ে ম্যানেজ করে নেবে। নিতাই বাবাজীবনকে খামাখা চটিও না।···

রাম ॥ ও সব—ও সব আপনারা ভয় পাবেন। ভয়—ভয় আমি করি না। ছোট মুখে···ছোট মুখে বড় কথা আমি সহ্য করিনি—করবোও না।

নিতাই ॥ (দৃঢ়ভাবে কাছে এসে) কি করবেন ?

মাধব ॥ আঃ—নিতাই ! কি হচ্ছে এ সব !

নিতাই ॥ আপনি জানেন না—এঁদের জন্যেই···পাড়ার এই সব সমস্যা মাতব্বরদের জন্যেই এখান থেকে মদের দোকান তুলে দেওয়া যায় না ! এঁরা টাকা দিয়ে গুণ্ডা পোষেন ! গুণ্ডা ভাড়া করে ভাড়াটে তোলেন······

হৃদয় ॥ খবরদার। খবরদার।—আমাকে ইংগিত করা হচ্ছে। আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলা হচ্ছে।

নিতাই ॥ শুধু আপনাকে নয়, সবাইকে। সব্বাইকে। নামাবলীর তলায় আপনারা মুরগীর ঝোল নিয়ে বাড়ী ফেরেন ···

হৃদয় ॥ মাধববাবু! আপনার বাড়ীতে এভাবে আমাকে···

মাধব ॥ বাবা নিতাই···

নিতাই ॥ কেন! আমার ভয়টা কিসের! আমি ঐ তিলে-বিশেদেরও ভয় করি না। আর এই সব (হৃদয়-রাম-বংশীকে দেখিয়ে) ঠাকুর-দেবতাদেরও ভয় করি না।

মাধব ॥ আমি করি বাবা—আমি ভয় করি। আমি সবাইকে ভয় করি।

নিতাই ॥ তাতে কারোকেই ঠেকাতে পারবেন না।···

বংশী ॥ খাঁটি কথা বাবা। সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি কথা। কিন্তু মুশকিল কি জানো বাবাজী—সবাই তোমার মত বোঝে না। ঐ কি যে বলে "চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা"—ওটাই হল আসল কথা।

নিতাই ॥ ঐ আসল কথাটা আপনারা বুঝেছেন ভালভাবেই, ভাবছেন ঐ এক বোঝাতেই—আর কিছু বাচুক আর নাই বাঁচুক—প্রাণটা আপনাদের চিরকাল বাঁচবে।

বংশী ॥ চিরকাল কেউ বাঁচেনা বাবা—কিন্তু বেঘোরে প্রাণ দেওয়াটা······

[ব্যস্তভাবে তুলো ব্যাণ্ডেজ আয়োডিন হাতে বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয় ॥ নিতাইদা—ওরা···ওরা···

নিতাই ॥ ওগুলো ভেতরে দিয়ে আয়।

বিনয় ॥ এ্যাঁ!

নিতাই ॥ ওগুলো ভেতরে দিয়ে আয়।

বিনয় ॥ ওঃ! হ্যাঁ—(হৃদয়বাবুকে) আ-আপনি বাড়ী যান। বাসুর পা অনেকখানি কেটে গেছে।

হৃদয় ॥ কেন—মানে কি করে ?

বিনয় ॥ ঐ বোমা······মানে আমি ঠিক দেখিনি ! ঠিক বলতে পারবো না। ভয়ে কেউ বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে না। আপনার বাড়ী থেকে বলে দিল—ডাক্তার ডাকা দরকার। [প্রস্থান]

হৃদয় ॥ তা—তা—তা আমি যাবো কি করে ?

নিতাই ॥ হেঁটে।

হৃদয় ॥ খবরদার—খবরদার—কোন রকম ঠাট্টা করবে না।

নিতাই ॥ আর কি করবো বলে দিন ?

হৃদয় ॥ আমি—আমি একাই যাবো ?

নিতাই ॥ (সজোরে) তাই যান।······

হৃদয় ॥ (অসহায়) মাধব বাবু !···

নিতাই ॥ না—কেউ না। আপনি একাই যাবেন। জগতে সবাই একা এসেছে। একাই সবাইকে যেতে হয়। কানাই একা মার খেয়েছে। আমি একা দাঁড়িয়ে কানাইকে বাঁচিয়েছি। আর—আর আপনারা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছেন। (ভেতর বাড়ী থেকে বিনয়ের প্রবেশ) এবার ঐ ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে আপনাকে একা যেতে হবে। আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবো।

হৃদয় ॥ (হঠাৎ বিনয়ের হাত ধরে) বিনে, আমাকে একটু পৌঁছে দিবি বাবা !

নিতাই ॥ (সগর্জনে) না—দেবে না। ভাড়াটের পেছনে ওদেরকেই ভাড়া করে লেলিয়ে দিয়েছিলেন আপনি। সেদিন সেই অসহায় বৃদ্ধ আপনার দুহাত জড়িয়ে ধরেছিলো। সেদিন যে বিষঝাড় পুঁতেছেন —আজ তার ফল খাওয়াবো।

হৃদয় ॥ রাস্তাটা—মানে···হ্যাঁরে বিনে রাস্তা কি একদম ফাঁকা ?

বিনয়॥ তা—হ্যাঁ। ফাঁকা তো বটেই। মনে হচ্ছে—আবার জোর মারামারি লাগবে। ঐ বোমা ফাটানোর সময় বিজয়দের দলের কোন ছোকরার গায়ে যেন লেগেছে। সে তড়পে গেছে—দলবল নিয়ে আসবে।

হৃদয়॥ ওরে বাবা! এবার তাহলে সোডার বোতল চলবে!

বংশী॥ তাহলে তো বাবাজী—মানে বাবা নিতাই—কি বলে গিয়ে তোমরাই হলে দেশের ভবিষ্যৎ।—একটু এগিয়ে দেখোনা বাবা—

হৃদয়॥ আ-আমাকে আবার ডাক্তার ডাকতে হবে!—ওঃ! খুব ভাই তৈরী করেছেন মাধববাবু। এক ধাক্কায় ধুন্ধমার ছুটিয়ে দিয়েছে।···

মাধব॥ চলুন—আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

বংশী॥ আরে আপনি বুড়ো মানুষ···

মাধব॥ না। আমিই যাবো।—আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আমি থানায় যাবো।

বংশী॥ পাগল নাকি! শুনলেন তো—এখুনি হয়তো সোডার বোতল চলবে···

মাধব॥ চলুক। চলুক। এমন—এমন ঘরের কোণে মরে থাকার চেয়ে··· দূর! দূর! ঐ বিনয়-কানাইয়ের যে সাহস আছে সেই সাহসটুকুও আমাদের নেই!

হৃদয়॥ তা—তা মানে—সাহস যে নেই তা নয়। তবে—মানে—বোঝেনই তো। ঐ সব গুণ্ডা ফুণ্ডার সঙ্গে আমরা পারবো কেন?

নিতাই॥ তা পারবেন কেন? পারবেন অসহায় ভাড়াটেদের সঙ্গে।···

[ব্যস্তভাবে নরেনের প্রবেশ]

নরেন॥ (হৃদয়কে) কাকাবাবু, তাড়াতাড়ি বাড়ী যান। বাসুর রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।···

হৃদয় ॥ একা একা যাবো কি করে ?

বিনয় ॥ চলুন—আমি যাচ্ছি।

হৃদয় ॥ (আড় চোখে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে) তা—তা—তুমি যাবে ?

নিতাই ॥ অমন আড় চোখে তাকাবেন না।—নবেন, তুই চলে যা। একট ডাক্তার ডেকে নিয়ে যা ওঁদের বাড়ী। আর—পারিস তো পুলিসে একটা ফোন করে দে।

নরেন ॥ চেষ্টা করেছিলাম। কেউ ফোন করতে দিতে চায় না।

নিতাই ॥ তা—কেউ চাইবে না। ঠিক আছে—ঐ ডাক্তারখানা থেকেই ফোন করবি। যা—

[নরেন প্রস্থানোদ্যত। হঠাৎ বাইরে একদল মানুষের তীব্র হুংকার জাগে। পাড়া জুড়ে বিরাট দৌড়োদৌড়ি আর তীব্র গর্জন।]

: কোন শালা—কোন শালা মেরেছে। আর—কার বুকের পাটা আছে বেরিয়ে আয়।

: কৈ বে ? বোমবাজ রুস্তম ! নিয়ে আয় শালা কত বোম আছে

: আজ শালা পাড়াকে পাড়া জ্বালিয়ে দেবো।

: চলে আয় শালা—কে কোথায় আছিস চলে আয়।

: হ্যা—এ্যা। হ্যা—এ্যা, হ্যা—এ্যা।

[তীব্র শিষের শব্দ। রাস্তায় লাঠি পেটার শব্দ।

: হিড়িকবাজ রুস্তম সব দো রুটির খদ্দের যে বে।

: বিনয়দা—সব হড়কে গেছে। কোন শালার পাত্তা নেই।

[গোলমালটা চলতেই থাকে। গোলমালের মাঝেই মঞ্চে অভিনয় চলতে থাকে।]

বংশী ॥ এবার বোধ হয় বিনয়-বাহিনী এলো।

বিনয় ॥ হ্যাঁ।—ওদের দলের একজনকে···

হৃদয় ॥ এ—এ কোন রাজত্বে আমরা বাস করছি!—ওদিকে বাসুটা···হ্যাঁরে নরেন—রক্ত পড়াটা বন্ধ হচ্ছে না?

নরেন ॥ তাই তো বললো।···

রাম ॥ আহা—অতো ভাবছো কেন? এক সময় তো বন্ধ হবেই।

নিতাই ॥ জীবনে তো বোমা চোখে দেখেননি···

রাম ॥ দেখতে চাইও না।

নিতাই ॥ সেতো বাসুও দেখতে চায়নি।...

হৃদয় ॥ (হঠাৎ কেঁদে ফেলে) আমার—আমার ছেলেটা বাঁচবে না। (নিতাইয়ের দুহাত ধরে) বাবা নিতাই—একটা ডাক্তার···আমার ঐ একমাত্র ছেলে···

নিতাই ॥ (ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নেয়।) তাতে আমার কি?

মাধব ॥ (গর্জন করে ওঠেন) নিতাই! (সকলে চমকে তাকায়।)

বিনয় ॥ (মাধববাবুকে ধরে ফেলে।) বড়মামা—তুমি কাঁপছো।

মাধব ॥ আমরা—আমরা না হয় কাপুরুষ। প্রতিদিনের পাপে না হয় তিলে তিলে আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দিই। অবিচার নীরবে মেনে নিই।—কিন্তু—কিন্তু বাসুর কি অপরাধ!

বিনয় ॥ বড় মামা!···

মাধব ॥ থাম। থাম। থা···ম'···আমাদের পাপের ভার আমাদের ডুবিয়ে মারুক। তাই বলে বাসুকে···ঠিক আছে আমি যাবো। আমিই যাবো। (প্রস্থানোদ্যত।)

নিতাই ॥ (দৃঢ়স্বরে) দাঁড়ান।

মাধব ॥ অনেক লজ্জা দিয়েছো নিতাই। আর নয়। এবার আমার পালা

[বেরিয়ে যেতে চায়।]

নিতাই ॥ (ধরে) দাঁড়ান।

মাধব ॥ না—না। এ পাড়ায় অন্যায়কে পুষেছি আমরা। আজ যখন চো৲ খুলেছে—তখন আর ভয় পাই না। তোমাদের—তোমাদের যেমন মারার সাহস আছে—আজ আমার তেমনি মরার সাহস আছে।

নিতাই ॥ এখন বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়।

মাধব ॥ আমি তো নিরাপদে যেতে চাই না। আমি শুধু বাইরে যেতে চাই।...

নিতাই ॥ বিনয়—তোর বড়মামাকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যা।

মাধব ॥ না—বাড়ীর ভেতরে আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না।...

নিতাই ॥ ছেলেমানুষী করবেন না। (প্রায় ঠেলতে ঠেলতে) যান—আপনি ভেতরে যান।

মাধব ॥ না—আমি যাবো না। না—না—আমাকে ছেড়ে দাও...আমাকে...

নিতাই ॥ (মাধববাবুকে বাড়ীর ভেতরে পাঠিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ভেতরে মাধববাবু তখনো দরজায় ধাক্কা দেয়।) নরেন—তুই এদিকটা দেখিস। (বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে যায়।)

নরেন ॥ তুমি কোথায় যাচ্ছো?

নিতাই ॥ (হৃদয়বাবুর দিকে সোজা তাকিয়ে) অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে একটা।

হৃদয় ॥ এ্যাম্বুলেন্স কেন? অ্যাম্বুলেন্স কেন?—বাবা নিতাই, অ্যাম্বুলেন্স কেন?

নিতাই ॥ এই গোলমালে কোন ডাক্তার আসতে চাইবে না। তাছাড়া—রক্ত যখন বন্ধ হচ্ছে না, তখন হাসপাতালে পাঠানোই ভাল। (প্রস্থানোদ্যত)

বংশী ॥ তা—বাবাজী একটু দেখে শুনে যেও।

নিতাই ॥ (হঠাৎ ঘুরে) আমরা দেখে শুনে চলিনা মিত্তির মশাই। দেখতে আর শুনতে গেলে যাবার সময়টাই চলে যায়।

বংশী ॥ তা হোক বাবা—তোমাদের প্রাণটার একটা দাম আছে। যে অন্যায়টাকে আমরা ভয়ে ভয়ে মেনে নিয়েছি, সেই অন্যায়টাকেই তোমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছো। (অবরুদ্ধ কণ্ঠে) বেঁচে থাকো বাবা—বেঁচে থাকো। আমার পোড়া মনেব গোপন বাসনাটা তোমাদের মধ্যে বেঁচে উঠুক। আমরা—আমরা হেবে গেছি বাবা…

নিতাই ॥ (সবিস্ময়ে) মিত্তির মশাই—আপনার চোখে জল…

বংশী ॥ পোড়া চোখে জল ছিলো না রে—ছিলো না।…(সাম্‌লে) না বাবা তুমি যাও। বাসুকে বাঁচাও।…

নিতাই ॥ ভয় নেই হৃদয়বাবু। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। [প্রস্থান।]

বংশী ॥ বাবা নরেন—একটু এগিয়ে দেখ। যা বাবা—একটু এগিয়ে দেখ।

[নরেনের প্রস্থান]

রাম ॥ মিত্তির মশাই যে একেবারে গলে গেলেন !

বংশী ॥ কি জানি ভাই—ঐ মাধববাবুর রোখ দেখে আমারো কেমন রোখ চেপে গেল ! পাড়ার ছেলে ছোকরাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান দিয়েছি। ওসব ওপর চালের উপদেশের আসল ফাঁকিটা আজ ধরা পড়ে গেছে। এতদিন চালাকী করে শুধু অন্যায়টাকে এড়িয়ে গেছি। বুঝিনি—চারপাশ থেকে সেই অন্যায়টাই আমাদের বেড়াজালে জড়িয়ে ধরছে।

হৃদয় ॥ নিতাই—মানে নিতাই ঠিক যেতে পারবে তো ?

বংশী ॥ ঠিক পারবে। আরে পাকা মাথা নিয়ে আমরা সবাই বাঁকা পথে এঁকেবেঁকে চলি। ওরা চলে সোজা পথে। তাই ওরা ঠিক পৌছোয়। [নরেনের প্রবেশ।]

হৃদয় ॥ কি ?—কি দেখলে !

নরেন ॥ নিতাইদা গট গট করে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে ।

হৃদয় ॥ এ—কি বলে গিয়ে—মানে—বিজয়দের দলবল…

নরেন ॥ ও পাশের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ।…

[হঠাৎ বোমার আওয়াজ । সকলে চমকে ওঠে । বিনয় হঠাৎ ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় । রাস্তায় আবার দৌড়োদৌড়ির শব্দ—চিৎকার—গোলমাল ।]

: ছাড়বি না । ছাড়বি না শালাকে ।

: এবার চাঁদ বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো ।

: তিলে মাষ্টারকে এখনো চেনো নি বাপধন ।

: আমার ডেরায় এসে রোয়াবি !

: আই বাপ ! বিনয়ের দল মাইরী ।

: আই শালা—বোতল ঝাড়ছে যে বে !

: মার । মার শালাদের ।

: আবে—দেয়ালে সেঁটে না ।

: এ্যাই বিশে—দুটো রুটি ঝেড়ে দে ।

: মরেছে ! লিতাই শালা উদিকে যাচ্ছে যে বে ।

[গোলমাল চলতেই থাকে । মঞ্চের অভিনয় এর সাথেই চলে ।]

নরেন ॥ (বিনয় ছুটে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে) বিনয়—বিনয়……

[প্রস্থানোদ্যত]

বংশী ॥ (নরেনকে ধরে) তুমি কোথায় চললে ?

নরেন ॥ (কথা খুঁজে পায় না । দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে) বিনয়—মানে নিতাইদা…

বংশী ॥ এবার আমার টার্ন। তুমি দাঁড়িয়ে দেখো ছোকরা—

রাম ॥ মিত্তির মশাই কি ক্ষেপে গেলেন নাকি ?

বংশী ॥ ক্ষেপে গেলাম ভাই, ক্ষেপেই গেলাম! আমার তো তিন কুলে কেউ কাঁদবার নেই। এতদিন তবু প্রাণটার জন্যে কেমন একটা মায়া ছিলো। আজ সেটাও ঘুচে গেছে। যাই—এতদিন নীরবে সহ্য করে যে পাপ জমিয়েছি, তার চেহারাটা দেখে আসি। (প্রস্থান)

হৃদয় ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও মিত্তির, আমিও যাবো। (রামবাবু হঠাৎ টেনে ধরেন) ছেড়ে দাও। আমার—আমার ছেলের জন্যে যে একলা ঐ পথে যেতে পারে—তার জন্যে আমিও পারি। ছেড়ে দাও।...আমাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়িয়ে নিয়ে প্রস্থান)

[সামান্য নীরবতা। বাইরে গোলমাল চলতেই থাকে। টুকরো কথা সমানে চলে। নরেন পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। রামবাবু ক্রমশঃ পিছোতে থাকেন। নরেন যখন প্রায় দরজার কাছে এসেছে এমন সময় বাইরে আবার বোমার আওয়াজ। রামবাবু হঠাৎ তীব্র চিৎকার করে ওঠে। একটা জান্তব বীভৎস চিৎকার। নরেন রামবাবুর দিকে এগিয়ে যায়।]

রাম ॥ আমি—আমি ভয় পেয়ে গেছি।

নরেন ॥ ভয় পেয়ে তো পার পাবেন না।

রাম ॥ (আতংকিত) না—না—আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেছি। দরজাটা মানে—দরজাটা বন্ধ করে দাও...

[রামবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর বাড়ীর দরজায় ধাক্কা পড়ে। মাধববাবুর কণ্ঠ শোনা যায়—"দরজাটা খুলে দে। তোরা কে আছিস দরজাটা খুলে দে।"]

রাম ॥ (চাপা গলায়) দরজাটা বন্ধ করে দাও।...

[নবেন শান্ত পায়ে দরজাব দিকে এগোয়। দরজাব কাছে গিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে রামবাবুব দিকে তাকায়। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। রামবাবু বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকিয়ে থাকে। ভেতব বাড়ীর দরজায় তথনো মাধববাবু কবাঘাত কবেন। তাঁর কণ্ঠস্বব তথনো শোনা যায—"দরজাটা খুলে দে। তোরা কে আছিস, দবজাটা খুলে দে।" ধীবে ধীবে পর্দা নেমে আসে। বাইরে তথনো গোলমাল চলছে। পর্দা পড়ে যাবাব পবেও মাধববাবুব কণ্ঠস্বর শোনা যায।]

———

ঝুমঝুমি

চিত্ত ঘোষাল

চরিত্র-লিপি

পরীক্ষিৎ—ধনী যুবক
শৈলেন—ঐ বন্ধু ও পার্টনার
কৃতান্ত সান্যাল—অধ্যাপক
অনিমেষ—আর্টিষ্ট
নিখিল নাগ—সৌখীন নাট্যপরিচালক
বিকাশ পাল—ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়ালিষ্ট
বাঞ্ছেশ্বর—বাড়ীর দালাল
ধনঞ্জয়—পরীক্ষিতের চাকর
অনুরাধা—আধুনিকা

[পরীক্ষিতের বৈঠকখানা ! বড়লোকের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমের সাজসজ্জা। পাদপ্রদীপের প্রায় কাছাকাছি ডান দিক ঘেঁষে একটি টেলিফোন। সময় সন্ধ্যা। অনুরাধা একটি সোফায় বসে উসখুস করছে। বার বার সময় দেখছে হাত-ঘড়িতে। ধনঞ্জয় ঝাড়ন হাতে ঘর ঝাড়পোঁছ করছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজছে—

"ভাওয়ালের রাজন বিষে যায় জীবন
দুষ্ট নারী নষ্ট করে সোনার সিংহাসন"]

অনু ॥ (ধনঞ্জয়ের গান শুনে হেসে) এদিকে যে আমারও জীবন যাবার উপক্রম। আর কতক্ষণ বসে থাকব ?

ধন ॥ (কথাবার্ত্তার ধরন অত্যন্ত রুক্ষ) যতক্ষণ না বাবু আসেন।

অনু ॥ ছটা তো বাজে। পরীক্ষিৎদা কোথায় গেছেন জানো ?

ধন ॥ না, আমি কি বাবুর বিয়ে করা বউ যে দেরী করে বাড়ী ফিরলে রাগ করব, তাই বলে যাবে।

অনু ॥ তুমি বড় বাজে বক ধনঞ্জয়দা।

ধন ॥ তোমরাই বা সারা সন্ধ্যে এক দঙ্গল মিলে বাবুর সঙ্গে কি এমন কাজের কথাটা বল বাপু। এই ছটা থেকে সুরু হয়ে দশটা পর্যন্ত।

অনু ॥ (মৃদু হেসে) ও তাই বল।

[পরীক্ষিতের প্রবেশ। দামী পোষাক। অনু মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকে।]

পরীক্ষিৎ ॥ আই অ্যাম রিয়েলি সরি অনু। বড্ড দেরী হয়ে গেল। মহীশূর আয়রনটা এমন চড়ছে যে শেষ পর্যন্ত না দেখে কিছুতেই আসতে পারলাম না। অ.নকক্ষণ বসে আছ বোধ হয়।

ধন ॥ (রীতিমত ঝাঁঝের সঙ্গে) এমন আর কি, দেড় ঘণ্টা।

পরীক্ষিৎ ॥ ধনাদা, তোমার বাক্যবাণ কিয়ৎকাল সংবরণ কর। দেবী অপ্রসন্না—

ধন ॥ বেশতো দেবীকে প্রসন্ন কর, আমি চললুম—(প্রস্থানোদ্যত)

পরীক্ষিৎ ॥ কোথায় ?

ধন ॥ রান্নাঘরে—

পরীক্ষিৎ ॥ বাঁচালে।

ধন ॥ কি বললে আমি গেলে তুমি বাঁচ। বেশ, যাব চলে যাব। দেখি কোন শর্ম্মা এই ভূতের বাড়ী আগলায়। গোটা বাড়ীতে দুটি বই মনিষ্যি নেই। আমি বলেই না আছি।

পরীক্ষিৎ ॥ এই মরেছে, আমি কি তাই বললুম নাকি। আমি বলছিলুম তুমি রান্নাঘরে গেলে আমি বাঁচি। একেবারে অদর্শন হলে নির্ঘাৎ এই অধমের অপমৃত্যু।

ধন ॥ থাক আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই (প্রস্থান)

পরীক্ষিৎ ॥ কি রাগ পড়ল ?

অনু ॥ আমি কি মহিশূর আয়রণ যে এই চড়ছে আর এই পড়ছে।

পরী ॥ খুব চটেছ দেখছি।

অনু ॥ না, চটব কেন। আমি মানে আমরা সবাই এসে তোমাকে বিরক্ত করি তুমি এটা পছন্দ কর না। তাই নানাভাবে সেটা বুঝিয়ে দাও।

পরী ॥ (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) তুমি বিশ্বাস কর অনু, তোমাদের ছাড়া বিশেষ করে তোমাকে ছাড়া একটি দিনও আমার চলবেনা। তুমি তো জান স্বজন বলতে কেউ আমার নেই। তোমাদের দিয়েই আমার মনের ফাঁকটা ভরত চাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও একটা কথা আমি বুঝতে পারিনা।

অনু ॥ কি ?

পরী ॥ (কথাটা এড়িয়ে গিয়ে) না, কিছুনা। এমনি হঠাৎ একটু সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছিলুম।

অনু ॥ মিথ্যে কথা, তুমি কিছু একটা লুকোচ্ছ।

পরী ॥ না-না, লুকোচ্ছি না। সত্যিই একটু সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছিলুম। আচ্ছা অনু, ধর এই মুহূর্তে, হঠাৎ কোন কাব্য না করে যদি একটা কথা তোমাকে বলে ফেলি—

অনু ॥ কি কথা ?

পরী ॥ এই ধর—তোমাকে আমি ভালবাসি—তা হলে ?

অনু ॥ (সলজ্জভাবে) তা হলে ? তা হলে সারা জীবন ধরে এ কথা কটি যখের ধনের মত আগলে রাখবো।

পরী ॥ যে কোন অবস্থায় ?

অনু ॥ হ্যাঁ যে কোন অবস্থায়, যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায়ই তুমি আমি থাকিনা কেন, শুধু জানব তুমি আমাকে ভালবাস।

পরী ॥ একটু চাঁদের আলো ফুলের সুবাস মার্কা শোনাচ্ছে না ?

অনু ॥ যাও তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

পরী ॥ ঠাট্টা নয় অনু। আমার জীবনে এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে যাতে হয়ত আমার অনেক বিশ্বাস আর ধারণার গোড়া ধরে টান পড়বে।

অনু ॥ আবার হেঁয়ালী সুরু করলে ? তোমার জীবনে আবার সমস্যা কিসের ? টাকাকড়ির ইয়ত্তা নেই। বন্ধুবান্ধব সবাই তোমাকে নিয়ে পাগল। প্রফেসর সান্যাল থেকে আরম্ভ করে ছোকরা গাইয়ে সুবিমল পর্যন্ত সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করে যতখানি, ভালওবাসে তার চেয়ে কম নয়। আর আমি ? থাক নিজের মুখে নাইবা বললাম সে কথা। আর কি চাও তুমি ?

পরী ॥ রাইট ! অঢেল টাকা আছে। সবাই শ্রদ্ধা করে। সবাই ভাল বাসে। আর কি চাইবার থাকতে পারে ? থাক বাদ দাও ওসব কথা। অনু তুমি সেদিন ডায়মণ্ডহারবার যেতে চেয়েছিলে—চল কাল আমার গাড়ীতে।

অনু ॥ হাউ সুইট !

[টেলিফোন বেজে ওঠে, পরীক্ষিৎ টেলিফোন ধরে বেশ গাম্ভীর্যের ভাণ করে কথা বলে]

পরী ॥ হ্যালো, হ্যাঁ আমি পরীক্ষিৎ। তুমি রেডি থেকো, যথা সময়ে রিং করবো। ঠিক প্ল্যান মাফিক হওয়া চাই কিন্তু। কি বললে, আমি হেরে যাবো ? অসম্ভব। না না আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না। আচ্ছা, আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি।

অনু ॥ কে ফোন করছিল ?

ী॥ (অন্যমনস্কভাবে) ফোন? ও হ্যাঁ, ও একটা বাজে লোক।

ু॥ কিসের হারজিতের কথা বলছিলে?

ী॥ একটা খেলার। এমন একটা খেলাব, যেখানে আমার বিশ্বাস আমি জিতে চলেছি আর ঐ লোকটা বলে আমি নাকি গো-হারান হেরে যাচ্ছি। কি বুঝতে পারছো না তো? (হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে) আচ্ছা অনু, সেদিন নিউমার্কেটে যে নেকলেশটা তোমার খু-উ-ব ভাল লেগেছিল কাল সেটা কিনব। মানে তোমারই জন্যে।

নু॥ (খুকু-ভাবে ভাবিত হযে) ও, ডিয়ার, ডিয়ার, ইট'স দি ড্রিম অব এ নেকলেশ। সত্যি তোমাকে যে আজ কি ভীষণ—

রী॥ কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে নাকি?

নু॥ যাও মুখে আর কিছু আটকায় না।

বী॥ অনু, তুমি শৈলেনকে চেনো? আমার নতুন ওয়ার্কিং পার্টনার শৈলেন দাস।

নু॥ চিনবো না কেন? মাত্র একদিনই এখানে এসেছেন, তবু সবাই ওঁকে মনে রেখেছে। ভদ্রলোক বেশ পিকিউলিয়ার সব কথা বলেন।

বী॥ সত্যিই তাই। লোকটা কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না সহজে। বলে অধিকাংশ মানুষই নাকি জলের মত। যেদিকে ঢালু দেখে সেদিকেই গড়ায়। একটা মানুষকে বিচার করবার সময় আমি শুধু আমার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দিয়েই তার বিচার করি, তাই সেটা ভুল হতে বাধ্য।

নু॥ ফানি, তাই না?

বী॥ শৈলেন বলেছে আমার ধারণা সে পালটে দেবে। কিন্তু আমি তো জানি—

[গলা খাঁকারি দিয়ে রাজ্যেশ্বরের প্রবেশ। রোগা, লম্বা, দাঁত-বার করা চেহারা। সব সময়েই এমন একটা মুখভাব

করে আছে যেটা হাসিও হতে পারে, আবার ভ্যাংচানো হতেও বাধা নেই।]

এই যে রাজ্যেশ্বর এস। কি খবর?

রাজ্যেশ্বর ॥ আর খবর স্যার। দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি। সেই যে স্যার কথায় বলে না—

বহুমূত্র বহুপুত্র তবু আছি টেঁকে
কাঁকাল নাকাল বাতে লাঠি গেছে বেঁকে।

অনু ॥ ফানি!

রাজ্যেশ্বর ॥ স্যার ফসকে গেল?

পরী ॥ কি?

রাজ্যেশ্বর ॥ বাড়ীওয়ালারা স্যার আজকাল বাড়ীর পেছনে ডুসেট করে দালাল রাখছে। অমন ফ্ল্যাটখানা স্যার নগদ একশো টাকা কমিশন। কথাবার্তা সব ঠিক করে এসে দেখি স্যার, ভুনশ্বর ভাড়াটে বসিয়ে দিয়েছে। কর্তাকে বললুম। তা উনি বললেন—তোমার চেয়ে বেশী ভাড়ায় এনেছে হে।

অনু ॥ ছেড়ে দিন না, অমন বাড়ীওয়ালার কাজ নাইবা করলেন।

রাজ্যেশ্বর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ তা মন্দ বলেন নি। তবে অসুবিধেটা কি জানেন। আমি বাড়ীওয়ালাকে ছাড়লেও গিন্নী আর তার আধডজন অপোগণ্ড কি আমায় ছাড়বে! একটা কথা ছিল স্যার, একটু আড়ালে—

পরী ॥ না, আড়ালে নয়। যা বলবার এখানেই বল!

রাজ্যেশ্বর । বড় প্যাঁচে পড়ে গেছি স্যার।

পরী ॥ কি রকম?

রাজ্যেশ্বর ॥ আজ্ঞে ঘর ভাড়া তিন মাসের বাকী। বাড়ীওয়ালার দাঁত খিঁচুনী শুনছি। এদিকে মেজো মেয়েটার জ্বর—সেই যে দিন সাতেক আগে সুরু হয়েছে, বাড়েও না কমেও না—এক নাগাড়ে চলছে। ভেবেছিলুম

কমিশনের টাকাটা পেলে ডাক্তার দেখাব। তা ঐ শালা ছুনম্বর স্যার দিলে সব ভেস্তে! এদিকে গিন্নীর আবার পাঁচ—

পরী॥ থাক। কত চাই?

রাজ্যেশ্বর॥ না চাইতেই জল স্যার—দিন স্যার বিশটা টাকাই দিন!

পরী॥ (পার্স থেকে টাকা বার করে) এই নাও। রাজ্যেশ্বর, ধনাদাকে একটু ডাকতো—রান্নাঘরে আছে।

রাজ্যেশ্বর॥ ভেতরে যাব স্যার?

পরী॥ হ্যাঁ যাওনা।

রাজ্যেশ্বর॥ বলছিলুম কি স্যার, বারান্দা থেকে ডাকলে হয় না! হাতের কাছে পেলে আবার কি করতে কি করে বসে!

পরী॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ। আচ্ছা বেশ বারান্দা থেকেই ডাক।

[রাজ্যেশ্বর ভিতরে যাওয়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

অনু॥ কি ব্যাপার, আজ যে একেবারে কল্পতরু? সবার ইচ্ছেপূরণের ভার যেন আজ তোমার!

পরী॥ কথাটা কি ঠিক হল? তুমি ছাড়াও আর যারা এখানে আসেন, তাদের অনেক ইচ্ছাপূরণের দায় যে স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে নিজের কাঁধে নিয়ে থাকি সেটা তোমাকে মানতেই হবে।

অনু॥ তা ঠিক, তবে এই রাজ্যেশ্বর লোকটা বড় নির্লজ্জ। নিজের অভাব অনটন আর অক্ষমতার কথা কি করে যে লোকে হাটের মাঝখানে বলে!

পরী॥ আমিও তাই ভাবি। লোকটা সত্যিই নির্লজ্জ।

অনু॥ আর যারা এখানে আসেন তাদের সম্পর্কে কি ভাব?

পরী॥ তারা সবাই আমার রিয়েল গুডফ্রেণ্ডস, এরা না থাকলে আমার সন্ধ্যেগুলো অসহ্য হয়ে উঠতো।

[প্রথমে রাজ্যেশ্বর, পেছনে ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

ধন ॥ আবার ডাক পড়ল কেন ?

পরী ॥ ফায়ার—তিন-রাউণ্ড।

রাজ্যেশ্বর ॥ (মাথা চুলকে) আজ্ঞে—আগে একটু লাঠি চার্জ হলে ভাল হত না ?

পরী ॥ ধনাদা, রাজ্যেশ্বরের জন্যে লাঠিচার্জ।

ধন ॥ (রাজ্যেশ্বরকে) গজকচ্ছপ, ভূত কোথাকার !

রাজ্যেশ্বর ॥ হেঁ হেঁ— [ধনঞ্জয়ের প্রস্থান]

পরী ॥ আচ্ছা অনু, আমি যদি হঠাৎ কোন বিপদে পড়ি, বাজ পড়ার মত আচমকা কোন অঘটন ঘটে যায়, যদি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই, তাহলে কি হবে ?

অনু ॥ এমন কিছু ঘটতেই পারে না।

পরী ॥ তবু যদি ঘটে ?

অনু ॥ তাহলে দুজনে মিলে আবার নতুন করে গড়বার চেষ্টা করবো।

পরী ॥ (আন্তরিকতার সঙ্গে) আমি তোমার মুখে এই উত্তরই আশা করেছিলুম অনু, আমার বন্ধুরাও নিশ্চয় এই কথাই বলবে।

অনু ॥ নিশ্চয়ই বলবে।

[উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে প্রফেসর কৃতান্ত সান্যাল ও অনিমেষ রায়ের প্রবেশ। সান্যাল মধ্যবয়স্ক ! গোলগাল ফর্সা বেঁটে মানুষটি। চোখে মোটা সেল ফ্রেমের চশমা, হাতে চামড়ার ব্যাগ। অনিমেষ যুবক—লম্বা বোকাটে চেহারা। পরণে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। বাঁ কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ।]

প্রফেসর ॥ না অনিমেষ, তোমার অধিকারের বাইরে তুমি তর্ক চালাচ্ছ। কাঁথাটা শিল্পসামগ্রী হলেও তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক যে মূল্যায়ন

আজ হতে চলেছে সে সম্পর্কে তোমার ধারণা নিতান্তই অজ্ঞজনোচিত।

পরী॥ কি ব্যাপার প্রফেসর সান্যাল? আপনাকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে!

প্রফেসর॥ এই যে পরীক্ষিৎ, তুমিই বল। তোমার ওপিনিয়ন যথেষ্ট মূল্যবান বলে আমরা সবাই স্বীকার করি। তুমিই বল, যে কোন দেশের কাঁথার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে সে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে কিনা?

পরী॥ এ বিষয়ে আপনার কথাই এখানে শেষ কথা। অনিমেষ মানতে চাইছে না বুঝি?

অনিমেষ॥ মানতে চাইব না কেন—উনি ঠিক বোঝাতে পারছিলেন না কিনা! তোমার ব্যাখ্যায় বিষয়টা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল।

পরী॥ আমি আবার ব্যাখ্যা করলাম কখন! আর আমি এসবের জানিই বা কি!

অনিমেষ॥ কেন বিনয় করছ পরীক্ষিৎদা। আচ্ছা, নাইবা করলে ব্যাখ্যা। প্রফেসর সান্যালই না হয় ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু তুমিই তাঁর ব্যাখ্যার পথটা প্রশস্ত করে দিলে, সেটাও কম কথা নয়।

পরী॥ রাজ্যেশ্বর, ধনাদাকে বল আরও ড্র রাউণ্ড বেশী।

রাজ্যেশ্বর॥ বলছি স্যার— [রাজ্যেশ্বরের প্রস্থান]

অনু॥ প্রফেসর সান্যাল, আপনার থিসিসের সাব্জেক্টটা যেন কি?

পরী॥ জাননা বুঝি! বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও কাঁথা। প্রফেসর সান্যাল বাংলাদেশের একমাত্র কাঁথা বিশেষজ্ঞ।

অনু॥ হাউ ইনটারেস্টিং!

প্রফেসর॥ কাঁথা বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ। একাদশ শতাব্দী থেকে বিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার কাঁথা ডিটেল্ড স্টাডি করে

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্ত্তনের এমন কয়েকটা সূত্র আমি আবিষ্কার করেছি যাতে আমি আশা করছি একটা আলোড়ন সুরু হয়ে যাবে। শুধু কি তাই, যে কোন দেশের কাঁথার স্পেসিয়ালাইজড সারভে করে সেই দেশের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ও শ্রেণী সংঘাতের স্বরূপ পর্য্যন্ত বলে দেওয়া যায়। এই অবহেলিত বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা সুরু করেছি। অনেকে আমাকে নিরুৎসাহ করেছে। কিন্তু আমি দমি নি। (গলা আবেগে ভারী হয়ে আসে) অর্থ আর খ্যাতি আমি চাইনা, বঙ্গভারতীর দীন সেবক আমি, আমাব চেষ্টায় জ্ঞান সাধনাব কোন নতুন দিগন্ত যদি খুলে দিতে পাবি তাহলেই আমি ধন্য।

অনিমেষ॥ আমাকে মাফ করবেন প্রফেসর, আমি একটু ধৃষ্টতা করে ফেলেছি।

[রাজ্যেশ্বব ফিরে এসে এদের থেকে একটু দূরে সম্মান-জনক ব্যবধান রেখে একটি চেয়াবে বসে]

অনু॥ আপনি কিছু মনে করবেন না প্রফেসর, অনিমেষদাটার বড় তর্ক কবা স্বভাব, কিছু না বুঝেই আবোল-তাবোল তর্ক করে। স্টাডি কবতে পারলে কাঁথা থেকে অনেক কিছু জানা যায়। (অনিমেষকে) যেমন আমার পিসিমা। পিসেমশায় অনেক পয়সা রেখে গেছেন। পিসিমাব বাতিক হচ্ছে বেশমী সুতোর নক্সাকাটা কাঁথা তৈরী করে আত্মীয় স্বজনকে বিলোনো। আমিও একখানা পেয়েছি। এখন পিসিমাব কাঁথা আর আমাদের ভিখু চাকরের বৌয়ের তৈরী কাঁথা পাশাপাশি বিচার করে আমার মত লেম্যানও বলে দিতে পারে যে আমাদেব সমাজে দুটো শ্রেণী আছে। অর্থনৈতিক অবস্থা যাদের একেবারে বিপরীত। ঠিক না প্রফেসর?

প্রফেসর॥ ইন্টেলিজেন্ট, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, এ প্রেটি লিট্‌ল্ জিনিয়াস।

[ট্রেতে পাঁচ কাপ চা ও এক ডিস খাবার নিয়ে ধনঞ্জয়ের প্রবেশ। চায়ের পেয়ালাগুলি এক এক করে নামিয়ে রেখে সবশেষে খাবারের ডিস্‌টা রাজ্যেশ্বরের সামনে নামিয়ে রাখে ঠিক করে। রাজ্যেশ্বর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]

বুঝলে অনু, তোমার মত ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়েরা যদি আমার মত নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভারতীর সেবায় এগিয়ে আসে তাহলে—তাহলে—চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।

নঞ্জয় ॥ (বেরোতে বেরোতে রাজ্যেশ্বরকে) গিলচে দেখ, মড়াখেকো মামদো!

পরী ॥ ওকি অনিমেষ, মুখ কাঁচুমাচু করে বসে কেন। অত মন খারাপ করবার মত কিছুই হয়নি।

অনু ॥ সামান্য ঘটনায় কেন যে মন খারাপ কর ছেলেমানুষের মত?

প্রফেসর ॥ না না অনিমেষ, পরীক্ষিৎ যখন তোমাকে অনুরোধ করছে. তারপরও তোমার মন খারাপ করে থাকা ঠিক নয়। এই দেখ আমি কেমন ইজি হয়ে গেছি।

অনিমেষ ॥ না না মন খারাপ করিনি। একটা নতুন ছবি এঁকেছি, তাই ভাবছিলাম আপনাদের দেখাব কি না।

পরী ॥ দেখাবে মানে—আলবাৎ দেখাবে, হাজার বার দেখাবে।

প্রফেসর ॥ শুধু দেখাবে মানে, দেখানো তোমার কর্ত্তব্য।

অনু ॥ অনিমেষদা, আমার যে কি ভীষণ ইচ্ছে করছে দেখতে!

অনিমেষ ॥ তবে দেখাই।

[অনিমেষ ব্যাগ থেকে একখানা গোল পাকান কাগজ বার করে ষ্টেজের পেছনদিকে গিয়ে দর্শকদের দিকে খুলে ধরল। একটা কিম্ভূতকিমাকার অর্থহীন কিছু আঁকা রয়েছে। সবাই মিনিটখানেক চুপ করে দেখবার পর—]

প্রফেসর ॥ এটা কি অনিমেষ ?

অনিমেষ ॥ আজ্ঞে ইতালীর ঘুটেচেল্লী আর ঘানার জোসেফ হাম্বা-হা নিওরিয়ালিষ্টিক ইমপ্রেশনিজম নিয়ে যে লেটেষ্ট রিসার্চ করছেন, সে এ্যাঙ্গেল থেকেই ছবিটা আঁকবার চেষ্টা করেছি।

[ইতিমধ্যে নাট্যকার-পরিচালক নিখিল নাগ এক পা এসে দাঁড়িয়েছে। অতি সাধারণ চেহারা। গায় মেজাই প্যাটার্নের সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়জামা। চো রোল্ডগোল্ডের চশমা]

প্রফেসর ॥ আরে নাট্যপরিচালক এস ! এই দেখ অনিমেষের লেটেষ্ট ছবি কিছু বুঝছ ?

নিখিল ॥ বোঝবার কিছুই নেই, শিয়ার ম্যাডনেস্।

অনু ॥ অনিমেষদাটা একটা বদ্ধ পাগল !

প্রফেসর ॥ তোমরা যখন বলেই ফেললে, তখন আমার আর বলতে ব কি ? আমার তো মনে হচ্ছে হরিব্‌ল ওয়েসটেজ অব কালার, পেপা এ্যাণ্ড এনার্জি।

পরী ॥ আপনারা ভুল করছেন। আমার মনে হয় কোন জিনিসকে এভাবে নস্যাৎ করা উচিৎ নয়। আমরা হয়তো এর রস গ্রহণ করবা ঠিক উপযুক্ত নই, এমনও তো হতে পাবে। দেখি অনিমেষ ছবিটা একবার, (হাতে নিয়ে ভাল করে দেখে) চোখের পক্ষে কালা কম্বিনেশনটা তো আমার বেশ সুদিং বলে মনে হচ্ছে।

সবাই ॥ কই দেখি দেখি ভাল করে দেখি একবার। নিশ্চয়ই এদিক আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। কালারের এফেক্টটা ভাল করে লক্ষ্য করা দরকার।

[সবাই হুমড়ি খেয়ে দেখতে থাকে]

প্রফেসর ॥ হুঁ, তোমার চোখ আছে পরীক্ষিৎ। ভাল করে দেখলে সুধীন দত্তের কবিতার মত একটা দুর্বোধ্য আমেজ বেশ ফিল করা যায়।

নিখিল ॥ শেক্সপীয়রের ট্রাজেডির ইনটেনসিটির মত।

অনু ॥ একটা অদ্ভুত পারপিচুয়ালিটি—তাই না?

[রাজ্যেশ্বর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খুক্ খুক্ করে হেসে উঠে]

পরী ॥ হাসলে কেন রাজ্যেশ্বর?

রাজ্যেশ্বর ॥ আলজিভটা সুড় সুড় করছিল স্যার।

নিখিল ॥ আলজিভ সুড়সুড় করলে কেউ হাসে না, হাঁচে।

রাজ্যেশ্বর ॥ এখন থেকে হাঁচব স্যার।

পরী ॥ অনিমেষ, এক্সপার্ট ওপিনিয়ন না পেলে কোন জিনিসেরই মূল্য ঠিক যাচাই করা যায় না। তোমার ছবির একজিবিসন করনা কেন?

অনিমেষ ॥ ইচ্ছে আছে কিন্তু খরচ বড় বেশী।

পরী ॥ কত খরচ?

অনিমেষ ॥ তা ভাল জায়গায় দিন দশেক ধরে চালাতে গেলে পাঁচশো টাকার কমতো নয়ই।

পরী ॥ বেশ, খরচ আমি দেব, তুমি ব্যবস্থা কর। বাছাই করা সব ছবি দেবে।

অনিমেষ ॥ (পরীক্ষিতের হাত ধরে) তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ দেব পরীক্ষিৎদা।

[পরীক্ষিতের পাশে বসে সিগারেট ধরাবার উপক্রম করে]

পরী ॥ অনিমেষ, আমার মাথাটা বড় টিপ টিপ করছে।

[অনিমেষ লজ্জিত হয়ে সিগারেটের পকেটে রেখে দেয়]

অনু ॥ কি যে ছাই পাঁশ খাওয়া অভ্যেস, আমার তো গন্ধেই বমি আসে।

নিখিল ॥ আর আমার হিরোইন সুচরিতার সিগারেটের গন্ধ না পেলে মাথা ধরে।

পরী ॥ অভ্যেসটা কিন্তু কোন মহিলার পক্ষেই শোভন নয়।

নিখিল ॥ আমিও তো সেই কথাই বলি, কিন্তু শুনছে কে ?

প্রফেসর ॥ তোমার রিহার্সাল এগোচ্ছে কেমন ?

নিখিল ॥ এতদিন ঠিক এগোচ্ছিল না—এবার এগোবে। হিরো নিয়েই যত গণ্ডগোল। যে লোকটা করছিল সে স্ট্যানিস্লাভস্কী স্কুলেব ডিরেকশন ঠিক বোঝে না, কথায় কথায় বাজে তর্ক কবে। দিলাম বাদ দিয়ে। নিজেই এবার করব ঠিক কবেছি।

অনু ॥ এবার গ্রুপে মিস্ত্রিবেব সত্যিই কপাল পুড়ল। নিখিলদা নিজে অভিনয় করতে নামলে আর কেউ ওব থিয়েটার দেখতে যাবে !

পরী ॥ আর সব ব্যবস্থা—

নিখিল ॥ মিউজিক কোকন্দ দত্তের মত কনভেনশনাল রাস্তায় যাবে না। একটা বাড়ী তৈরীর যাবতীয় শব্দ যেমন ছাদ-পেটাই বর্গাথাটাই সব টেপবেকর্ড করে এনেছি। জায়গা বুঝে লাগাতে পাবলে ফার্ষ্টক্লাস এফেক্ট দেবে। যেমন নায়ক-নায়িকার ভালবাসাবাসিব দৃশ্যে ওসব বেহালা বাঁশীব প্যানপ্যানানি না দিয়ে ছাদপেটাইয়ের শব্দ দিলে তাদেব হৃদয়ের কি বলে যেন—ঐ দপদপানিটা সুন্দর ফুটবে।

অনু ॥ স্প্লেনডিড !

নিখিল ॥ আর সেট করেছি সিম্বোলিক, যেমন, ঘরের দৃশ্যে অনিমেষের আঁকা, একটা ইম্প্রেসানিষ্ট দরজা শুধু থাকবে ষ্টেজেব ওপর। আর কিছু নয়। মাথা থাকে বুঝে নাও, না বোঝ চেপে যাও। আলোর ব্যাপারে যা করেছি, সে রকম এক্সপেরিমেণ্ট আমার মত দুঃসাহসী পরিচালক ছাড়া কেউ করতে সাহস পাবে না। দুটো দৃশ্যে গোটা ষ্টেজ পিচ ডার্ক রেখে

শুধু অডিটোরিয়ামে আলো জ্বালিয়ে অভিনয় হবে। করুক দেখি গুপে মিত্তির, কেমন বুকের পাটা!

প্রফেসর ॥ কিন্তু একবারে এত নতুন জিনিস লোকে নিতে পারবে কি?

নিখিল ॥ কেন পারবে না! শোয়ের আগের দিন একটা পার্টিতে সাংবাদিক-দের ডেকে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলেই চলবে।

[ভিতর থেকে কুঁই কুঁই করে কুকুরের বাচ্চার ডাক শোনা যায়]

অনু ॥ কুকুরের বাচ্চা না?

পরী ॥ ওঃ, তোমাদের বলিনি বুঝি। গ্রে হাউণ্ডের একটা বাচ্চা আনিয়েছি ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছে। যাওনা দেখে এস।

অনু ॥ তুমি যে কি দুষ্টু, পরীক্ষিৎদা! একটা লাভ্‌লী লিটল পাপি আনিয়েছ, আর আমাকে কিছু বলনি? জান কুকুর আমি কত ভালবাসি! চল না অনিমেষদা দেখে আসি!

অনিমেষ ॥ বেশ তো চল।

অনু ॥ নিখিলবাবু আপনিও চলুন না। প্রফেসর সান্যাল—

প্রফেসর ॥ আমি বরং এখানেই থাকি।

পরী ॥ তোমরা তা হলে দেখে এসো। আমাকে একটা জরুরী ফোন করতে হবে।

[মৃদু গুঞ্জন তুলে অনু, অনিমেষ ও নিখিল ভেতরে এগোয়। অনুর গলা শোনা যায়—জান অনিমেষদা, আমার না একটা সুন্দর স্প্যানিয়েল ছিল; সেটা না ··· । পরীক্ষিৎ টেলিফোনের দিকে এগোয়।]

প্রফেসর ॥ পরীক্ষিৎ!

পরী ॥ এক মিনিট প্রফেসর। (টেলিফোন ডায়াল করে) হ্যাঁ, ৩৩-২৫৭৬-কে? ও, হ্যাঁ আমি পরীক্ষিৎ। তুমি ষ্টার্ট কর। মিনি পনেরো লাগবে পৌঁছুতে। কি বললে? ও, আচ্ছা, আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি। (ফোন নামিয়ে) এবার বলুন প্রফেসর।

প্রফেসর ॥ তোমাকে বলেছি পরীক্ষিৎ, কলেজ থেকে আমি তিন মাসে ছুটি নিয়েছি। উদ্দেশ্যটা তোমাকে বলা হয়নি। থিসিসটা তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যই ছুটিটা নিয়েছিলাম। তা শুনে তুমি খুশী হবে, থিসিস আমি সাবমিট করেছি।

পরী ॥ আগে বলেননি কেন? খবরটা সবাইকে জানান দরকার, ইট উইল বি এ গ্র্যাণ্ড বিট অব নিউজ।

প্রফেসর ॥ না না পরীক্ষিৎ, এখন ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই। অবশ্য ডক্টরেট পাওয়া বা না পাওয়ায় আমার সাহিত্যসাধনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তবে একটা রিকগনিশন্ পেলে অনেক বাজে লোকের মুখ বন্ধ হবে এই আর কি! তাই বলছিলাম কি, ইউনিভার্সিটির সুমথনাথ বোস, উনি আমার পেপারের একজন এগজামিনার, তোমার তো বিশেষ পরিচিত, ওঁকে যদি একটু বলে রাখ—

পরী ॥ নিশ্চয়ই বলব। কাল আমি নিজে গিয়ে বলে আসব।

প্রফেসর ॥ মস্তবড় উপকার করলে পরীক্ষিৎ। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর এই সঙ্গে থিসিসটা যদি ছাপিয়ে ফেলতে পারতাম, তাহলে জ্ঞানসাধনার একটা অনাবিষ্কৃত দিগন্ত—যাক্ তা কি আর হবার জো আছে! অনেক টাকার ধাক্কা।

পরী ॥ আপনি কি বলছেন প্রফেসর, টাকার জন্য এতবড় একটা কাজ আটকে থাকবে! আমি ছাপাব আপনার বই।

প্রফেসর ॥ বঙ্গভারতী তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলেন পরীক্ষিৎ।

াজ্যেশ্বর ॥ হঁ্যা—চ্চো…(খুব জোরে হাঁচি)

রী ॥ কি হল রাজ্যেশ্বর ?

াজ্যেশ্বর ॥ আজ্ঞে স্যার হাঁচি, আলজিভটা সুড়্ সুড়্ করছিল কিনা !

[অনু, অনিমেষ ও নিখিল ফিরে আসে]

নু ॥ ও পরীক্ষিৎদা, ইট্'স রিয়েলি লাভলি, লাভলিয়ার দ্যান দি লাভলিয়েস্ট ! অনিমেষদা তো আর একটু হলেই ছবি আঁকতে বসে যাচ্ছিল। নেহাৎ আমি বললাম কুকুরের ইমপ্রেসানিষ্ট ছবি খুব সুবিধের হবেনা, তাই চটে গিয়ে…

অনিমেষ ॥ চটবারই কথা ! আমি কি সাধারণ ছবি আঁকতে পারিনা ভেবেছ ?

অনু ॥ পারো তো আঁকোনা কেন ?

অনিমেষ ॥ সাধারণ ছবি শুধুই ছবি। ছবি যেখানে ছবির বেশী আরো কিছু, সেখানেই না সে সত্যিকারের ছবি ! বোঝা এবং না বোঝা বা কিছু বোঝা বা কিছু-কিছু না বোঝার মাঝখানে যে রূপময় জগৎ সেখানেই আমরা সন্ধান চলাচ্ছি। সেখানেই আমাদের একসপেরিমেণ্ট, বুঝলে ?

পরী ॥ তোমার তর্ক এখন রাখ অনিমেষ। একটা সেন্সেশেনাল নিউজ আছে। অবশ্য এখন সেটা ডিসক্লোজ করা হবেনা। প্রফেসর মাস দুয়েকের মধ্যেই খবরটা পাওয়া যাবে কি বলেন ?

প্রফেসর ॥ সেই রকমই তো আশা করছি।

পরী ॥ তাহলে নিখিলের থিয়েটারের দিনটাকে আপনার ইয়ে প্রাপ্তির উৎসব হিসেবে আমরা উদ্‌যাপন করব। নিখিল, তোমার থিয়েটার কবে ?

নিখিল ॥ ডেট এখনো ফিক্স করতে পারিনি। সবই তৈরী, শুধু হাজারখানেক টাকার জন্য বোর্ড বুক করা আর খুচরো খরচগুলো আটকে আছে।

পরী ॥ বেশ টাকাটা কাল নিয়ে যেও। মাস আড়াই পরে একটা ভাল ডেট নেবে। আই ওয়াণ্ট ইট টু বি এ গ্রাণ্ড অকেশন।

নিখিল ॥ আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না পরীক্ষিৎ। নবনাট্য অন্দোলনের ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয়, তাহলে আমার এই বোল্ড এক্সপেরিমেণ্ট-এর কথা সেখানে অবশ্যই স্থান পাবে। নাটকের কি বলে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।

রাজ্যেশ্বর ॥ হ্যাঁচ্ছো—

[সবাই কট্‌মট্ করে রাজ্যেশ্বরের দিকে তাকায়। হন্তদন্ত হয়ে বিকাশ পালের প্রবেশ।]

বিকাশ ॥ এই যে মিঃ সেন, নমস্কার। এই দেখুন প্রসপেক্‌টাস আর মেমোরেণ্ডাম অব্ এসোসিয়েশনের ড্রাফ্‌ট। আমার কাজে কোন ফাঁকি পাবেন না মিঃ সেন।

পরী ॥ (কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ে) ওরিয়েণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিঃ।

অনু ॥ এটা কি পরীক্ষিৎদা ?

পরী ॥ তোমাদের সঙ্গে এর পরিচয় নেই। এস আলাপ করিয়ে দিই। ইনি বিকাশ পাল, এ স্মার্ট ইয়ং ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট। প্রফেসর কৃতান্ত সান্যাল, আর্টিষ্ট অনিমেষ রায়, ইনি নিখিল নাগ ট্যলেনটেড প্লেরাইট এণ্ড ডিরেকটর ; এণ্ড দিস্ ইজ্ মাই সুইট লিটল্ ডারলিং অনুরাধা।

বিকাশ ॥ নমস্কার টু ইউ অল্। আগে মিঃ সেনের সঙ্গে আমার বিজনেস টকটা সেরে ফেলি, তারপর গল্পগুজব করা যাবে, কেমন ?

সকলে ॥ বেশতো, বেশতো, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই !

[নিখিল চুপচাপ বসে পরীক্ষিতের ও বিকাশের কথা শোনে। প্রফেসর একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটান।

অনিমেষ ও অনু পেছেন দিকের দেওয়ালে টাঙ্গান একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলাবলি করে।]

বিকাশ ॥ আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছেন মিঃ সেন ?

পরী ॥ এখনো কিছুই ঠিক করিনি। আপনার কাজ কতদূর এগোলো বলুন ?

বিকাশ ॥ পদ্মশ্রী পুণ্ডরিকাক্ষ মজুমদারের উলুবেড়ের জমিটা ফ্যাক্টরী সাইট হিসেবে দেখে রাখা হয়েছে। মিঃ মজুমদার ডিরেক্টর হতে রাজী হয়েছেন। জমির দামের অর্দ্ধেক নগদ দিলেই চলবে। বাকী অর্দ্ধেক শেয়ারের দামের সঙ্গে এড্‌জাষ্ট করে নেওয়া হবে। এখন শুধু ম্যানেজিং ডিরেক্‌টর হতে আপনার সম্মতি আর সেই সঙ্গে সামান্য দুলাখ টাকার একখানি চেক পেলেই কাজে নামা যায়। আই ক্যান এসিওর ইউ মিঃ সেন, ইট উইল বি এ ভেরী প্রফিটেবল ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট।

পরী ॥ আচ্ছা ভেবে দেখি। আপনি কাল একবার আসুন।

বিকাশ ॥ ভেবে দেখবার কিছু নেই মিঃ সেন। (প্রস্‌পেক্টাসের স্থান বিশেষ দেখিয়ে) এই দেখুন, ইনডাস্ট্রীয়াল ওয়ার্ল্ড-এর দিকপালরা সবাই এতে আছেন। আপনাদের টাকা আর আমার অর্গানিজেশন্, অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে মিঃ সেন, অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে। শুধু প্রফিট নয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি, ন্যাশন্যাল ওয়েলফেয়ার, আনএমপ্লয়মেণ্ট প্রোবলেম-এর সমাধান। তাই বলছিলাম শুধু প্রফিট নয়—প্রফিট এ্যাণ্ড পোপুলারিটি। নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠবে—উই স্যাল নেম ইট আফটার ইউ—পরীক্ষিৎনগর।

পরী ॥ না-না—সে-কি কথা !

প্রফেসর ॥ হোয়াই নট ?

নিখিল ॥ বাঙ্গালীর ছেলে যে ইন্ডাস্ট্রি বোঝে তার প্রমাণ তোমাকে দিতে হবে পরীক্ষিৎ।

বিকাশ ॥ ভেবে দেখুন মিঃ সেন, আপনার বন্ধুরা সবাই চান যে আপনি একটা বিরাট কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, আপনার নাম সবাই জানুক, নামজাদা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিষ্টদের পাশে একটা নতুন নাম জ্বলজ্বল করে উঠুক—পরীক্ষিৎ সেন।

অনু ॥ উঃ—ভাবতেও আমার কি ভয়ানক উত্তেজনা হচ্ছে। দেখ অনিমেষদা, হাতের লোমগুলো কি রকম খাড়া হয়ে উঠেছে।

অনিমেষ ॥ রাজী হয়ে যাও পরীক্ষিৎদা, রাজী হয়ে যাও!

পরী ॥ আমি কি রাজী হবনা বলেছি! বলেছি একটু ভেবে দেখি।

অনু ॥ এতবড় আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করার কোন অধিকার তোমার নেই। এক্ষুণি তোমায় রাজী হতে হবে।

প্রফেসর ॥ শুভস্য শীঘ্রম, অশুভস্য কালহরণম্। শুভকাজে দেরী কর না পরীক্ষিৎ।

বিকাশ ॥ বলুন, বলুন, আপনারাই বলুন।

পরী ॥ বেশ রাজী। কাল সব কাগজপত্র নিয়ে আসবেন, সই করে দেব, চেকটাও কালই পাবেন।

বিকাশ ॥ থ্রি চিয়ার্স ফর পরীক্ষিৎ সেন এণ্ড হিজ্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইনেষ্টি।

সকলে ॥ হিপ, হিপ, হুরে—

রাজ্যেশ্বর ॥ (সকলের উল্লাস ছাপিয়ে) হ্যাঁ—চ্ছো—

[রাজ্যেশ্বরের হাঁচিতে এদের উল্লাস ভঙ্গ হয়। পরীক্ষিৎ ছাড়া সবাই বিরক্তভাবে তার দিকে তাকায়, রাজ্যেশ্বর ভ্রূক্ষেপ না করে কোঁচার খুটে নাক মুছতে থাকে]

পরী ॥ বাই দি বাই, শৈলেনতো এখনো এলো না।

প্রফেসর ॥ শৈলেনবাবুর আসবার কথা আছে নাকি ?

পরীক্ষিৎ ॥ হ্যাঁ, আচ্ছা শৈলেনকে আপনাদের কেমন মনে হয় ?

বিকাশ ॥ শৈলেনবাবু ? আপনার পার্টনার শৈলেনবাবুতো ! আপনার মুখেই ওঁর নাম শুনেছি। আলাপ নেই যদিও, তাহলেও আপনার বন্ধু যখন তখন নিশ্চয়ই চমৎকার লোক। ইউ কান্ট মেক এ ব্যাড চয়েস।

অনু ॥ হ্যাঁ, চমৎকার ভদ্রলোক, এমন সব মজার মজার কথা বলেন। আমার তো ওঁর সঙ্গে গল্প করতে ভারী ভাল লাগে।

প্রফেসর ॥ খুব উইটি আর ইন্টেলিজেন্ট। পরীক্ষিতের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।

অনিমেষ ॥ একজন উঁচুদরের আর্টক্রিটিক। আর্ট সম্পর্কে শৈলেনবাবুর মত স্বচ্ছ ধারণা খুব কম লোকেরই দেখেছি। এমন সুন্দর সব টুকরো টুকরো মন্তব্য করেন আর্ট সম্পর্কে যে সেগুলো পুরোপুরি বোঝা না গেলেও এটুকুও বেশ বোঝা যায় যে খুব হৃদয়বান না হলে এমন বলিষ্ঠ শিল্প দৃষ্টি থাকা সম্ভব নয়।

নিখিল ॥ নাটক সম্পর্কেও তাই—

পরী ॥ থাম, কতটুকু জান ওর তোমরা ? লোকটা একটা পয়লা নম্বরের স্কাউনড্রেল, ওর সবটাই ভেক। হৃদয় বলতে কোন পদার্থ ওর নেই। দরকার হলে লোকের যে কোন সবনাশ করতে পারে। এ রকম বদমাস আমার জীবনে দ্বিতীয়টি আমি দেখিনি।

[কিছুক্ষণ সবাই বোকার মত চুপ করে থাকে। তারপর—]

অনু ॥ হ্যাঁ, ভদ্রলোকের কথাবার্তাগুলো কেমন যেন ইয়ে ইয়ে। তুমি আমায় আগে বলনি কেন, তাহলে আমি ওর সঙ্গে কথাই বলতাম না। আপনারা কেউ যেন বেশী খাতির করবেন না। ওসব লোকেরা কি মতলবে ঘোরে তার তো ঠিক নেই !

প্রফেসর ॥ অনধিকার চর্চা আর এক বদ অভ্যাস। সব বিষয়ে মতামত জাহির করা চাই। না পরীক্ষিৎ, এমন লোককে পার্টনার করে মোটে ভাল করনি।

অনিমেষ ॥ এখন বুঝতে পারছি উনি আমাকে ঘুরিয়ে গালাগাল দেন। তা আর্ট সম্পর্কে ওর মন্তব্যগুলো ওরকম দুর্বোধ্য মনে হয়।

নিখিল ॥ নাটকের ব্যাপারেও দেখুন—

[হঠাৎ শৈলেন ঢুকতে সবাই চুপ করে যায়। বলি... বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা]

পরী ॥ এই যে শৈলেন, এসে গেছো। আপনারা সবাই শুনুন, আজ যে সব প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের দিয়েছি তার মর্যাদা রক্ষা করা হয়ত কোনদিনই আমাব পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনারা আমাকে মাপ করবেন। আমি আজ কপর্দকশূন্য। আমার যা কিছু ছিল—বাড়ী, গাড়ী, ব্যবসা, ব্যাঙ্কের টাকা সব আমি হারিয়েছি। এখবর আমি আজই পেয়েছি। তবু যে কেন শেষ মুহূর্তে বড়মানুষী করবার মোহটা ছাড়তে পারলাম না! আপনারা আমাকে মাপ করবেন। অমু তোমাকে নিয়ে গাড়ী করে বেড়ানো, নেকলেস উপহার দেওয়া এসব আজ আমার কাছে অবাস্তব কল্পনা। তবু—। প্রফেসর, সুমথনাথ বোসের কাছে আপনার ডক্টরেটের তদ্বির করবার মুখ আর আমার নেই। (প্রফেসর জিভ কাটেন) আপনার থিসিস ছাপিয়ে প্রকাশ করব বলেছিলাম—বুঝতেই পারছেন সেটা আর হয়ে উঠবে না। নিখিল, তোমার নাটকের প্রযোজক হবার সৌভাগ্য আমার হল না। অনিমেষ, আমি তোমার ছবির এক্জিবিশন করতে হয়তো পারলাম না, তবু বলছি, তোমার ছবির যথার্থ কোন মূল্য থাকলে একদিন না একদিন সে মূল্য তুমি পাবেই। বিকাশবাবু, লেট ইওর ইন্ডাস্ট্রি প্রসপার উইথ

সাম আদার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। (একটু থেমে) আর শুনুন, আমার সর্বনাশের জন্য দায়ী এই শৈলেন। শয়তানী করে আমার শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত সে আত্মসাৎ করেছে। কাল আমি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব আর আমার জায়গায় বসবে—উঃ—

[দু'হাতে কপাল চেপে নাটকীয় ভঙ্গিতে পরীক্ষিৎ ভেতরে যাবার দরজার দিকে এগোয়। শৈলেনের মুখে মৃদু হাসি]

রাজ্যেশ্বর ॥ স্যার—

পরী ॥ আমাকে কিছু বলবে রাজ্যেশ্বর ?

রাজ্যেশ্বর ॥ টাকাটা রেখে দিন স্যার, কাজে লাগবে। (টাকা কুড়িটা পরীক্ষিতের হাতে গুঁজে দেয়)

পরী ॥ কিন্তু তোমার চলবে কি করে ?

রাজ্যেশ্বর ॥ ঠিক চলে যাবে স্যার, ঠিক চলে যাবে। আচ্ছা চলি স্যার, অনেক জ্বালিয়েছি।

[রাজ্যেশ্বরের প্রস্থান। পরীক্ষিৎ কয়েক সেকেণ্ড রাজ্যেশ্বরের গতিপথের দিকে তাকিয়ে থেকে ভেতরে চলে যায়। শৈলেন ছাড়া আর সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে। তারপর গোটা দলটা একটা মিশ্র হেঁ হেঁ জাতীয় আওয়াজ তুলে শৈলেনের দিকে এগোয়]

বিকাশ ॥ কন্‌গ্রাচুলেশনস, কন্‌গ্রাচুলেশনস্, শৈলেনবাবু !

শৈলেন ॥ দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

বিকাশ ॥ কাকে ? আমাকে ? আপনি আমাকে চিনবেন কি করে ? আলাপ তো হয় নি !

শৈলেন ॥ হুঁ !

নিখিল ॥ আসুন, আলাপ করিয়ে দি। ইনি বিকাশ পাল, নতুন একটা কোম্পানী অর্গানাইজ করবার চেষ্টা করছেন—ওরিয়েণ্টাল ইন্‌জিনিয়ারিং প্রোডাকটস প্রাইভেট লিঃ। পরীক্ষিৎ ম্যানেজিং ডিরেকটর হতে রাজী হয়েছিল।

শৈলেন ॥ কোম্পানী? কো-ম্পা-নী? (হাত তুলে) মারব টেনে এক থাপ্‌পর।

প্রফেসর ও নিখিল ॥ করেন কি, করেন কি!

বিকাশ ॥ এ্যাঁ, ভদ্রলোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় শেখেন নি!

শৈলেন ॥ শেখাচ্ছি, তোমাকে ভাল করেই শেখাচ্ছি। জোচ্চোরের জাসু। তিনতিনবার গণেশ উলটে নাম পাল্‌টে এসে ভেবেছ পার পাবে। বেরোও, বেরোও এক্ষুণি, নইলে পুলিশ ডাকব। রাসকেল!

[শৈলেন তেড়ে যায়। নিখিল ও অনিমেষ তাকে আটকায়, বিকাশের বেগে প্রস্থান]

বেটা বদমাস! মার্কেটের পুরণো লোক সবাই ওকে চেনে। তাই এখন নতুন মক্কেল ধরবার চেষ্টায় আছে। পরীক্ষিৎটাও যেমন হাঁদাগঙ্গারাম গবেট!

অনু ॥ ভাগ্যিস আপনি এসে পড়েছিলেন শৈলেনদা, না হলে ঐ জোচ্চোরটা আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়তো। পরীক্ষিৎদাটা সত্যিই বোকার একশেষ। একটুও যদি বুদ্ধি থাকত। আমি কিন্তু আপনাকে শৈলেনদা বলেই ডাকব!

শৈলেন ॥ আপদ! (অস্ফুটে)

অনু ॥ কে?

শৈলেন ॥ ঐ জোচ্চোরটা। যাক, এবার বসুন সবাই আরাম ক'রে, আমাদের নতুন বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করে নেওয়া যাক।

প্রফেসর ॥ নৈতিক চরিত্র বলতে আমাদের আর কিছু বাকী রইল না শৈলেনবাবু। জাল জোচ্চোরীতে দেশটা একেবারে ছেয়ে গেছে। এইতো সেদিন একটা লোক সপ্তদশ শতাব্দীর জিনিস বলে একটা কাঁথা আমাকে দেড়শো টাকায় বিক্রী করে গেল। বিশ্বাস করে কিনলাম —বাড়ী ফিরে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি লোকটা আমায় ঠকিয়েছে!

শৈলেন ॥ কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কাঁথা!

অনিমেষ ॥ পরীক্ষিৎদা আপনাকে বলেননি, প্রফেসর সান্যাল বাংলাদেশের একমাত্র কাঁথাবিশেষজ্ঞ?

নিখিল ॥ হ্যাঁ, উনি থিসিস লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও কাঁথা —ডক্টরেটের জন্য।

শৈলেন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ, ননসেন্স, বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও কাঁথা! হাঃ—হাঃ আপনিতো শুনেছি বাংলার অধ্যাপকই নন, অথচ থিসিস লিখছেন বাংলায় তাও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও কাঁথা—হাঃ—হাঃ —হাঃ—হাঃ—

অনু ॥ হি—হি—হি—হি—

প্রফেসর ॥ (অসহায়ভাবে অনুকে) তোমরা হাসছ?

অনু ॥ হাসি পাচ্ছে যে, শৈলেনদা হাসছে যে!

শৈলেন ॥ (অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে) আচ্ছা প্রফেসর, একটা সত্যিকথা বলুনতো, এরকম একটা অদ্ভুত সাবজেক্ট বেছে নিলেন কেন?

প্রফেসর ॥ বাংলা সাহিত্যের এদিকটা একেবারেই অন্ধকার। যদি কোন নতুন আলোক সম্পাত করতে পারি—

শৈলেন ॥ শুধু কি তাই? আর কিছুই নয়?

প্রফেসর ॥ আর কি বলুন ! বাংলা সাহিত্যের সেবাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত ।

শৈলেন ॥ কেন ছলনা করছেন ? আচ্ছা, সুমথনাথ বোসের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, বলতে গেলে আমার এক রকম আত্মীয়ই হন, আপনি যাতে ডক্টরেট পান তার তদ্বির আমি করব। আপনার থিসিসও ছাপিয়ে বার কবব। এখন বলুনতো শুধুই কি সাহিত্যসেবা ? ডক্টরেট পেলে আর কোন লাভের আশা নেই ?

প্রফেসর ॥ তা যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। ধরুন ডক্টরেট পেলে নতুন ইউনিভার্সিটিতে একটা ভালো পোষ্টও পেয়ে যেতে পারি। সেরকম একটা আশ্বাসও পেয়েছি। আর্থিক সুবিধে তাতে যে কিছু না হবে তা নয়। এইসব ভেবেইতো সুস্থ স্ত্রীকে পাগল বলে কাগজ থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে থিসিসটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেললাম। তবে আমার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু বঙ্গভারতীর সেবা। একটু দেখবেন শৈলেনবাবু —থিসিসটা যাতে—

শৈলেন ॥ ও-হো-হো—তাই বুঝি এমন একটা উদ্ভট সাবজেক্ট বেছে নিয়েছেন যাতে পরিশ্রম না করে শুধু সস্তা ষ্টাণ্টেই কিস্তি মাৎ করা যায় ! তা শুনুন, একটা ভাল পরামর্শ দি যাতে আপনার আর্থিক সুবিধা এর চেয়ে ঢের বেশী হবে।

প্রফেসর ॥ কি পরামর্শ শৈলেনবাবু ?

শৈলেন ॥ বৈরাগী কোম্পানীর সঙ্গে আমার খুব দহরম মহরম। ওদের দাদের মলমের দেশজোড়া চাহিদা।

নিখিল ॥ হবেইতো। দাদ প্রত্যেকেরই একবার না একবার হয়।

অনু ॥ হ্যাঁ, শুনেছি ভীষণ চুলকোয়।

শৈলেন ॥ হ্যাঁ, এর একমাত্র ওষুধ বৈরাগী কোম্পানীর দাদের মলম। দেখুন প্রফেসর, রাজি থকেনতো একটা এজেন্সী আপনাকে পাইয়ে দি। অবসর সময়ে দেখাশোনা করবেন, মাসে কিছু না হোক তিন চারশো টাকা বাড়তি আয়।

প্রফেসর ॥ হে-হে—তা যদি ব্যবস্থা করে দেন মন্দ কি!

[ইতিমধ্যে ধনঞ্জয় এসে কাপ ডিস কুড়োতে সুরু করেছে।]

শৈলেন ॥ একটু চা হলে কেমন হয়? আপনাদের চলবেতো?

সকলে ॥ বেশতো। হোক হোক। অমৃতে অরুচি—(ইত্যাদি)।

শৈলেন ॥ পাঁচ কাপ চা নিয়ে এসতো ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় ॥ (খেঁকিয়ে) এস, রসের নাগর এস! আর কি খাবে, লুচি? মোহনভোগ?

অনিমেষ ॥ তুমি কি বলছ ধনাদা?

ধনঞ্জয় ॥ যা বলছি ঠিক বলছি। আমাকে হুকুম করবার ধাষ্টামো হয় কেন? জানেনা বাবু ছাড়া কারো হুকুম আমি শুনিনে!

প্রফেসর ॥ আহা চটছো কেন। জান তোমার বাবুর বাড়ী আর সব সম্পত্তি এখন শৈলেনবাবুর? কাল উনি দখল নেবেন?

নিখিল ॥ তাহলেই দেখ ধনাদা, শৈলেনবাবুকে চটানো এখন তোমার উচিত নয়।

ধনঞ্জয় ॥ আমাকে আর উচিত শেখাতে হবেনা। ঘাস খেয়ে এতটা বছর বয়স হয়নি আমার। সব শুনেছি বাইরে থেকে। দখল নেবে? তা নিক না দখল। আমি কি বাবুর সম্পত্তি যে আমারও দখল নেবে? বাবু যেখানে যায় আমিও সেখানেই যাব। উচিত শেখাচ্ছে! নিজেরা শেখোগে যাও, আমাকে শেখাতে হবেনা। বাবুকে ভাল মানুষ পেয়ে

সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে আবার ওস্তাদি হচ্ছে! উনুনমুখো, হাড়িচাঁচা, গিরগিটি—

অনিমেষ ॥ ছি, ছি, ছি, ছি, কাকে কি বলছ!

ধনঞ্জয় ॥ একশোবার বলবো। কার ভয়ে বলবনা শুনি? বলে বলে সবকটাকে পাগল করে ছাড়ব—দেখি কে ঠেকায়! আসছি—রান্নাটা চাপিয়ে আসছি তোমাদের পিণ্ডি চটকাতে।

[ধনঞ্জয়ের বেগে প্রস্থান]

নিখিল ॥ দেখলেন শৈলেনবাবু, দেখলেন?

শৈলেন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ বাপস! দারুণ চটেছে!

অনু ॥ আপনি হাসছেন শৈলেনদা?

শৈলেন ॥ কাঁদবার তো কোন কারণ দেখছি না। এক চা খাওয়া হলনা, তা সিগারেটেই সেটা পুষিয়ে নেওয়া যাক। নিন ধরান।

[শৈলেনের কেস থেকে সিগারেট নিয়ে অনিমেষ, নিখিল ও প্রফেসর ধরায়]

শৈলেন ॥ (সিগারেটে টান দিয়ে) আঃ—

অনিমেষ ॥ চমৎকার! কোন ব্রাণ্ড?

শৈলেন ॥ চারমিনার।

অনু ॥ (জোরে শ্বাস টেনে) কি সুন্দর গন্ধ!

শৈলেন ॥ গন্ধটা আপনার কড়া লাগছে না?

অনু ॥ হ্যাঁ, বেশ মিষ্টি-কড়া লাগছে।

[ভেতর থেকে কুকুরের ডাক শোনা যায়]

শৈলেন ॥ পরীক্ষিৎকে আবার এ রোগে ধরল কবে থেকে! কুকুর পোষে বলেতো জানতাম না!

প্রফেসর । হালে ধরেছে। ওয়েষ্ট 'জার্মানী থেকে কুকুরের বাচ্চা আনিয়েছে একটা।

শৈলেন ॥ হোপলেস্!

অনু ॥ বড় চেঁচায় বাচ্ছাটা, না নিখিলবাবু? কুকুর আমি অপছন্দ করিনা, কিন্তু কুকুরের ডাক আমার মোটেই সহ্য হয় না। বড্ড ষ্ট্রেন হয় নার্ভে।

শৈলেন ॥ ও, আপনি নির্ডাক কুকুর পছন্দ করেন বুঝি?

অনু ॥ হি-হি-হি, শুনেছ অনিমেষদা নির্ডাক কুকুর, হি-হি-হি—

প্রফেসর ॥ নিখিল, আমাদের শৈলেনবাবু যে রকম সুপুরুষ আর witty তাতে তোমার নায়কের সমস্যা তো উনিই মেটাতে পারেন।

নিখিল ॥ উনি কি আর রাজী হবেন। কাজের লোক···

শৈলেন ॥ আপনি তো শুনেছি নাট্য পরিচালক। আপনি তা হলে অকাজের লোক?

নিখিল ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) মানে—তা ঠিক নয়। এও কাজ—অতি মহৎ কাজ। তবে কিনা আপনার নাট্যকলা হচ্ছে গিয়ে অবসরের ফসল। প্রচুর অবসর না থাকলে—

শৈলেন ॥ আপনার তবে প্রচুর অবসর?

নিখিল ॥ হ্যাঁ, মানে তা একরকম—

শৈলেন ॥ তা কবে থেকে আপনি নাট্যকলার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হয়েছেন?

নিখিল ॥ তা ধরুন ছেলেবেলা থেকেই বেশ ন্যাক্ ছিল।

শৈলেন ॥ না না, সে কথা নয়—কবে থেকে আপনি কোলকাতার বাজারে ঠিক ফুলফ্লেজেড সৌখীন নাট্য-পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন সে কথাই জানতে চাইছি।

নিখিল ॥ তা ধরুন গিয়ে প্রায়—

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ, বছর পাঁচেক হবে।

শৈলেন ॥ প্রফেসর, আপনি তাহলে নিখিলবাবুর প্রতিভার বিকাশ গোড়া থেকে ফলো করছেন! বেশ, বেশ!

প্রফেসর ॥ শুধু আমি কেন অনুও গোড়া থেকেই সব জানে।

অনু ॥ হ্যাঁ, কণ্ট্রাকটরী বিজনেস ফেল করবার পর থেকেই তো নিখিলবাবু নাট্যপরিচালক। নবনাট্য আন্দোলনের সৌভাগ্য যে নিখিলবাবুর বিজনেস ফেল পড়ল! না হলে কি আর উনি এ-লাইনে আসতেন!

শৈলেন ॥ বেশ, বেশ! তা নিখিলবাবু, এ পর্যন্ত আপনি ক'টি নাটক বধ করেছেন?

নিখিল ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা আপনি কি বলতে চাইছেন!

শৈলেন ॥ ঐ হল—মঞ্চস্থ করেছেন।

প্রফেসর ॥ গোটা সাতেক হবে কি বল অনু?

অনু ॥ দাঁড়ান গুণে বলছি। ওর নিজের লেখা—তুড়িদিয়েতাল, পৃথিবী ও কচু, আর ভুলবোঝারপালা। প্রথম দু'খানা সিম্বোলিক নাটক। আর ভবেশ ভড়ের 'কেঁদে কেঁদে কানা' আর 'যে ঘুড়ি উড়তে গিয়ে'—

শৈলেন ॥ (অস্ফুট) সম্ভবত লাট খেয়েছে।

অনু ॥ মোট পাঁচখানা।

শৈলেন ॥ আপনার নাটক কোথায় মঞ্চস্থ হয়ে থাকে নিখিলবাবু?

নিখিল ॥ নিউ এম্পায়ারে ছাড়া কোথাও আমরা অভিনয় করিনা। আমাদের অর্গেনিজেশন-এর আভিজাত্যে বাধে।

শৈলেন ॥ ওখানে তো শুনেছি অনেক খরচ। টিকিট বিক্রী হয় কেমন?

অনু ॥ নিখিলবাবুর শো'য়ে হাউস ফুল যাবেই যাবে। এদিকে হাই সোসাইটিতে পরীক্ষিৎদার ইনফ্লুয়েন্স আর ওদিকে নিউ এম্পায়ার। সাতদিনে সব টিকিট সোল্ড আউট!

শৈলেন ॥ তা দর্শকরা কি বলে নাটক দেখে?

অনু ॥ দর্শকরা আর কি বলবে? গম্ভীর মুখে হল থেকে বেরোয় ভাবতে ভাবতে। চিন্তাশীল নাটক ছাড়া তো নিখিলবাবু অভিনয় করেন না।

তবে বলে, কাগজওয়ালারা খুব বলে। শো'য়ের আগে নিখিলদা ওদের একবার পার্টিতে ডেকে নাটকের আগাপাশতলা সব ভাল করে বুঝিয়ে দেন। খুব খাওয়া-দাওয়াও হয়। ফিল্মলোকের নির্জ্জন রায় এত এত খায় আর দু'কলম সমালোচনা লেখে প্রশংসা করে। দু'একজন একটু উল্টোপাল্টাও লেখে! তা সব জিনিস কি আর সবার মাথায় ঢোকে!

শৈলেন ॥ বাস্ বাস্ এতক্ষণে বোঝা গেল। সাবাস! নিখিলবাবু সাবাস! ইঁটওয়ালা খুড়ি কন্‌ট্রাক্‌টর থেকে নাট্যপরিচালক। সাবাস! তা অমন মাথাটি কেন অজায়গায় নষ্ট করছেন! আসুন না আমার সঙ্গে— ওয়ার্কিং পার্টনার করে নেবো। মাসে তিনশো টাকা এ্যালাউন্স আর টেন পারসেন্ট অব্ নেট প্রফিট।

নিখিল ॥ (চোখ ছানাবড়া) সত্যি বলছেন? ঠাট্টা করছেন না?

শৈলেন ॥ সত্যি বলছি। তবে একটি সর্ত আছে। নাটক ফাটক চলবে না।

নিখিল ॥ না, না, আপনাকে তো বলেছি ওসব অবসরের ফসল। হাতে কাজ থাকলে অকাজের প্রশ্রয় দেবার লোকই আমি নই।

শৈলেন ॥ গুড, তাহলে কাল থেকেই আসুন। (অনিমেষকে) আপনার আবার কি হ'ল মশাই? কি ভাবছেন মুখ গোঁজ করে?

অনিমেষ ॥ কই কিছু ভাবছি নাতো! এমনি চুপ করে—

শৈলেন ॥ এমনি চুপ করে থাকাতো একে বলে না। আপনাকে রীতিমত ভাবিত দেখা যাচ্ছে।

অনু ॥ শৈলেনদার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না অনিমেষদা।

প্রফেসর ॥ যাকে বলে গভীর অন্তঃদৃষ্টি।

অনিমেষ ॥ সত্যি কিছু ভাবছি না।

শৈলেন ॥ ভাবছেন, ভাবছেন, তা ভাবুন। কিন্তু দেখবেন প্রেম-ট্রেমে পড়বেন না যেন। ওরকম বাজে জিনিস আর নেই! প্রথম প্রথম মশাই

ভাবতে ভাবতে কাহিল হবেন। তারপর ভাবনা তাড়াতে মদেজ্ঞান হতে হবে। এত মনোটোনাস মনে হবে!

নিখিল ॥ ঠিক কোথায় যেন পড়েছিলাম প্রতি দশবৎসর অন্তর দাম্পত্যজীবনে পরিবর্ত্তন মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। তাই না প্রফেসর সান্যাল?

প্রফেসর ॥ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় সে সুযোগ কোথায় বল?

অনু ॥ আমিতো সারাজীবন একই লোকের সঙ্গে থাকবার মত একঘেঁয়ে জীবনের কথা কল্পনাই করতে পারিনা। তাই ঠিক করেছি বিয়েই করব না।

শৈলেন ॥ (আপন মনে) আপদ।

অনু ॥ কে?

শৈলেন ॥ ঐ প্রেম-ট্রেমগুলো আর কি! অনিমেষবাবু আপনি যে বোবা হয়ে রইলেন মশাই? আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করে নেবার জন্যে এলাম আর আপনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন? আপনাকে দেখেতো বেশ বোকা বোকা, আই মিন, সোজা সোজা মনে হয়। ভেতরে এত প্যাঁচ কেন মশাই?

অনিমেষ ॥ একজিবিশটনা হলনা কিনা তাই মনটা একটু—

শৈলেন ॥ একজিবিশন্?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ, পরীক্ষিৎ অনিমেষের ছবির একটা একজিবিশান্ করাবে বলেছিল।

অনু ॥ অনিমেষদা দারুণ দারুণ সব এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি আঁকছে। কি যেন বললে তখন অনিমেষদা, নিও-নিও—

নিখিল ॥ নিও-রিয়ালিষ্টিক ইমপ্রেসনিজম।

শৈলেন ॥ নমুনা টমুনা এক আধখানা সঙ্গে আছে নাকি মশাই?

অনিমেষ ॥ আছে। দেখবেন, দেখবেন আপনি ?

শৈলেন ॥ দেখবার জন্যেই তো বললাম।

অনিমেষ ॥ (ছবিখানা খুলে ধরে) এই যে ঘানার হাম্বা—

শৈলেন ॥ (হাসিতে ফেটে পড়ে) ও—হোঃ—হোঃ—হোঃ—ওরে বাবারে জ্বালিয়ে দিলেরে হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওটা কি মশাই গুষ্টিরপিণ্ডি ? হাঃ—হাঃ—(হাসি চেপে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) বয়েস কত ?

অনিমেষ ॥ আজ্ঞে !

শৈলেন ॥ বয়েস কত ?

অনিমেষ ॥ আজ্ঞে চব্বিশ।

শৈলেন ॥ কি করা হয় ?

অনিমেষ ॥ ছবি আঁকি।

শৈলেন ॥ এসব গুষ্টির পিণ্ডি এ'কে কিছু হয় ? পয়সা, পয়সা—

অনিমেষ ॥ পয়সার জন্যে তো করছি না। চিত্র জগতে একটা নতুন ধারার এক্সপেরিমেণ্ট করছি।

শৈলেন ॥ সংসার কে চালায় ?

অনিমেষ ॥ আজ্ঞে বাবা।

শৈলেন ॥ বুড়ো বাপের কাঁধে চেপে সখ মেটানো হচ্ছে ! চাকরী কর না কেন ?

অনিমেষ ॥ পাইনা যে। আজকাল আবার সাধারণ ছবির কোন কদর নেই। তাই বিদেশী কায়দায় এক্সপেরিমেণ্ট করছি। নাম হলে চাকরী পাব ! দেখবেন গোটা দুয়েক এক্জিবিশন হলেই আর দেখতে হবে না !

শৈলেন ॥ হুঁ, এক্সপেরিমেণ্ট করতে আপত্তি নেই। কিন্তু কি করছো সেটা নিজের অন্ততঃ জানা চাইতো। যাক কাল থেকে আমার অফিসে বসবে। কমার্সিয়াল আর্টিষ্ট। দু'শো কুড়ি টাকা মাইনে বুঝলে ?

অনিমেষ ॥ ইয়েস স্যার!

অনু ॥ দেখলেন নিখিলবাবু, অনিমেষদা ওরকম বোকা বোকা দেখতে হলে কি হবে ধূর্তের একশেষ! ভাল একটা চাকরী বাগাবার জন্যে এইসব বিদ্‌ঘুটে ছবি আঁকত।

অনিমেষ ॥ এই—

শৈলেন ॥ এবার উঠতে হয়। আজকের দিনটা বেশ ভাল করে সেলিব্রেট করার ইচ্ছে ছিল—তা এককাপ চাও জুটলো না।

প্রফেসর ॥ তাতে কি! আর একদিন হবে। এরপর থেকে রোজই হবে। আমরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।

শৈলেন ॥ তবু প্রথম দিনটাকে সবাই স্মরণীয় করে রাখতে চায়।

নিখিল ॥ তা হলে কি করা যায় শৈলেনবাবু?

অনু ॥ একটা নভেল কিছু করা যায় না শৈলেনদা?

অনিমেষ ॥ একটা নতুন ধরনের কিছু—এক্‌সপেরিমেণ্টাল।

শৈলেন ॥ দি আইডিয়া—হয়েছে!

সবাই ॥ কি আইডিয়া শৈলেনদা? শুনি শুনি। বলুন বলুন শৈলেনবাবু। —(ইত্যাদি)

শৈলেন ॥ আসুন আমরা নাচি। আজকের দিনটাকে সেলিব্রেট করে নাচি। মানে আমি বাজাই আপনারা নাচুন।

অনু ॥ হাউ ওয়াণ্ডারফুল! এর চেয়ে ভাল কিছু ভাবাই যায় না।

প্রফেসর ॥ আমরা কি নাচতে পারব!

শৈলেন ॥ কেন পারবেন না? ঠিক তালে বাজাবো দেখবেন আপনিও তালে তালে নেচে যাচ্ছেন।

অনু ॥ প্রফেসর, আপনি বড্ড সেকেলে। আমি নাচতে পারি শৈলেনদা। তুমি পারবেতো অনিমেষদা?

অনিমেষ ॥ আলবাৎ পারব।

নিখিল ॥ কিন্তু বাজনা, বাজনা কোথায় শৈলেনবাবু? কি বাজাবেন আপনি?

শৈলেন ॥ বাজনা! বাজনা! ঠিক হ্যায়। যান ভেতর থেকে একটা কৌটো নিয়ে অসুনতো নিখিলবাবু।

[নিখিলের প্রস্থান]

প্রফেসর ॥ কৌটো দিয়ে কি হবে শৈলেনবাবু?

শৈলেন ॥ ঝুমঝুমি।

অনু ॥ ঝুমঝুমি! (খুশীতে ডগমগ)

অনিমেষ ॥ ঝুমঝুমি!

প্রফেসর ॥ ঝুমঝুমি?

শৈলেন ॥ এখানে আর বাজনা কোথায় পাব বলুন। এক টেবিল চেয়ার বাজানো যেতে পারে। তার চেয়ে ঝুমঝুমির আইডিয়াটা আরো ফ্রেশ। তাছাড়া ঝুমঝুমি শুধু ছোটোরা নয় ইংরেজি বাজনায় দেখেননি বড়রাও বাজায়।

[একটা কৌটো নিয়ে নিখিলের প্রবেশ]

এই যে নিখিলবাবু, এনেছেন? দিন।

[কৌটোটা হাতে নিয়ে তার ভেতরে কিছু টাকা রেখে বার কয়েক নেড়ে বাজিয়ে]

বাঃ, বাজছে দেখুন! ফার্ষ্ট ক্লাস, নিন সবাই এবার রেডি হয়ে নিন। উঠুন উঠুন প্রফেসর।

প্রফেসর ॥ শৈলেনবাবু, পারব তো?

শৈলেন ॥ পারবেন মানে, আপনি এঁদের সবার চেয়ে ভাল পারবেন! নিন, নিন, সবাই রেডি হয়ে নিন। আহা প্রফেসর, চাদর, ব্যাগ, যেমন

হাতে কাঁধে আছে থাক না। না না অনিমেষ ওভাবে নয়, ছবিটা খুলে জাপানী নাচের পাখার মত ধরে নাও।

অনু ॥ আমার ড্রেস ঠিক আছে শৈলেনদা ?

শৈলেন ॥ আর একটু ইয়ে হলে ভাল হোত, তা এখানে আর হচ্ছে কোথায় ! নিখিলবাবুকে আর কি বলব, আপনি তো অনেক নাচিয়েছেন। নিন, রেডি ! আমি ওয়ান, টু, থ্রি বলে বাজনা আরম্ভ করলেই আপনারা সুরু করবেন।

[সবাই নাচেব জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়ায়। প্রফেসর অনেকটা হতভম্ব। অনিমেধ জোর করে স্মার্ট হবার চেষ্টা করছে। অনু আর নিখিলের কোন ভাবান্তর নেই। তাবা ববাবরের মতই। অনু একপাক আগেই ঘুরে নেয়]

শৈলেন ॥ ওয়ান, টু—

[বেগে পরীক্ষিতেব প্রবেশ]

পরী ॥ যথেষ্ট হয়েছে শৈলেন, এবাব বন্ধ কর। আমি স্বাকার করছি আমার হার হয়েছে। আমি স্বীকার কবছি আমি একটা নির্বোধ অন্ধ।

[মঞ্চের একপ্রান্তে পবীক্ষিৎ আর এক প্রান্তে শৈলেন, মাঝখানে আব সবাই অবাক হযে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে।]

শৈলেন ॥ একটুখানি বাকি আছে পরীক্ষিৎ। শুনুন আপনারা, পরীক্ষিৎ এ'র আমি আপনাদেব আজ যা বলেছি সব মিথ্যে। ওর সম্পত্তি ওরই আছে আমি একটি পয়সাও ঠকিয়ে নিইনি ! নিতে পারিনা। আমি যেমন চারশো টাকা এ্যালাওএন্সের ওয়ার্কিং পার্টনার তেমনি আছি।

[ওদের বিস্ময় আরও বাড়ে। প্রথমে নির্বাক তারপর মৃদু একটা গুঞ্জন উঠে]

প্রফেসর ॥ হেঁ—হেঁ অবাক কাণ্ড।

নিখিল ॥ কি অদ্ভুত সারপ্রাইজ! অনেকদিন এমন আমোদ হয়নি।

অনু ॥ দেখলে অনিমেষদা, পরীক্ষিৎদা কত বড় আর্টিষ্ট। এমন একটা সারপ্রাইজ আমরাতো কল্পনাও করতে পারিনা।

অনিমেষ ॥ তাতো বটেই, তাতো বটেই!

প্রফেসর ॥ তাইতো বলি, পরীক্ষিৎ না হলে এমন মাথা কার!

[গোটা দলটা শৈলেনের দিকে পিছন করে পরীক্ষিতের দিকে মুখ ফেরায়। পরীক্ষিৎ একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে আছে। দলটা তার দিকে এগোয়। সকলের সামনে অনু]

অনু ॥ (পরীক্ষিতের হাত ধরে) তুমি ভারী দুষ্টু পরীক্ষিৎদা।

[পরীক্ষিৎ অনুর হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শৈলেন ওদিক থেকে দরাজ গলায় হেসে উঠতেই সবাই থতমত খেয়ে মাঝখানে এসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।]

পর্দা

[কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানের হিলারী ইনস্টিটিউট আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় (১৯৬১) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।]

: চরিত্র :

শঙ্কর

নির্ম্মল

আমল

সনৎ

নকুল

পুলিশ ইন্সপেক্টর

কনষ্টেবল

গিরিশ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত

সারি সারি পাঁচিল

বসন্ত ভট্টাচার্য্য

[সুসজ্জিত একটি কক্ষ। দুপাশে দুটি দরজা। মাঝেও একটি দরজা। তাতে ঝুলছে দামী পর্দা। ওর পাশেই রয়েছে একটি কাঁচের জানালা। দেয়ালে কয়েকখানা ছবি—ক্যালেণ্ডার। কক্ষের এক কোণে সাজানো রয়েছে একটি ছবি আঁকবার ঈজেল—সাথে অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। অপর কোণে তিন-চারখানি চেয়ার—একটি টেবিল। টেবিলের ওপর ফুলশূন্য ফুলদানী। দেয়ালে টাঙানো ছবির মধ্যে একখানা খুব উজ্জ্বল—বলা বাহুল্য সেখানি গৃহকর্তার মৃতা পত্নী শীলার। গৃহকর্তা একজন শিল্পী—নাম শঙ্কর।

দৃশ্য উঠ্‌তেই দেখা যায় সে পায়চারি করছে সমস্ত ঘরে—মুখে চোখে তার আত্মতৃপ্তির ভাব। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে মৃতা পত্নীর প্রতিকৃতির ওপর। শিল্পী এগিয়ে যায় সেদিকে।]

শঙ্কর ॥ শীলা, শীলা, তুমি বেঁচে আছো—ঠিক্ বেঁচে আছো। আমি দেখতে পাচ্ছি—তুমি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছো। ওইতো, ওইতো তোমার সবুজ চোখের দৃষ্টি তুমি আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছো। কতকাল কথা বলনি—আজ, আজ অনেক কথা আছে। তোমাকেও আজ অনেক কথা বল্‌তে হবে। আমি আজ শুধু শুন্‌বো।

…জানো, জানো শীলা, আজ তোমার সনৎ আস্‌ছে—তোমার সনৎ। তুমি যে বলেছিলে, আমিতো চলে যাচ্ছি, শুধু একটি কথা বলে যাই—আমার সনৎকে তুমি মানুষের মতো মানুষ কোরো—আমি তা করেছি শীলা, আমি তা করেছি।…আজ আমি মুক্ত, আজ আমি মুক্ত…'

[টেবিলের ওপর ফুলদানী দেখ্‌তে পেয়ে]

নকুল—নকুল।

নকুল ॥ (নেপথ্যে) আজ্ঞে, আমি এ ঘরে বাবু—এই বই-পত্তর সব গুছোচ্ছি।

শঙ্কর ॥ শুনে যা।

[নকুলের প্রবেশ]

নকুল ॥ বাবু।

শঙ্কর ॥ হ্যাঁরে, রজনীগন্ধা কই—রজনীগন্ধা।…কি আনিস্‌নি বুঝি! না, তোকে নিয়ে আর…দেখ্‌ছিস সাতটা বাজে—একটু বাদেই সনৎ এসে যাবে! যা, নিয়ে আয়।

[নকুল চল্‌তেই শঙ্কর ওকে থামায়]

জানিস্ নকুল, অন্ধ হ'য়ে যাবার পরও রজনীগন্ধা দেখ্‌তে চাইতো সনৎ। তুইতো দেখিস্‌নি, এক-এক সময় আমার মনে হ'ত, আমার সমস্ত দৃষ্টিটুকু আমি যদি ওকে দিতে পারতাম! তখনই চেয়ে দেখ্‌তাম—সমস্ত দৃষ্টিকে উজার ক'রে দিয়ে আমার সনৎ তাকিয়ে রয়েছে অন্ধকার রঙের ফুলগুলোর দিকে।

নকুল ॥ আজ্ঞে ফুলতো এনেছি অনেকক্ষণ।

শঙ্কর ॥ এনেছিস! তা কোথায় রেখেছিস? যা নিয়ে আয়।

[নেপথ্য থেকে ফুল নিয়ে আসে নকুল]

নকুল ॥ এই যে বাবু ওঘরে রেখেছিলাম।

শঙ্কর ॥ ও ঘরে নয়। সনৎ এসে প্রথমে এ ঘরেই উঠ্‌বে।

[ফুলদানীতে সাজাতে থাকে ফুলগুলো]

হ্যাঁরে, ওর সে ছবিখানা কোথায়—যেখানা আমি এখনো শেষ করিনি!

নকুল ॥ আজ্ঞে…

শঙ্কর ॥ না, তোকে নিয়ে আমি আর পারিনে। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তুই বলতে পারিসনে। ছবিখানা, ছবিখানা কোথায় গেল?

নকুল ॥ আজ্ঞে, ছবিখানা তো আমি ওঘরে টাঙিয়ে রেখেছি বাবু।

শঙ্কর ॥ টাঙিয়ে রেখেছি বাবু! ওখানা কি টাঙাবার ছবি? যা, নিয়ে আয়।

[নকুল ছবি আন্‌তে ভেতরে চলে যায়। শঙ্কর এগিয়ে আসে ঈজেলের কাছে। রঙ তুলি সব গুছিয়ে নিতে থাকে। একটু বাদেই ছবি নিয়ে নকুল এসে দাঁড়ায় তার পাশে]

নকুল ॥ দাদাবাবুর ছবিখানা কিন্তু ভালো হয়নি বাবু। কেমন যেন—

শঙ্কর ॥ (আহত কণ্ঠে) কি বললি? এছবি ভালো হয়নি? আমি খোকাব ছবি ভাল করে আঁকিনি?…দে, দে, খোকা এসে হয়ত ঠিক্ এমনি ভাবেই বল্‌বে—বাবা, বাবা, আপনি এ কী ছবি এঁকেছেন? এ যেন —না, না—নকুল তুই চলে যা। এ ছবি আমায় শেষ করতেই হবে। খোকাকে আমি নতুন ক'রে আঁক্‌বো।

[ছবিখানাকে ঈজেলের ওপর রেখে রঙ চড়াতে থাকে শঙ্কর। নকুল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে থাকে। পরক্ষণেই ব্যস্ত পদক্ষেপে ভেতরে চলে যায় এবং ঐ ব্যস্ত ভাবেই আবার বাঁ পাশের দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। শঙ্কর ওকে দেখ্‌তে পেয়ে এগিয়ে এসে দরজা বন্ধ ক'রে

দেয়। এবং ছবি আঁকতে সুরু করে। কিন্তু বাইরে থেকে করাঘাত পড়ে দরজায়]

আব্দুল ॥ (নেপথ্যে) শঙ্করবাবু—শঙ্করবাবু।

শঙ্কর ॥ কে ?

আব্দুল ॥ (নেপথ্যে) শঙ্করবাবু—শঙ্করবাবু—দরজাটা একটু খুলুন—শঙ্কর-বাবু—

শঙ্কর ॥ (দরজা খুলে) আব্দুল ! তুমি এখন ?

[হাতে একটা ছোট্ট সুটকেশ নিয়ে শঙ্করের কাছে এসে দাঁড়ায় আব্দুল]

আব্দুল ॥ এটা আপনাকে রাখ্‌তে হবে শঙ্করবাবু। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকৃতে পারছিনা। এখুনি যেতে হবে কানপুর। সেখান থেকে দিল্লী, অমৃতসর। তারপর, তারপর আবার ক'লকাতা হ'য়ে রেঙ্গুন।

শঙ্কর ॥ কিন্তু আমিতো এটা রাখ্‌তে পারবোনা আব্দুল।

আব্দুল ॥ শঙ্করবাবু !

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ আব্দুল। আজকে আমার অনেক কাজ। না, না, আমি তোমায় বলৃতে পারবোনা।—তুমি, তুমি এখন যাও।

আব্দুল ॥ বাবু, আমি যে বেরোতে পারবোনা। উপায় নেই। আপনি এটা রাখুন—না হয় আজকের রাত্তিরটা আমায় একটু থাকৃতে দিন।

শঙ্কর ॥ থাকৃতে দেব তোমাকে ? কেন, কি প্রয়োজন ? যাও, যাও বলৃছি।

আব্দুল ॥ বাবু, দু'পায়ে আমার শেকল বাঁধা রয়েছে। ফাঁসী কাঠে আমার জন্যে দড়ি ঝুলৃছে। ওইতো, ওইতো আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি···আমার ফাঁসী হচ্ছে—

শঙ্কর ॥ গেট্ আউট্—গেট্ আউট্ আই সে। তুমি খুনী, তোমার ফাঁসী হওয়াই উচিত!

আব্দুল ॥ আমি খুনী, আমার ফাঁসী হওয়া উচিত! আর আপনি?

শঙ্কর ॥ আব্দুল, চলে যাবে না পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিতে হবে?

আব্দুল ॥ পুলিশ?...না, না। পুলিশ নয়। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি—এখুনি চলে যাচ্ছি।

[আব্দুল দরজার কাছে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। ওর চোখ দু'টো আগুনের গোলার মত জ্বল্‌তে থাকে]

কিন্তু আমিও অব্দুল আজিজ, যদি ফিরে আসি আবার দেখা হবে!

[আব্দুল ঝড়ের গতিতে প্রস্থান করে। শঙ্কর আতঙ্কিত হ'য়ে ছুটে আসে ঈজেলের ওপরে রাখা সনতের ছবির কাছে]

শঙ্কর ॥ মাই বয়, মাই লাভিং চাইল্ড সনৎ, কিছু শুন্‌তে পেয়েছিস?

[ছবির কাছে দাঁড়িয়ে আত্মগর্বে ভরপুর হয়ে ওঠে শঙ্করেব মন]

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি জনি নাকো কোনো আইন।

[শঙ্করেব দৃষ্টি চলে যায় ফুলদানীর শুভ্র রজনীগন্ধা থেকে টাঙানো শীলার প্রতিকৃতির ওপর। মন এবার ভ'রে ওঠে আত্মতৃপ্তিতে! সনতের ছবিকে উপলক্ষ্য করে সে আবৃত্তি করতে থাকে]

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী—
আরেকবাব সমুখে এস প্রদীপ খানি ধরি।
এবার মোর মকর চূড় মুকুট নাহি মাথে
ধনুক বান নাহি আমার হাতে ;
এবার আমি আনিনি ডালি দক্ষিণ সমীরণে
সাগর কুলে তোমাব ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখ ত চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা !

[হাতে খাম নিয়ে নকুল প্রবেশ করে]

নকুল ॥ গণপতিবাবু এই খামটা দিলেন—আর বল্লেন কাল সকাল বেলা দেখা করবেন।

শঙ্কর ॥ (খাম খুলে) একি তিনশো কেন ? আজতো চারশো টাকা দেবার কথা ছিল।...আগে জান্‌লে এ অর্ডার আমি নিতুম না।

[নকুল প্রস্থানোদ্যত]

নকুল—

নকুল ॥ আমায় ডাক্‌ছেন ?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, তোকেই ডাক্‌ছি। শোন্ কথা আছে।

[নকুল কাছে এল]

আচ্ছা নকুল, দেশেতো তোর কেউ নেই—কেমন ?

নকুল ॥ আজ্ঞে, থাক্‌বেনা কেন ? এক ভাগ্‌নে আছে। ওখানে দোকান করে।...আমায় খুব মান্য করে বাবু।

শঙ্কর ॥ দেখ, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তোরতো বয়স হ'ল—চিরটা কাল তুই যদি পরের বাড়ীতে থাক্‌বি তাহলে আর নিজের বাড়ীতে থাক্‌বি কখন ? কী বল ?

নকুল ॥ আজ্ঞে আমরা যে বাড়ীতে থাকি, কাজকর্ম্ম করি সেটাইতো আমাদের ঘর-বাড়ী বাবু।

শঙ্কর ॥ না, না। সে কথা নয় নকুল। এ বাড়ীতে তোর অনেকদিন হ'ল—এবার তুই দেশে যা।

[শঙ্করের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে নকুল]

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেশে যা। নিজের বিষয়-আশয় ঘর-দোর সব দেখ্‌গে যা।

নকুল ॥ বাবু, আপনি আমায়—

শঙ্কর ॥ না, না, তোকে আমি জবাব দিচ্ছিনা নকুল—জবাব দিচ্ছিনা। তোর যখন খুশি এখানে আসবি—এসে থাকবি। এতো তোর নিজেরই ঘর-বাড়ী।

নকুল ॥ বাবু! না—না সে হয় না। ওখানে আমি আর যেতে পারবো না। দু'চোখ মেলে কী দেখ্‌বো? আমার সোনার সংসার পুড়ে শ্মশান হ'য়ে গেছে—তাই?

শঙ্কর ॥ নকুল, তাহলে তুই বরং অন্য কোথাও যা। যেখানে যেতে তোর মন চায়।

নকুল ॥ (প্রণাম করে) বাবা বিশ্বনাথকে দেখবার জন্য মনটা বড় ছট্ ফট্ করে বাবু—আর কোথাও যেতে সাধ নেই।

শঙ্কর ॥ বেশতো, আমি তোকে কাশী যাবার সব ব্যবস্থা করে দেবো। আচ্ছা, তুই তাহলে গুছিয়ে নে।

নকুল ॥ বাবু!

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ। শুভকাজে দেরী করতে নেই। তোর মন যখন চেয়েছে আর যখন মুখ ফুটে আমায় বলেছিস তখন দেরী করে আর কাজ নেই। যা, যা এখুনি তৈরী হ'য়ে নে।

নকুল ॥ এক্ষুণি কেমন করে হবে বাবু? খোকাবাবু আসবেন—তার জন্যে—

শঙ্কর ॥ ও তোর দেখবার কিচ্ছু দরকার নেই নকুল।···আমিতো রয়েছি! তাছাড়া—তাছাড়া সনৎ এখন আর ছেলে মানুষটি নেই। বড় হয়েছে—বুঝতে শিখেছে।···না, না, আর কথা নয়। এক্ষুণি যা। ন'টায় গাড়ী।

নকুল ॥ কিন্তু বাবু—আমি যে এখন—

শঙ্কর ॥ উহুঁ, কোন কথা নয় নকুল। তৈরী হয়ে আয়।

[নকুল বাধ্য হয়েই ভেতরে চলে যায়। শঙ্কর ঈজেলের কাছে এসে ছবি আঁকায় মন দেয়। একটু বাদেই ছোট্ট টিনের সুটকেশ হাতে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নকুল এসে তাকে প্রণাম করে]

শঙ্কর ॥ থাক্ থাক্।

নকুল ॥ আজ পঁচিশটা বছর আপনাদের কাছে বাবু—আমার যে আর কোথাও যেতে সাধ হচ্ছেনা···

শঙ্কর ॥ নকুল, এ কয়টা টাকা তোর খরচ বাবদ রেখে দে। আর হ্যাঁ—এইনে তোর আরো দু'মাসের মাইনে। (টাকা দিল)

নকুল ॥ বাবু!

শঙ্কর ॥ ওখানে পৌঁছে আমায় একটা চিঠি লিখিস, কেমন?

নকুল ॥ হ্যাঁ বাবু লিখ্‌বো, নিশ্চয়ই লিখ্‌বো।

[নকুল প্রস্থান করে। শঙ্কর চেয়ে থাকে ওর গমন পথের পানে। বাইরে মেঘের গর্জন সুরু হয়। শঙ্কর এসে দাঁড়ায় জানালার কাছে। বৃষ্টি সুরু হয়। তাকে আড়াল করে সর্বাঙ্গ বর্ষাতি ঢাকা নির্মল প্রবেশ করে। একে একে

বর্ষাতি খুলে, টুপি খুলে চেয়ারের ওপর রাখে। ওর কণ্ঠস্বরে শঙ্কর চম্‌কে ওঠে]

নির্ম্মল ॥ এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস শঙ্কর ?

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল ! তুই, মানে তুই, এখন—?

নির্ম্মল ॥ হ্যাঁ, আমি। মানে নির্ম্মল সরকার। চিন্‌তে বোধকরি অসুবিধে হচ্ছে ?

শঙ্কর ॥ না।

নির্ম্মল ॥ তবুও ভালো—চিন্‌তে পেরেছিস। আমিতো ভাবলুম বুঝি ভুলেই গেছিস ! দশবছর আগে আদালত কক্ষেই যখন চিন্‌তে পারিসনি—তখন আজ যে এত সহজে—যাক্‌গে, একটু চা খাওয়াতে পারিস ? বড় ক্লান্ত আমি। দু'দিন কিছু খাইনি।

শঙ্কর ॥ কিন্তু এখন তো চা হবেনা নির্ম্মল। মানে—

নির্ম্মল ॥ কেন, শীলা বাড়ীতে নেই বুঝি ?

শঙ্কর ॥ শীলা, শীলা বেঁচে নেই নির্ম্মল !

নির্ম্মল ॥ শীলা বেঁচে নেই ?…শঙ্কর, শঙ্কর তুই কি এবারও আমার সঙ্গে ছলনা করছিস ?

শঙ্কর ॥ না, ছলনা করছিনে—আর করেইবা কি লাভ !

নির্ম্মল ॥ লাভ-লোকসান তোর যে কোথায় হিসেব কষা রয়েছে তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শীলা, শীলা বেঁচে নেই ?

[ছবির কাছে চলে যায়]

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, অ্যাক্‌সিডেণ্টে মারা গেছে শীলা।

নির্ম্মল ॥ শীলা, শীলা এমনি একটা অঘটন প্রতীক্ষাই আমি করছিলাম। কিন্তু, কিন্তু শীলা আই ওয়াজ আন্‌ডান্। ইউ—ইউ—শঙ্কর, শীলার অদৃষ্টের জন্যে তোর এতটুকু অনুতাপ নেই—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আমি বুঝতে পেরেছি। …কিন্তু তুই কী চাস্ ?

শঙ্কর ॥ চা খেতে চেয়েছিলি না ?

নির্ম্মল ॥ চেয়েছিলাম—তবে তোর কাছে নয়। ভেবেছিলাম শীলা আছে। তাই—তাই একবার শেষ বারের মত তাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম।

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল ! শীলা যদি আজ বেঁচে থাকৃতো তবু সে পরস্ত্রী—তার কাছে···

নির্ম্মল ॥ শঙ্কর ! সহ্যের একটা সীমা আছে।···আচ্ছা তুই আমায় বুঝিয়ে দিবি তুই কি চাস্—তোর উদ্দেশ্য কি ?···ছেলেবেলা থেকে একসাথে বড় হ'লাম। স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটিতে একসাথে পড়লাম। আমাকে পাশ কটিয়ে তুই শীলাকে বিয়ে করলি—দশের কাছে একদিন শিল্পী বলে স্বীকৃতি পেলি। তারপর, তারপর বাঁচার তাগিদে মরিয়া হ'য়ে সংগ্রাম সুরু করলি।···আমি, আমি গেলাম পিছনে পড়ে—দূরে, অনেক দূরে। ঠিক যেন তুই আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলি—

[মেঘের গর্জন কমে আসে]

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল !

নির্ম্মল ॥ হ্যাঁ, ঠিক তাই।···কিন্তু শঙ্কর আমি এখনো বলছি কালীদাকে আমি খুন করিনি। আমি তখন ক'লকাতার বাইরে ছিলাম। আব্দুল জানতো, কোথায় কেন গিয়েছিলাম। আর—আর ওই এক লক্ষ টাকার খোঁজ আমি জানিনে। সত্যি জানিনে—

শঙ্কর ॥ (স্বগতঃ) ষ্ট্রেঞ্জ !

নির্ম্মল ॥ তবু যখন সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করে তুই আমায় খুনী বলে প্রমাণ করেছিস—জালিয়াৎ বলে চিহ্নিত করেছিস, তাই বুঝতে পারছি শীলা মরেনি···হ্যাঁ, হ্যাঁ; অন্তত অ্যাকসিডেণ্টে মরেনি—সে নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছে। আর সনৎ—সনৎকে তুই হত্যা—

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল !···সনৎ···সনৎ···এ নাম তুই মুখেও উচ্চারণ করিসনে—তার মৃত্যু হোক্ তবু যেন তোর সাথে দেখা না হয়।

নির্ম্মল ॥ সনৎ, সনৎ বেঁচে আছে! তবে, তবে সে কোথায় আছে—তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। জীবনের নতুন মন্ত্র তাকে জানিয়ে দিয়ে যেতে হবে।···তারপর—আমি আবার ভেসে যাবো, আবার বাঁধা পড়্‌বো—এমনি ভাবেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল, আমি আজ খুব ব্যস্ত। তুই বরং অন্য একদিন আসিস্‌। ···কতকগুলি জরুরী কাজ আজকে আমায় শেষ করতেই হবে।

নির্ম্মল ॥ বেশতো আমি না হয় অপেক্ষা করছি।···তোর বাড়ীতে চাকর-টাকর নেই নাকি?

শঙ্কর ॥ না।

নির্ম্মল ॥ মানে আছে অথচ তুই তাদের ডেকে বিব্রত করতে চাস্‌নে—কেমন? অচ্ছা, আমি না হয় ড়াকছি। এই রাম, শ্যাম—যদু—মধু—হরি—

শঙ্কর ॥ আঃ, কি হচ্ছে নির্ম্মল! বাড়ীতে অন্য লোক আছে। তাদের ডিস্‌টার্ব হবে।

নির্ম্মল ॥ হোক্‌।···আচ্ছা, আমি দেখছি।

[নির্ম্মল ডানপাশের দরজা দিয়ে ভেতরে যেতে চায়। শঙ্কর ওকে জোর করে ধরে ফেলে]

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল!

নির্ম্মল ॥ আঃ ছেড়ে দে। ছেড়ে দে। তেষ্টায় আমার বুক ফেটে গেল। ছেড়ে দে—

শঙ্কর ॥ তুই বোস্‌। আমি দিচ্ছি। কি খাবি? চা, কফি, জল?

নির্ম্মল ॥ জল, শুধু জল।

শঙ্কর ॥ দিচ্ছি।

[শঙ্কর ভেতর থেকে জল এনে দেয়]

নির্ম্মল ॥ (জল খেয়ে) আঃ, জুড়িয়ে গেল ! মনে হচ্ছে, এত শান্তি জীবনে কখনো পাইনি।...বড় ঘুম পাচ্ছে। আমি একটু ঘুমিয়ে নি। কতদিন এমনভাবে ঘুমুইনি—

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল আজ তুই চলে যা। আমার যে আজ অনেক কাজ।

নির্ম্মল ॥ কাজ আর কাজ। মানুষ কত কাজ করতে পারে! কত কাজ তো আমিও করলুম—কি হোল তার? কাজ—আর কাজ—

[ঘুম এসে যায়]

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল—নির্ম্মল—

নির্ম্মল ॥ উঁ।...আচ্ছা শঙ্কর, অতগুলো টাকা পেলি কি হোল তার?...আমায় যদি কিছু দান করিস্।...বেশতো গুছিয়ে নিয়েছিস। আব্দুল নিখোঁজ। কালীদা মৃত—চিত্তদা জেলে। আমি, একমাত্র আমিই এখন তোর চোখের সামনে রয়েছি। যদি আমায় কিছু—

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল, ঘুম পেলে ঘুমুনোটাই ঠিক্ কাজ।

নির্ম্মল ॥ আচ্ছা...শঙ্কর, তুই কখনো স্বপ্ন দেখেছিস—স্বপ্ন? আমি কিন্তু ঘুমুলেও দেখ্‌তে পাই—জেগে থাকলেও দেখ্‌তে পাই।...ঘুমিয়ে থাকলে দেখ্‌তে পাই, সমাজ আমাকে অনেক উঁচু আসনে ঠাঁই দিয়েছে—গাড়ী, বাড়ী, দাস-দাসী, প্রিয়তমা পত্নী! আর, আর জেগে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাই তোর ঐ দু'চোখের তারায় তারায় যে হিংসার আগুন জ্বল্‌ছে —সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাতে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। শুধু তুই সেই ভস্মস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে বার বার—

[বাইরে হুইসেলের শব্দ শোনা যায়]

শঙ্কর ॥ পুলিশ, পুলিশ!

নির্ম্মল ॥ কে? পুলিশ?—পুলিশ!

[নির্ম্মল ডান পাশের দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ভেতরে চলে যায় এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। শঙ্কর এসে সজোরে করাঘাত করতে থাকে]

শঙ্কর ॥ নির্ম্মল, নির্ম্মল, দরজা খোল্! ওঘরে থাকিস্‌নে, বিপদ আছে। নির্ম্মল !···

···নির্ম্মল দরজা খুল্‌বি না ভেঙে ঢুক্‌বো ?···বলছি, বল্‌ছি ওটা পুলিশের হুইসেল নয়—হয়ত ট্রেনের হুইসেল। নির্ম্মল···দরজা খোল্—দরজা খোল।

···কিন্তু, ও ঘরেইতো রয়েছে আমার সব কিছু। টেবিলের ওপর শীলার ছবির সাথে রয়েছে চিঠি—তাতে···! পুরোনো ছবির স্তূপে রয়েছে গুলীভরা পিস্তল—একটু কাছেইতো রয়েছে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার বাণ্ডিল ! যদি নজরে পড়ে হয়ত সবটাই নিতে চাইবে। আমার, পঞ্চাশ হাজার টাকা—পঞ্চাশ হাজার টাকা !···নির্ম্মল, নির্ম্মল—দরজা খোল্—দরজা খোল্।

[শঙ্কর দরজার পাশে অস্থিরভাবে এসে দাঁড়ায়। কান পেতে থাকে দরজার ওপর। কিছু দেখবার চেষ্টাও করে। কিন্তু পারে না। হঠাৎ ওর কানে ভেসে আসতে থাকে শীলার জবানবন্দী। নির্ম্মল ওটা খুঁজে পড়ছে যেন]

জবানবন্দী ॥ আমি তোমার শীলা লিখে যাচ্ছি—আমি হেরে গেছি। ···আমি হেরে গেছি। বিয়ের পর থেকে আজ পাঁচ বছর শুধু তোমার মুখের পানে তাকিয়ে থেকেছি—দিনরাত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—ঠাকুর, তুমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও···আমি কিছুই চাইনে—শুধু তুমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু ঠাকুর

আমার কোন কথাই শুনলে না। ···দিনের পর দিন তুমি শুধু নিষ্ঠুর হয়েছো। শুধু টাকা আর টাকা! কত টাকা তুমি চাও—কতবার জান্‌তে চেয়েছি। তবু তুমি বলনি। ···বাবা-মায়ের আমিইতো একমাত্র সন্তান। তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের কি ফিরিয়ে দিতেন?

[অতীতকে ভাবতে চায় শঙ্কর]

জবানবন্দী॥ তোমার একমাত্র সন্তান সনৎ। তার পানে তাকিয়ে, তুমি একটুও শান্ত হওনি। ···সনৎ, সনৎ হয়ত ভবিষ্যতে অন্ধ হ'য়ে যাবে—তখন তুমিও তাকে দেখ্‌বেনা—হয়ত, হয়ত খুন করেই ফেল্‌বে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি সব পারো—সব পারো।

[অনুশোচনায় দগ্ধ হয় শঙ্কর]

জবানবন্দী॥ আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে। আমার সব সাধ পূর্ণ হয়ে গেছে। ···তোমার কালীদার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের পানে তাকালে মনে হয়, তোমার স্ত্রী বলে হয়ত আমার নরকেও ঠাঁই হবে না। তুমি, তুমি আমার স্বামী, কিন্তু কত বড় পশু তুমি!

[কান্নায় ভেঙে পড়তে চায় শঙ্কর]

জবানবন্দী॥ ওগো, শুধু একটি কথা বলে যাই—তুমি খুনী হও, নিষ্ঠুর হও, তবুতো তুমি বাপ! তোমার আমার একমাত্র সন্তান সনৎকে তুমি মানুষের মত মানুষ কোরো। সে যেন তোমার ছায়ায় মানুষ না হয়। তাহলে, তাহলে আমি নরকেও শান্তি পাবো না—আমি নরকেও শান্তি পাবোনা!

শঙ্কর॥ (ছবির কাছে) নো, নো—শীলা, আমি তা করেছি। সনৎকে আমি আমার ছায়া থেকে অনেক দূরে রেখেছি। নিজে নির্বাসিত

থেকেও তাকে মানুষের মত মানুষ করে তুলেছি। ···তুমি আজ দেখ্‌তে পাচ্ছোনা, যদি পেতে, তাহোলে নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করতে।

[বিদেশ থেকে সদ্য আগত তরুণ ইঞ্জিনীয়র সনৎ প্রবেশ করে। তার হাতে খবরের কাগজ। কাঁধে এয়ার ব্যাগ। শঙ্কর ওকে দেখ্‌তে পেয়েই ছুটে আসে সাহায্য করতে]

শঙ্কর॥ সনৎ তুই এসেছিস? আয়। দমদম্ থেকে আমায় একটা খবর পাঠাস্‌নি কেন? আমি নিজে তোকে আন্‌তে যেতাম। কত কষ্ট হয়েছে তোর!

সনৎ॥ (শঙ্করকে প্রণাম করে) না বাবা, আমার কিছুই কষ্ট হয়নি। ···এই বুঝি আমার মায়ের ছবি?

শঙ্কর॥ হ্যাঁ। তোর মা। সতীলক্ষ্মী!

[ছবির পাশে দু'জনে এসে দাঁড়ায়]

সনৎ॥ মা, মা, আমি ফিরে এসেছি। ···তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি আবাব দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। তুমি যদি আজ থাক্‌তে, হয়ত প্রাণ ভরে আনন্দ করতে।

শঙ্কর॥ শীলা, শীলা, দেখ—তোমার সনৎ আজ কত বড় হয়েছে! সে আজ মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়র। দেশ জোড়া তার খ্যাতি। তুমি, তুমি ওকে আশীর্বাদ কর শীলা। তোমার আশীর্বাদে ও যেন—

[নেপথ্যে পুলিশের তাড়ায় আব্দুল পুনঃপ্রবেশ করে]

আব্দুল॥ বাবু, বাবু আমি পারিনি—আমি পালাতে পারিনি। চারিদিকে পুলিশের লোক। গাড়ী গাড়ী পুলিশ—তাদের হাতে বন্দুক। তারা আমায় ধরতে চায়—আমায় ফাঁসী দিতে চায়···বাবু—বাবু—

সনৎ॥ কে? কে তুমি?

আব্দুল॥ আপনি কে? পুলিশের লোক নয়তো?

সনৎ॥ না, আমি বাবুর ছেলে—সনৎ।

আব্দুল॥ বাবুর ছেলে? আমাদের এই বাবুর ছেলে? আঃ—বাঁচালেন, আপনি আমায় বাঁচালেন সনৎবাবু।

শঙ্কর॥ কি বলছিস কি? এ হচ্ছে ইঞ্জিনীয়র সনৎ রায়!

আব্দুল॥ ইঞ্জিনীয়র সনৎ রায়? আপনার ছেলেতো! ...কত ছোট ছিলেন আপনি! ...বৌদিমণি মারা যাবার সময় দু'চোখ ভরে মাকেও দেখ্‌তে পাননি, তাঁর কোন কথাও স্মরণ নেই বোধ হয়। ...আমি, আমি তখন বিছানার পাশে বসে...।

শঙ্কর॥ ইউ ষ্টুপিড্!

আব্দুল॥ বল্‌লে, আমিতো যাচ্ছি—তুমি যেন তোমার মত করে ওকে—

শঙ্কর॥ আব্দুল, বেরিয়ে যাবি,—না—

আব্দুল॥ কেন শঙ্করবাবু, আমিতো মিথ্যে কথা বলছিনা। ...তবে কি বাবু, আপনি এখন মস্ত বড় হ'য়েছেন—ইঞ্জিনীয়র হয়েছেন, এখন হয়ত বাবুর শান্তি ফিরে আস্‌বে। ...সারা জীবনতো কত ঝক্কি পোয়াতে হ'ল।

সনৎ॥ মানে?

আব্দুল॥ হ্যাঁ, আপনি যে বড় হয়েছেন, চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন, ও-তো চার-চার জনার জীবনের দাম বাবু!

সনৎ॥ বাবা, এ লোকটা কে? আমিতো ওর কথার কোন মানেই বুঝ্‌তে পারছিনা। কেমন যেন এলোমেলো কথা বল্‌ছে!

শঙ্কর॥ আব্দুল, আমার ফার্মে কিছুদিন চাকরী করেছে। এখন মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে। কিছু ভিক্ষে চায়।

সনৎ॥ ভিক্ষে চায়? (ব্যাগ থেকে পয়সা দিতে যায়)

আব্দুল॥ ভিক্ষে দিচ্ছেন বাবু? বা, বেশ, বেশ…পুলিশ বোধহয় চলে গেছে, কোন সাড়া পাচ্ছিনা কেন? …ফাঁসীর দড়ি আমার জন্যে তৈরী হচ্ছে, কিন্তু, কিন্তু আমি আর ভয় পাইনে—আর ভয় পাইনে। মরবার আগে তবু দেখে যাবো, আমাদেরই একজন তার ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করে তুলেছে। দেশ জোড়া তার সুনাম…সনৎবাবু, আমিও বড় ঘরের ছেলে ছিলাম।

সনৎ॥ বাবা, আব্দুলের কথায়—

শঙ্কর॥ আব্দুল, পাগলামীর একটা সময় আছে। এক্ষুণি, এই মুহূর্তে এখান থেকে যাও। নইলে তোমাকে আমি—

আব্দুল॥ হ্যাঁ, শঙ্করবাবু—আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। শুধু যাবার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করে যাবো। আপনি যেন সনৎবাবুকে আপনার ঐ ডাকাতির পয়সায় আর—

[শঙ্কর এসে ওর গলা চেপে ধরে]

শঙ্কর॥ ডাকাতির পয়সা—না?

আব্দুল॥ আঃ—আঃ—

সনৎ॥ (বাধা দিয়ে) বাবা, বাবা, একি করছেন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন।

আব্দুল॥ মরিনি, এখনও মরিনি—আঃ—

সনৎ॥ এ সবের অর্থ কি? আপনি কি ওকে মেরে ফেলতে চান্?

আব্দুল॥ না, না সনৎবাবু। আমায় উনি মারবেন কেন! আজ তার কোন প্রয়োজন নেই। সবদিক থেকে উনিতো এখন মুক্ত। …এক-দিন, একদিন আমারই চোখের সামনে কালীদাকে গলা টিপে হত্যা করেছেন। কালীদার সে মুখ আমি যে আর ভাবতে পারছিনা। এবার, এবার তাহলে আমাকেই পুলিশে খবর দিতে হবে।

শঙ্কর ॥ বেশতো, তাই দিয়ে আয়।

আব্দুল ॥ হ্যাঁ দেবোই। তারপর, তারপর আমি প্রমাণ করবো, আপনি কালীদাকে খুন করেছেন, আমাকে ফেরারী করেছেন, নির্মলদাকে যাবজ্জীবন করাদণ্ড ভোগ করিয়েছেন—আর, আর এই সনৎবাবুর মাকেও আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছেন। পুলিশ, পুলিশ—

[আব্দুল দ্রুত প্রস্থান কবে। শঙ্কব এসে দরজা বন্ধ করে দেয়]

সনৎ ॥ পুলিশ কি দরজা খুলতে পারেনা বাবা ?

শঙ্কর ॥ অ্যাঁ, না, না। ও কিছু না, কিছু না। ···সনৎ, তুই সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছিস। বোস্। এখানে বোস্। ···ছ্যাখ, তোর এই ছবিখানা আমি শুরু করেছিলাম, এখনও শেষ হয়নি। কেমন হচ্ছে দেখ্ দিকি !

সনৎ ॥ আব্দুল যা বল্লে তা সবটাই কি সত্যি ?

শঙ্কর ॥ না-না—না ! মিথ্যে, মিথ্যে—সব মিথ্যে ! ওটা একটা বদ্ধ পাগল। কোন কথা ঠিক্ নয়। ···আমি, আমি তো বলছি—তোকে শুধু মানুষের মত মানুষ করে তুল্‌তেই চেয়েছি। তুই আর কিছু বিশ্বাস করিসনে।

সনৎ ॥ সে কথা আমি জান্‌তে চাই নি বাবা। কালীদা কে ? নির্মল সেই বা কে ? ···কি হোল, কথা বলছেন না যে ?

শঙ্কর ॥ আমি তো ওদের চিনিনা সনৎ !

সনৎ ॥ আশ্চর্য্য ! আব্দুল পাগল বলে প্রমাণিত হলেও ওর সবকথা আমি অবিশ্বাস করতে পারছিনা। কোথায়, কেমন ভাবে, কার সঙ্গে যেন

একটা যোগ রয়েছে। অথচ আপনি সে সবের কিছুই বল্‌তে চাইছেন না। আমি আর ভাবতে পারছিনা বাবা।

শঙ্কর ॥ প্লিজ্‌, প্লিজ্‌ সনৎ, উত্তেজিত হ'স্‌নি বাবা। আমার দিকে চেয়ে ছাখ্‌ আমি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছি। এতটুকু বিহ্বলতা আমার মনকে দোলা দিতে পারেনি। তাইতো তোকে আমি গড়ে তুলেছি।

সনৎ ॥ বাবা, আমিতো ঠিক্‌ বুঝে উঠ্‌তে পারছিনা। শুধু এটুকু বুঝ্‌তে পারছি, আপনি যেন কোথায়...অনেক দূরে হারিয়ে যাচ্ছেন। ...আমার জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে আপনি যেন মিলিয়ে যেতে চান।

[শঙ্কর এক দৃষ্টিতে রজনীগন্ধা ফুলগুলি দেখ্‌তে থাকে]

শঙ্কর ॥ সনৎ, রজনীগন্ধা তোর খুব ভাল লাগে—না? এই ছাখ্‌ এক গোছা রজনীগন্ধা আমি এনে রেখেছি। কেমন সুন্দর ফুলগুলো ছাখ্‌—

[দুহাতে ফুলগুলোকে চেপে ধরে অস্বাভাবিক ভাবে চিৎকার করে ওঠে]

কালীদা...।

সনৎ ॥ বাবা, বাবা, একি করছেন?—বাবা!

শঙ্কর ॥ না, না কিছুনা। কিছুনা। ...সনৎ, এক্ষুণি, এই মুহূর্তে আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। দূরে, অনেক দূরে। আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকৃতে পারছিনা। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। চারিদিকে অন্ধকার—থরে থরে সাজানো অন্ধকার! সনৎ—সনৎ—

সনৎ ॥ কিন্তু কোথায় যাবেন আপনি?

শঙ্কর ॥ কেন, কোথাও যেতে পারবোনা?...কিন্তু, কিন্তু আমি যে পালাতে চাই—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালাতে চাই।...আজ কুড়িটা বছর দেয়াল ঘেরা

রয়েছি, বাইরের আকাশ, পৃথিবী, গাছ-পালা সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করেছি। এখন, এখন চাই শুধু বিরাম।···তুই আমার সব সাধনার শেষ—সমস্ত পাওয়ার অন্তরে!

সনৎ ॥ যদি তাই হয়, তবে সে পরিচয় আমি ভুলে যেতে চাই—

শঙ্কর ॥ সনৎ—!

সনৎ ॥ হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনার পানে তাকিয়ে আমি কি দেখ্‌বো—দিনে রাতে মৃত্যুর আতঙ্কে আধমরা এক মানুষকে? বাইরের পৃথিবী যার কাছে মরুভূমি, প্রতি পদক্ষেপে যার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করছে সারি সারি পাঁচিল—সেই এক এস্কেপিষ্টকে?

শঙ্কর ॥ এস্কেপিষ্ট?—না, না আমি এস্কেপিষ্ট নই···আমি রিফর্মার। তোমাদের ওই প্রচলিত নিয়ম আমি মানিনা।

সনৎ ॥ মানেননা?

শঙ্কর ॥ না।

সনৎ ॥ তাহলে সমস্ত জীবন এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন কেন? ···মুখ তুলে দেশের অগনিত হতভাগ্যের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে, তাদের প্রচলিত নিয়মকে পদাঘাত করে বল্‌তে পারেননি—তোমাদের এই ভুয়ো নিয়ম আমি মানিনা!

শঙ্কর ॥ মাই চাইল্ড, মাই লাভিং চাইল্ড সনৎ, এ তুই কি বলছিস? আমি যে তাহলে ইঞ্জিনীয়র সনৎ রায়কে পেতাম না।···পেতাম, সমাজের আবর্জনা স্তুপে থম্‌কে দাঁড়ান দৃষ্টিহীন সনৎকে। যাকে দেখে লোকে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলে দিত—ঘৃণায় যার মৃত্যু কামনা করতো। তারপর—তারপর একদিন···না, না—আমি বলতে পারবোনা···পারবোনা—

সনৎ ॥ মানুষের কাছে কি পরিচয় আমি দেবো ?

[শঙ্কর এবার দিশাহারা হ'য়ে যায়। ওর চোখের সামনে আগামী দিনের ছবিগুলি ভেসে আসে। যেন ওর বিচার হচ্ছে। হঠাৎ সে দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিৎকার করে ওঠে শঙ্কর। চিৎকার শুনে দরজা খুলে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে আসে নির্মল। গুলী এসে লাগে শঙ্করের একটা হাতে]

শঙ্কর ॥ পুলিশ ! পুলিশ !

নির্মল ॥ আমিও প্রস্তুত—কোথায়, কোথায় পুলিশ ?…একি শঙ্কর তুই ?

সনৎ ॥ (স্বগতঃ) কে ? মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি…কোথায় দেখেছি ! (খবরের কাগজ দেখে) এই তো, এই তো ছবি রয়েছে —যাবজ্জীবন দণ্ডিত আসামীর খুন ক'রে পুনঃ পলায়ন !—নাম, নাম —নির্মল সরকার।

নির্মল ॥ শঙ্কর, শঙ্কর তুই—তোকে আমি !…না, না—এই নে, পিস্তল নে— আমায়ও গুলি কর।

শঙ্কর ॥ থাক্, থাক্ নির্মল। তুই শুধু আমাকে শীলার লেখা ওই চিঠিখানা দে —ওতো কেবল চিঠি নয়, ও আমার কোষ্ঠি—শীলার ছকে দেয়া জীবন ! আঃ—জল—জল—

[পকেট থেকে চিঠিখানা দিয়ে জল আন্‌তে ভেতরে চলে যায় নির্মল]

সনৎ, সনৎ এ আমার প্রেরণা—আমার বেদ—আমার রামায়ণ— মহাভারত ! ছাখ—একটু ছাখ্—

সনৎ ॥ (পড়তে থাকে) শুধু একটি কথা বলে যাই, তুমি খুনী হও, নিষ্ঠুর হয়, তবু তো তুমি বাপ। তোমার আমার একমাত্র সন্তান সনৎকে তুমি মানুষের মত মানুষ করো—সে যেন তোমার ছায়ায় মানুষ না হয়।

[চিঠিখানাকে ভাঁজ করে ফেলে]

শঙ্কর ॥ সনৎ, সনৎ, কাছে আয়। অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রাখবার সময় জীবনে অনেক আসবে। আয়—কাছে আয়।

[নির্মল জল নিয়ে আসে]

সনৎ ॥ না, আমি যাবোনা। খুনী—তুমি দেশের শত্রু, তুমি মানুষের শত্রু, তুমি মায়ের শত্রু—আমারও শত্রু !

শঙ্কর ॥ সনৎ !

[শঙ্করের আর্তনাদে হতবিহ্বল হয়ে যায় নির্মল। জলের গ্লাস নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে সে। এ মর্মান্তিক পরিস্থিতির জন্যে শঙ্করের সমস্ত ক্ষোভ প্রতিহিংসা এসে পড়ে ওরই উপর]

নির্মল ॥ শঙ্কর, খুব কষ্ট হচ্ছে—না? —আমি, আমি যাচ্ছি, এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছি—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

শঙ্কর ॥ না,—না! নির্মল শোন, কাছে আয়—আরো কাছে আয়—হ্যাঁ, আরো, আরো কাছে আয়।

[নির্মল কাছে আস্‌তেই শঙ্কর হঠাৎ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরে। সনৎ তাকে বাধা দিতে যায়—কিন্তু পারে না। নিমেশেই নির্মল মাটিতে পড়ে যায়। সনৎ ভয়ে আড়ষ্ট হয়—এবং শঙ্কর তাকে পিস্তল তুলে গুলী করতে উদ্যত হয়]

শঙ্কর ॥ গেট আউট—গেট্ আউট্ আই সে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও।

সনৎ ॥ বাবা, বাবা, আমি সনৎ—

শঙ্কর ॥ নো, নো এক্সকিউজ —গেট্আউট্। যতদূর পারো চলে যাও। হ্যাঁ—হ্যাঁ—যদি কোনদিন দেখা হয়—তা'হলে ইণ্টারভিউ হবে এই পিস্তলের সাথে—যাও !

[সনৎ বেরিয়ে যেতেই যেন দম্ভে ফেটে পড়ে শঙ্কর]

টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি—তুমি তাকিয়ে দেখ, আমি আজও বেঁচে আছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেঁচে আছি। আমার সনৎ আজ মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ার। তোমরা তাকে খাতির করবে, মান, সম্মান, প্রতিপত্তি সব কিছু দেবে। আমি তাই দেখ্‌বো—সমস্ত জীবন ভরে দেখবো। কিন্তু, কিন্তু আমায় যে বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে। সনৎ সনৎ—আমি বাঁচতে চাই—আমি বাঁচতে চাই !

[অসহায় শঙ্কর, বাঁচার সম্বল কোথাও কিছু দেখতে পায় না। নির্মলকে দেখতে পেয়ে বসে পড়ে ওর কাছে। বুকের কাছে কান নিয়ে দেখে এখনও সে বেঁচে আছে কিনা ! এমনি মুহূর্তে প্রতিহিংসায় উল্লসিত আব্দুল দৃশ্যে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে রয়েছে পুলিস ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল ও সব শেষে সনৎ। সনৎ পিতাকে উদ্দেশ্য করে প্রথম কথা বলে]

সনৎ ॥ ইয়েস, ইয়েস, আই সে হি ইজ্ দি মার্ডারার !

শঙ্কর ॥ কে ? সনৎ ? ও—

পুলিশ ইন্সপেক্টর ॥ ইউ আর আণ্ডার অ্যারেষ্ট। আপনাকে থানায় যেতে হবে।

[শঙ্কর ॥ বেশ, চলুন। আমি তো প্রস্তুত।

[ওরা এগিয়ে যেতেই সনৎ চলে আসে টেবিলের কাছে। ওর সমস্ত দেহ অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁপছে। আব্দুল থেমে থেমে বিকট হাসি হাসে—সে হাসির রেশ সনৎকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় যেন। সকলে বেরিয়ে যেতেই সনৎ ছুটে আসে দেয়ালের ওপর শীলার ছবির কাছে]

সনৎ ॥ আমি জানি, আমি জানি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে মা—তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

[কান্নায় ভেঙে পড়ে সনৎ]

—যবনিকা—

: চরিত্র লিপি :

সুমন্ত—নিখিল ভট্টাচার্য, মানস ঘোষ।

কমলাক্ষ—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সুব্রত বাগচি।

: সোমনাথ—পবিত্র বন্দ্যো, শোভন মজুমদার।

নরসুন্দর—স্বপন ভট্টাচার্য, সুরেশ বিশ্বাস, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

পেশকার—সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, পঞ্চানন

জজ—শ্যামল দাশগুপ্ত, ভানু গাংগুলি।

অবিনাশ—অরুণ ভট্টাচার্য।

অবনী—সুনীল ভট্টাচার্য।

ক্লার্ক—হরিমোহন ঘোষ, লক্ষ্মী দাস।

দারোগা—ইন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ ব্যানার্জি

পুলিশ—সমর, সঞ্জয়, অমল ভট্টাচার্য ও দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

পেয়াদা—সত্যসাধন মজুমদার।

জীবনান্ত

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

আদালতের দৃশ্য। দু'জন উকিল মুখোমুখি বসিয়া আছেন। পেশকার আপন মনে লিখতে ব্যস্ত। ক্লার্ক মাঝে মাঝে এক একটি ফাইল পেশকারকে ছুঁড়িয়া দিতেছে। পুলিশ একটি টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছে। দারোগা সাহেব হঠাৎ "বোগাস্" বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। দেওয়ালের ঘড়িতে দু'টা বাজিতে পনের মিনিট বাকী দেখা যায়। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ ঘরের মধ্যে এক যুবক প্রবেশ করে। তাহার গলায় লাল রুমাল বাঁধা। গায়ে ডোরাকাটা সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে পায়জামা। যুবক শিস্ দিতে দিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। আদালতে উকিলদের দেখিয়া শিস্ থামাইয়া কৃত্রিম ভদ্রতা দেখাইবার জন্য উৎসুক হয়।]

যুবক॥ (পেশকারের দিকে আগাইয়া গিয়া) স্যার, আমার ডাকটি কখন ছাড়বেন বলে দেবেন।

পেশকার॥ কে? ও নরসুন্দর। তা তোমার সুন্দর কান্তি দেখবার জন্যে সাহেবের কতখানি ইচ্ছে তা আমি জানবো কেমন করে।

যুবক॥ কি যে বলেন স্যার (লজ্জার ভান করিয়া), আমরা আবার একটা লোক তা আবার—

ক্লার্ক॥ আহা-হা! চেহারায় গণেশ হলে কি হবে, মানে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তুমি হয়ত অনেককেই ছাপিয়ে যাও, তাই হয়ত—

যুবক॥ আপনারা স্যার ঠাট্টা করতে পারেন। কিন্তু স্যার, আমার পিসীমা কি বলতেন জানেন—

ক্লার্ক॥ কি বলতেন?

যুবক॥ (পূর্ব কথার জের টানিয়া) বলতেন, তোর যা বুদ্ধি তুই বড় হ'লে উকিল, ব্যারিষ্টার হবি।

ক্লার্ক॥ তা কি হয়েছো বাবা?

যুবক ॥ আজ্ঞে তাদের মতো কেউ না হতে পারলেও ঘোরাঘুরি করছি তাদেরই আশেপাশে। এ জন্মে হাওয়া লাগুক আসছে জন্মে তাদের কেউ একজন না হয়ে যাব না নিশ্চয়ই।

পেশকার ॥ কিন্তু নরসুন্দর, তোমার পটুয়াটোলার বস্তীর যে হাওয়া লেগেছে তা কি সাতজন্মে মুছবে গোপাল; তাছাড়া ওদের উইলে তোমার নাম যে একেবারে ছাপার অক্ষরে মক্‌স করা হয়ে গেছে।

নরসুন্দর ॥ তবু জানবেন স্যার, কাকের বাসায় মানুষ হলেও কোকিল কোকিলই থাকে। (পেশকার ও ক্লার্ক উভয়েই হাসিয়া ওঠে, এবং ক্লার্ক বলে)

ক্লার্ক ॥ (হাসিতে হাসিতে পেশকারের দিকে চাহিয়া) এই না হ'লে পেশাদারী সাক্ষী হওয়া যায়!

নরসুন্দর ॥ যতটুকু চোখে দেখি ততটুকুই বলি স্যার। ভগবানের ইচ্ছেয় আমার সামনেই বেশীর ভাগ ঘটনা ঘটে। তাই সত্য বৈ মিথ্যা প্রকাশ হবার আশংকায় আমাকে এজলাসে হাজির হতে হয়। কিন্তু স্যার, তাই বলে পেশাদারী সাক্ষী বলা চলে কি?

পেশকার ॥ অনেক ডেঁপোমী হয়েছে এবার এসো।

নরসুন্দর ॥ কিন্তু স্যার, কটায় হাজিরা দিতে হবে জানলে একটু ভাল হ'ত।

ক্লার্ক ॥ কেন, আব একটা এজলাসে হাজিরা দিতে হবে নাকি?

নরসুন্দর ॥ স্যার, মানে একটি কেশ আছে বুঝতেই ত' পারছেন।

[নরসুন্দরের কথা শুনিয়া একজন উকিল নিজের ব্রীফ ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল মুখাবয়ব। প্রখর দৃষ্টিভঙ্গী। এই ভদ্রলোকের নাম সোমনাথ মুখার্জি। আসামী পক্ষের উকিল। সোমনাথবাবুকে উঠিতে দেখিয়া নরসুন্দর ভয় পাইয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়াছে বোঝা যায়।]

সোমনাথ ॥ তার মানে তুমি কি সাক্ষী দিয়েই বেড়াও নাকি ?

নরসুন্দর ॥ ইয়ে—কৈ—নাতো স্যার।

সোমনাথ ॥ তবে যে বললে আর একটা সাক্ষী আছে।

নরসুন্দর ॥ (মৃদু হাসিয়া) আমার বৌ স্যার। বাপের বাড়ী থাকবার সময় ঘটনাচক্রে একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে। চেপে গেলে পারতুম। কিন্তু স্যার সত্যির সপক্ষে চিরকাল রায় দিয়ে নিজের অর্ধাঙ্গীনীকে একাজ থেকে কেমন করে দূরে সরিয়ে রাখি বলুন। তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে।

সোমনাথ ॥ তবে যে বললে তোমার সাক্ষী আছে।

নরসুন্দর ॥ আধে আধেই ত' এক হয় স্যার।

[সকলেই অনুচ্চস্বরে হাসিয়া ওঠে। জোরে হাসেন সরকারী উকিল কমলাক্ষ রায়। সোমনাথ বসিয়া পড়ে। বৃদ্ধ কমলাক্ষ রায় চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া আর একদফা হাসেন।]

(পেশকারকে) তাহ'লে স্যার জানা গেল না। আমি এখন যাই স্যার। যখন ডাক পড়বে—

পেশকার ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তখনই আসবে। যাও, যাও, টিফিনের সময়টা একটু জিরোতে দাও।

[নরসুন্দর বাহির হইয়া যায়। কমলাক্ষ সোমনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া কথা বলে]

কমলাক্ষ ॥ তাহ'লে হেরে গেলে ভায়া ?

সোমনাথ ॥ অগ্নিবান ছেড়েছিলাম। বাছাধনের কাছে জল থাকায় বিফল হলাম। তবে এর পরের বানও আমার কাছে আছে। আশা করি তাতে বাবুকে ঘায়েল করতে পারব।

কমলাক্ষ॥ ভায়া, এই করে চুল পাকালাম। পেশাদারী সাক্ষীদের জব্দ করা দূরে থাক্, তাদের হেঁয়ালীর আশেপাশেও ঘুরতে পারলাম না। কি জানো ভায়া, বীরের পরাজয়ে অপমান আছে, কিন্তু যারা ভীরু তাদের পরাজয় হওয়াটা অভ্যাস।

সোমনাথ॥ দেখুন যদি ইচ্ছা করি তাহ'লে এই পেশাদারী সাক্ষীর অভিনয়গুলো কি আমরা বন্ধ করতে পারি না।

কমলাক্ষ॥ না ভায়া, তা পারি না। প্রথমেই প্রশ্ন পেশাদারী সাক্ষী যাকে বলব, সে যে পেশাদারী সেটা প্রমাণ করব কি করে?

সোমনাথ॥ আমরা আইনজীবিরা যদি একত্র হয়ে তাদের বিরুদ্ধতা করি এবং দিনের পর দিন প্রমাণ করি যে এই আদালত থেকে ঐ আদালতে তারা শুধু সাক্ষী দিয়েই বেড়ায় তাহ'লে এসব অনায়াসেই বন্ধ করা যায়।

কমলাক্ষ॥ তা করা যায় না ভাই। কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই তারা স্বচক্ষে দেখেছে তাই সাক্ষী দিতে এসেছে। যাহা বলিতেছি তাহা সত্য বৈ মিথ্যা নয়, তাই ধরে নেওয়া হয়। অতএব—

সোমনাথ॥ কিন্তু সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে শাস্তির কোনও ব্যবস্থা করি না বলেই—।

কমলাক্ষ॥ করিনা, কারণ সাক্ষীকে শাস্তি দিতে হলে আরও অনেককে শাস্তি দিতে হয়। গোড়া ধরে নাড়া দিলে নিজের পায়ের তলার মাটি কাঁপবার সম্ভাবনা নেই কী?

সোমনাথ॥ কিন্তু অন্যায়ভাবে সাক্ষ্য দিয়ে হ্যাঁ কে না বলে—

কমলাক্ষ॥ তোমার পক্ষে আইনজীবি হয়ে বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সোমনাথ॥ কত দুঃখে যে মাঝে মাঝে এই সমস্ত কথাগুলো বেরোয় তা আপনার নিশ্চয়ই জানতে বাকী নেই। মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে একটা

মানুষকে আমরা অমানুষ হিসাবে দেখাই, একটা সৎলোককে আমরা শাস্তি দিই।

কমলাক্ষ॥ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ। ন্যায়ের পথে থেকে সব সময় আমরা উপযুক্ত প্রমাণ সহ আমাদের যুক্তিগুলো খাড়া করি। কাজীর খেয়াল-এর উপর নির্ভর করে আমাদের বিচার হয় না।

সোমনাথ॥ আপনার কথা আমি মানি। কিন্তু মানবিকতা—সেটার কি কোন দামই নেই?

কমলাক্ষ॥ আছে বলেই ত জুরীরা রয়েছেন। আইনের ওপরও জজসাহেব মানবিকতার দাম দেন। কিন্তু ভায়া, যে লোক সুস্থ অবস্থায় ফুলশয্যার রাত্রে তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে, তাকে—

সোমনাথ॥ (অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) ভুল, ভুল, ভুল! সুমন্তবাবু যে সেই সময় সুস্থ ছিলেন না, সে বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত।

কমলাক্ষ॥ বেশ ত উত্তেজিত না হয়ে আদালতে সেটা প্রমাণ করুন।

সোমনাথ॥ প্রমাণ আমি করবই। কিন্তু আপনারা কি প্রমাণে তাকে হত্যাকারী বলে সাব্যস্ত করেছেন বলতে পারেন?

কমলাক্ষ॥ এ প্রসংগ আর বাড়াতে চাই না, ভায়া। নিজেদের খেয়োখেয়িতে চলে আস্‌ছি।

[দারোগা কতগুলো ফাইল লইয়া হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করে এবং গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় চেয়ারে বসিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে।]

দারোগা॥ ল্যাজটি খসিয়ে দিয়ে ভগবান যে আমাদের ওপর কি অবিচারই করেছেন, তা এই চাকরি না হলে কেউ বুঝতে পারবে না।

পেশকার॥ কি হোল আবার দারোগাবাবু?

দারোগা ॥ হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। এক সংগে সাত সাতটা কেস্ পড়েছে একদিনে। এর ওপর বিরেশ্বরবাবু আবার অসুস্থ। ছুটি নিয়ে বসে থাকলেন তিনি। এদিকে এ শালা ম'ল কি বাঁচল তার কেউ খোঁজই করেনা।

ক্লার্ক ॥ সে দরকার হ'লে আপনিও কি ছুটি নেবেন না নাকি দারোগাবাবু?

দারোগা ॥ থাক্, তোমাকে আর ডেঁপোমী করতে হবে না। দু'দিন এসেই ফাজলামি শুরু করেছ, না। ওহে ছোক্‌রা, এই আদালতের জন্ম থেকেই আমি আছি বুঝলে!

পেশকার ॥ হ্যাঁ, তুমি আবার এর মধ্যে মাথা গলাতে আসছ কেন, বিশ্ব? হচ্ছে আমাদের বুড়োয় বুড়োয় কথা, তা তোমার আবার নাক গলাবার দরকারটা কি?

দারোগা ॥ এই—এই হয়েছে পেশকারবাবু। এই হয়েছে। ধর্ম, দয়া, মায়া সব চলে গেছে। এই ঘোর কলিতে শুধু হত্যা আর রাহাজানী। এই সব নিয়ে বেঁচে আছে এরা। বুঝতেও পারছেন সব বাছাধনেরা!

পেশকার ॥ কে আর বুঝছে বলুন, দারোগাবাবু?

দারোগা ॥ হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছে মশাই, হাড়ে হাড়ে বুঝছে। আগে জেলায় একটা খুনে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। আর আজ দেখুন, খুন করাটা যেন কিছুই নয়। আরে মশাই, আগে যেমন আমরা ছিঁচকে চোর ধরতাম যখন তখন আজকাল খুনে ধরি ঠিক তেমনি।

পেশকার ॥ সে ত হামেশাই দেখতে পাচ্ছি দারোগাবাবু। আরে মশায়, এই সব দেখেশুনে বাঁচার ইচ্ছে একেবারেই চলে গেছে। কবে যে ভগবান আমার ডাক শুনবেন। হরি হে শ্রীহরি পার করো!

দারোগা ॥ অনেক দেরী মশাই, অনেক দেরী। এই পাপের পৃথিবীতে একবার যখন চোখ চাইতে হয়েছে, তখন ভাগ্যে যে আরও কত দুঃখ আছে, তা জানাই আছে।

ক্লাক ॥ জানাই যখন আছে, তখন আর আশ্চর্য্য হন কেন দারোগাবাবু ?

দারোগা ॥ ননসেন্স ! বুঝলেন পেশকারবাবু, এইসব ছোকরাই হচ্ছে আজকের খুনীর দল ।

ক্লার্ক ॥ তার মানে—

দারোগা ॥ চুপ বেয়াদব ছোকরা । নইলে মশায় ফুলসজ্জার রাত্রি, আহা হা, জীবনে দুবার পেলাম না বলে দুঃখ রাখবার জায়গা পাচ্ছি না—আর কিনা সেই রাত্রিতে একটা মদ্দ জোয়ান অমন বউটাকে গলাটিপে হত্যা করল ! (হঠাৎ করুণভাবে) আহা-ফুলের মতো মেয়ে মশাই । মড়া দেখে দেখে চোখ পচে গেছে । কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখে চোখের জল আর রাখতে পারিনি । মাথায় একটা ফুলের মালা জড়ানো, গলার মালাটি তখনো ছেঁড়েনি, লাল বেনারসীর ওপর খয়েরী রঙের ভেলভেটের জামা । কপালে চন্দনের টিপ্ । সত্যি বলছি তখনও তাঁর হাসিমুখ মিলিয়ে যায়নি ।

পেশকার ॥ যাক্ দারোগাবাবু— ।

দারোগা ॥ কিন্তু আমাকে যে চোখে দেখতে হয়েছে পেশকারবাবু । আমার মনে হয় রাক্ষসটা যখন ওর গলা টিপে ধরেছিল, তখনও মেয়েটি ভেবেছিল তার প্রিয় স্বামী হয়ত তাকে বুকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে । মেয়েটির মুখের হাসি—

[সোমনাথ অধৈর্য হইয়া ওঠে এবং চীৎকার করিয়া ওঠে ।]

সোমনাথ ॥ স্টপ ইট । প্লিজ স্টপ ইট ।

দারোগা ॥ (ততোধিক জোরে)—অথচ সেই রাক্ষসটার পক্ষ নিয়েই ত' আপনি আদালতে এসেছেন ।

[চীৎকার শুনিয়া পুলিশ উঠিয়া পড়ে ও জজের ঘরের দিকে যায়।]

সোমনাথ। সে যে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, এটাই প্রমাণ করতে এসেছি।

দারোগা॥ কেবল বউ-এর ওপর তার এই অস্বাভাবিকতার প্রকাশ কেন, উকিল মশায় ?

সোমনাথ॥ (আহত হয়ে) সেটা জানিনা বলেই ত' দুঃখ হচ্ছে।

কমলাক্ষ॥ তাই বলছি ভায়া, ভাবালুতার কোন স্থান আদালতে নেই।

সোমনাথ॥ কিন্তু যে লোকটি নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশের জন্য, আমাদের জন্য এতখানি করলো, আজ তার সম্বন্ধে এরকম জঘন্য চিন্তা করা কি অন্যায় নয় ?

দারোগা॥ সৎকাজের বাহবা দিতে আমরা যেমন জানি তেমনি অসৎকাজ বা পাপের বিচার করতেও আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই না।

সোমনাথ॥ পাপ আপনি নিজে করেন না ?

দারোগা॥ ব্যক্তিগত প্রশ্নের লাইসেন্স আপনাকে দেওয়া হয়নি ; কে আমার হরিদাস—

কমলাক্ষ॥ আঃ, কি হচ্ছে কি আপনাদের ! এটা যে আদালত আপনারা কি ভুলেই গেলেন ?

[কমলাক্ষের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আদালতে প্রবেশ করে এবং জজের আগমন বার্ত্তা সকলকে শোনায়।]

পুলিশ॥ জজসাহেব আসছেন, আপনারা সব প্রস্তুত হোন্।

[জজসাহেব মঞ্চে প্রবেশ করেন। সকলে উঠিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখায়। দারোগাবাবু আসামীকে আনিবার জন্য নির্দেশ দেওয়ায় পুলিশ চলিয়া যায়। জজ তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন।]

জজ ॥ কমলাক্ষবাবু, আজ সুমন্ত গুপ্তের কেস্‌টা শেষ করতে চাই।

[পুলিশ আসামী সুমন্ত গুপ্তকে লইয়া আসিয়া কাঠগড়ায় ঢুকাইয়া দেয়। সুমন্তের বয়স অনধিক ত্রিশ বৎসর, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল অবিন্যস্ত, চক্ষু কোটরাগত, দৃষ্টির মধ্যে অস্বাভাবিকতা। যুদ্ধের ঘটনা আবোল-তাবোলভাবে বলিয়া চলে। আদালতের কাজে বাধা পড়ে। কিন্তু কেহ অনুরোধ করিলে চুপ করিয়া যায় এবং তখনকার মত তাহাকে লজ্জিত মনে হয়। কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াই বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া ওঠে।]

সুমন্ত ॥ হিয়ার ইজ কমাণ্ডার সুমন্ত গুপ্ত, রিপ্রেজেন্‌টেটিভ অব্‌ দি লাস্ট গ্রেট্‌ ওয়ার। এনিথিং টু সে প্লিজ? বাট আই মাস্ট নট ওবে ইউ। কমাণ্ডার নেভার এন্‌সারস্‌। ইয়েস, কমাণ্ডার······ইয়েস্‌···

জজ ॥ উইল ইউ প্লিজ হেল্‌প আস্‌? মিষ্টার গুপ্ত, উইলইউ প্লিজ······

সুমন্ত ॥ ওঃ ইয়েস, আমি দুঃখিত স্যার।

জজ ॥ পেশকার, পূর্বের সাক্ষীকে ডাকা হোক।

পেশকার ॥ (পুলিসকে) পূর্বের সাক্ষী শ্রীঅবনী সেন।

[পুলিস দরজার বাহির হইতে চীৎকার করিয়া সাক্ষী অবনী সেনকে ডাকে। একটি সুদর্শন যুবক আদালতে প্রবেশ করে এবং কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। উকিল সোমনাথ মুখার্জি আগাইয়া আসিয়া তাহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন।]

সোমনাথ ॥ আচ্ছা অবনীবাবু, মিসেস্‌ নীলা গুপ্তা আপনার বোন, তাই না?

অবনী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সহোদরা।

সোমনাথ॥ আপনার বোন যেদিন মারা যান সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন ?

অবনী॥ আমি তখন আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে ছিলাম।

সোমনাথ॥ ঐদিন উৎসব বাড়ীতে আপনি আসেন নি ?

অবনী॥ এসেছিলাম। খাওয়া দাওয়া করে বাবাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যাই।

সোমনাথ॥ দেরী করে গেলেন না কেন ?

অবনী॥ আমাব বাবা পক্ষাঘাতে ভুগছেন। তাঁর একমাত্র মেয়ের অনুরোধেই কোনক্রমে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু বেশী রাত্রি হলে পাছে তিনি কষ্ট পান, এই জন্য রাত্তির ন'টার মধ্যে তাঁকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাই।

সোমনাথ॥ যাবার সময় সুমন্তবাবু আপনাকে কিছু বলেছিলেন ?

অবনী॥ সুমন্ত পরদিন সকালে ওর ওখানে আসবার জন্য আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল।

সোমনাথ॥ গিয়েছিলেন পরের দিন ?

অবনী॥ না, তার আগেই রাত দু'টোর সময় ফোনে বোনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সুমন্তের বাড়ী যাই।

সোমনাথ॥ গিয়ে কি দেখলেন ?

অবনী॥ পুলিসের লোকে ঘর ভর্তি। লোকজন দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে। আর সুমন্ত ঘরের ভিতর পায়চারী করছে। একটা খাম ছিল তার হাতে।

সোমনাথ॥ খাম ?

অবনী॥ হ্যাঁ, একটা নীলরঙের মোটা কাগজের খাম।

সোমনাথ॥ খামটা কোথায় ?

অবনী ॥ সেটা আমার জানার কথা নয়।

সোমনাথ ॥ কার জানার কথা সেটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি। আপনি জানেন কিনা তাই বলুন।

কমলাক্ষ ॥ ইওর অনার, খামটা পুলিস-তরফ থেকে আদালতে জমা 'দেওয়া হয়েছে। আই মিন পিপল্ এক্সিবিট নং ৮।

জজ ॥ (ক্লার্ককে) খামটা দেখান।

[ক্লার্ক খামটি সোমনাথকে দেয়।]

সোমনাথ ॥ এটাই কি সেই খাম ?

অবনী ॥ সেই রকমই দেখতে।

সোমনাথ ॥ আপনি জানেন এর ভেতর কি আছে ?

অবনী ॥ ওটা যদি সেই খাম হয় তবে নিশ্চয়ই জানি। আমার বোন ওর ভেতর কতগুলো পেপার কাটিংস্ রেখেছিল।

সোমনাথ ॥ বাট্ হোয়াই ?

অবনী ॥ কারণ সুমন্ত যুদ্ধে যাবার পর তার কৃতিত্বের সংবাদগুলো নীলা অতি সযত্নে সংগ্রহ করতো।

সোমনাথ ॥ সুমন্তবাবুর সঙ্গে আপনার বোনের তাহ'লে পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল ?

অবনী ॥ যুদ্ধটা এসে না গেলে তাদের অনেক আগেই বিয়ে হোত।

সোমনাথ ॥ তাহ'লে বিয়ের আগে মাথার ওপর মৃত্যুর খড়্গ ঝুলছে জেনেও সুমন্তবাবু যুদ্ধে যোগদান করলেন কেন ?

কমলাক্ষ ॥ ইওর অনার, আমাদের এই সমস্ত সংবাদগুলো জানার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

জজ ॥ মিঃ মুখার্জি, আমাদের কেস-এর সংগে এর কোন যোগ আছে কি ?

সোমনাথ॥ আছে ইউর অনার, আশাকরি আমি তা এখনই প্রমাণ করতে সক্ষম হবো।

জজ॥ দেন প্রসিড।

সোমনাথ॥ থ্যাঙ্কু, ইওর অনার। হ্যাঁ…অবনীবাবু, ওসময় সুমন্তবাবু যুদ্ধে গেলেন কেন?

অবনী॥ ও বলেছিলো, 'এই সংকট সময়ে বিবাহের আনন্দে মেতে থাকা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। আমি একজন কৃতকর্মা যুবক হ'য়ে দেশকে রক্ষা করার কাজে সাহায্য করব নিশ্চয়ই।'

সোমনাথ॥ তাহ'লে দেশের প্রতি মমত্ববোধের জন্য, দেশ রক্ষার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সুমন্তবাবু যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, তাই না?

অবনী॥ তাই বলেই ত' মনে হয়।

সোমনাথ॥ প্লিজ নোট ইওর অনার। আজ যাকে আমরা খুনী বলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি, তিনি দেশকে রক্ষার জন্য, স্বদেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধের তাড়নায় স্ব-ইচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

কমলাক্ষ॥ আমার মনে হয় ইওর অনার, তাতে খুনীর খুনের অপরাধকে লঘু করে দেখা যায় না। মাতৃস্তন পান করে যে মানুষ বড় হয়, সেই মানুষকেই আবার মাতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হতে দেখা যায় নি কি?

সোমনাথ॥ আমার বন্ধুকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে সুমন্তবাবু তার শিশু অবস্থায় যুদ্ধে যাননি।

জজ॥ ডোণ্ট ইনটারাপ্ট, মিঃ রায়। প্লিজ প্রসিড অন, মিঃ মুখার্জি।

সোমনাথ॥ আচ্ছা অবনীবাবু, সুমন্তবাবু কত বছর যুদ্ধে ছিলেন?

অবনী॥ তিন বছর চার মাস।

সোমনাথ॥ এরমধ্যে একবারও তিনি দেশে ফিরে আসেন নি?

অবনী ॥ না, যুদ্ধে যাবার পর সে একবারও দেশে ফিরে আসেনি।

সোমনাথ ॥ এর মধ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যাতে সুমন্তবাবু আপনার বোনকে অবিশ্বাস করতে পারেন ?

অবনী ॥ সেটা যে ঘটতে পারে না, পেপার কাটিংস্‌-গুলোই তার প্রমাণ।

কমলাক্ষ ॥ এ অত্যন্ত অপমানজনক প্রশ্ন। একটা পরিবারের প্রতি বিনা প্রমাণে কেবলমাত্র কতকগুলো অনুমানের বশে এইভাবে কলঙ্ক লেপন করার অধিকার এ আদালতের আছে কিনা তা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে, ইওর অনার।

জজ ॥ আপনি কোন প্রমাণ দিতে পারেন, মিঃ মুখার্জি ?

সোমনাথ ॥ সুমন্তবাবুর সঙ্গে আর একজনের কৃতিত্বের সংবাদ এই খামে স্থান পেয়েছে। তার নাম শ্রীঅজিত চৌধুরী। নীলা দেবার মৃত্যুর পর ঐ কাগজের কাটিংসগুলো দেখা গিয়েছে। কেবল ঐটুকু ধাঁধাঁ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি এই প্রশ্ন করেছি, ইওর অনার।

অবনী ॥ অজিত আমার মাসতুতো ভাই। সুমন্তর কথায় ইন্‌স্‌পিরেশান্‌ পেয়ে সে যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে সে—

সোমনাথ ॥ মিঃ সেন ?

অবনী ॥ —মারা যায়।

সোমনাথ ॥ আই এ্যাম এক্সট্রিমলি সরি মিঃ সেন। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই, মাই লর্ড।

[সোমনাথ লজ্জিত হইয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া পড়ে। জজ কিছু বলিবার চেষ্টা করিলে সুমন্তের চীৎকারের মাঝে তাহা ডুবিয়া যায়]

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড, দি সেম আটারিংস্‌—জোসেফ, ডিয়ার জোসেফ—

কমলাক্ষ ॥ ইওর অনার—(চীৎকার করিয়া জজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ।)

জজ ॥ ওকে বলতে দিন মিঃ রায়।

সুমন্ত ॥ (আগের কথার জের টানিয়া) যুদ্ধের পশুগুলোর কাছে ঐ ধর্মপ্রাণ মানুষটা কি অন্যায় করেছিল? মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলা তার কাছে অপরাধ ছিল। পশুটা সামনে এলে জোসেফ বন্দুক ফেলে দিয়ে ভগবানকে ডেকেছিল। হাত তুলে চীৎকার করেছিলো, মাই লর্ডস্, মাই হেভেনস্, (চীৎকার কোরে) তুমি শুনেছিলে তার কথা। তার দেহটার ওপর যখন পশুটা পর পর পাঁচবার ওরই বন্দুকের খোঁচা দিল। জোসেফ যখন তোমাকে ডাকতে ডাকতে শুয়ে পড়েছিল, শুনেছিলে তার কথা? ইউ ইডিয়ট, হ্যাভ ইউ হার্ড ছাট আটারিংস্? বরফের ওপর যখন জোসেফের হৃৎপিণ্ডটা গলে গিয়ে লাল হয়ে উঠেছিল, তখন তুমি দেখেছিলে সে দৃশ্য? কাম ডাউন, আই স্যাল ফাইট উইদ ইউ। কাওয়ার্ড…একটা কাওয়ার্ড। আই এগেন চ্যালেঞ্জ ইউ… হাঃ—হাঃ—হাঃ—(সুমন্তের হাসিতে সমস্ত আদালত কাঁপিয়া উঠে।)

কমলাক্ষ ॥ সুমন্তবাবু, মিঃ গুপ্ত, আমরা এসবের বিচার করব। আপনি বলুন কি ঘটেছিলা সে রাত্রে?

সুমন্ত ॥ বিচার। তুমি জানো কত লোকের পাজরা বোন ডাষ্ট-এ পরিণত হয়েছিল? তার বিচার তোমরা করবে? হাঃ হাঃ হাঃ—

জজ ॥ সুমন্তবাবু, প্লিজ হেল্প আস্। প্লিজ…

সুমন্ত ॥ (মুহূর্তে শান্ত হইয়া) আই এ্যাম সরি স্যার।

[সুমন্ত কাঠগড়ার ভিতর বসিয়া পড়ে।]

জজ ॥ মিষ্টার রায় সাক্ষীকে কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে করতে পারেন।

কমলাক্ষ ॥ থ্যাঙ্ক্ ইউ, ইওর অনার। (কাঠগড়ার নিকট গিয়া প্রশ্ন করেন।) আচ্ছা মিঃ সেন, বিবাহের পূর্বে আপনার বোন এ বিবাহে কোন আপত্তি করেছিলেন?

অবনী ॥ না। নীলা এ বিবাহে কোন আপত্তি করে নি।

কমলাক্ষ ॥ অন্য কেউ?

অবনী ॥ বাবা বরং একটু আপত্তি করেছিলেন।

কমলাক্ষ ॥ কারণ?

অবনী ॥ কারণ, আমার যতদূর মনে হয় অজিতের মৃত্যু। তাছাড়া নীলা ওর কাছ থেকে একটা মহিলার ফটো নিয়ে বাবাকে দেখায়। আর সুমন্ত ইদানিং কিছুটা আনমাইণ্ডফুল হয়ে উঠেছিলো। মানুষের ভাল কাজগুলোকেও সে ছোট নজরে দেখতো।

কমলাক্ষ ॥ ফটোটা আপনি দেখেছিলেন?

অবনী ॥ না—তবে মহিলার ফটোর তলায় সুমন্ত নাকি লিখে রেখেছিলো —ট্রেইটর।

সুমন্ত ॥ (হঠাৎ দাঁড়াইয়া) ট্রেইটর! আমার মা'ও যদি শত্রুকে সাহায্য করেন তবে সেও ট্রেইটর। আমি সন্তান বলে তাকে ক্ষমা করব না। আই মাষ্ট কিল হার। তাকে গলাটিপে—(চারিদিকে একবার চাহিয়া পুনরায় বসিয়া পড়ে। সোমনাথ উঠিয়া জজকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে)

সোমনাথ ॥ দেয়ার লাইজ দি মিস্ট্রি ইওর অনার। আমার মনে হয় ঐ খানেই কোনও রহস্য অনাবিস্কৃত থেকে যাচ্ছে।

কমলাক্ষ ॥ শার্লক হোমস্ রহস্যের সেই অন্ধকারটা দূর করলেই পারেন!

[সোমনাথ আবার চেয়ারে বসিয়া পড়ে]

আচ্ছা অবনীবাবু, বলতে পারেন, সুমন্তবাবু এ বিবাহে কেন আপত্তি করেছিলেন?

অবনী ॥ আমাদের কিছুই বলেনি। নীলাকে বলেছিল—এই যুদ্ধের পৃথিবীতে আমি আর ইন্ধন যোগাব না। শেষে আমরা সবাই বুঝতে পেরে—

ছিলাম কোন ঘটনায় সুমন্ত খুবই আঘাত পেয়েছে আর সেইজন্যেই সে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থও বটে।

কমলাক্ষ॥ এত সত্বেও নীলা দেবী তাকেই বিবাহে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কেন ?

অবনী॥ নীলা তাকে সত্যিই ভালবাসতো। ওকে সহজ করে আনবার প্রতিজ্ঞা করেই সে জেদ ধরলো যে সুমন্তকে বিবাহ করবে।

কমলাক্ষ॥ দ্যাটস্ অল ইওর অনার। অবনীবাবুকে আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই।

জজ॥ (অবনীকে) আপনি যেতে পারেন। পেশকার, পরবর্তী সাক্ষী।

[পেশকার দ্বিতীয় সাক্ষী নরসুন্দর দাসকে ডাকিতে বলে। পুলিশ দরজার নিকট হইতে চীৎকার করিয়া নরসুন্দর দাসকে ডাকে। পূর্ব পরিচিত সেই নরসুন্দর গলায় একটা রুমাল পাকাইতে পাকাইতে এবং অমায়িক-ভাবে হাসিতে হাসিতে জজকে নমস্কার করে এবং কাঠগড়ার দিকে যায়। সোমনাথ তাহাব দিকে তাকাইয়া থাকে। পেশকার তাহাকে শপথ করায়। কমলাক্ষ তাহার দিকে আগাইয়া জেরা সুরু করে।]

কমলাক্ষ॥ আপনার নাম ?

নরসুন্দর॥ আজ্ঞে শ্রীনরসুন্দব দাস।

কমলাক্ষ॥ কোথায় থাকেন ?

নরসুন্দর॥ ৩।২ সি, পটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা।

কমলাক্ষ॥ আপনি সুমন্ত গুপ্তকে চেনেন ?

নরসুন্দর॥ চিনবো না কেন স্যার, উনি'যে আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকেন।

কমলাক্ষ॥ এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ?

নরসুন্দর॥ ঐদিন রাত্রে এক মহিলার চীৎকার শুনে আমি ওদের ফ্ল্যাটে দৌড়ে যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম সুমন্তবাবু তার স্ত্রীকে গলা টিপে ধরেছেন, আর তার স্ত্রী নেতিয়ে পড়েছেন।

কমলাক্ষ॥ দ্যাটস্ অল, ইওর অনার।

[সোমনাথ আগাইয়া আসিয়া জেরা সুরু করেন।]

সোমনাথ॥ আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে?

কমলাক্ষ॥ মোষ্ট অবজেক্‌সানেবেল্, ইওব অনার।

জজ॥ অবজেক্‌শান্ সাসটেইণ্ড।

সোমনাথ॥ আপনি কোথায় থাকেন?

নরসুন্দর॥ আজ্ঞে কোলকাতাতেই থাকি।

সোমনাথ॥ আগে অন্য কোথায় ছিলেন নাকি?

নবসুন্দর॥ মাঝে মাঝে ছিলাম এদিক ওদিক।

সোমনাথ॥ কথাটা পরিস্কার করে বলুন।

নরসুন্দর॥ বিশ্বাস করুন স্যার, কোন গালাগাল আপনাকে দিইনি।

[সকলে হাসিয়া ওঠে। সোমনাথ তাহাকে ধমকায়। নরসুন্দর বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া থাকে]

সোমনাথ॥ আমি জিজ্ঞাসা করছি, এক বছর বা তার বেশী আপনি কোলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও ছিলেন কিনা?

নরসুন্দর॥ না স্যার।

সোমনাথ॥ সত্যি কোরে বলুন!

নরসুন্দর॥ সত্যি বলছি স্যার, হলফ কোরে বলছি হুজুর, (জজকে উদ্দেশ্য করিয়া) আমি কোথাও ছিলাম না।

সোমনাথ॥ বেশ। আচ্ছা আপনি হত্যার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাই না?

নরসুন্দর ॥ ওমা ! ওদের ফুলসজ্জার ঘরে আমি পরপুরুষ থাকি কেমন কোরে স্যার।

[সকলে হাসিয়া ওঠে]

সোমনাথ ॥ আমি জিজ্ঞাসা করছি, সে রাত্রে হত্যার পরের ঘটনা আপনি জানেন কিনা ?

নরসুন্দর ॥ নিশ্চয়ই স্যার। সে রাত্রে দি অন্‌লি ম্যান্ হিসাবে আমিই সাক্ষী।

সোমনাথ ॥ মানে ?

নরসুন্দর ॥ ঐ ইংরিজী বলতে গেলেই ভুল হ'য়ে যায় স্যার, মাফ কোরবেন। সে রাত্রে আমিই সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

সোমনাথ ॥ বড় কিংবা ছোট তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আপনি বলতে পারেন—হত্যাকারী কে ?

নরসুন্দর ॥ নিঃসন্দেহে, সুমন্তবাবু্।

সোমনাথ ॥ কি কোরে নিঃসন্দেহ হলেন ?

নরসুন্দর ॥ এখন পাগলামীর ভান করলে কি হবে স্যার, জহুরী আসল জহর চেনে। তখনকার হাবভাব দেখে সহজেই ধরা যায় সুমন্তবাবু্ খুনী।

সোমনাথ ॥ (রাগতভাবে) সেইটাই ত' জানতে চাইছি, কেমন করে বুঝলেন সুমন্তবাবু্ খুনী ?

নরসুন্দর ॥ ওদের মধুযামিনী ঘরে কি তাহ'লে অন্য কেউ ছিল স্যার ?

সোমনাথ ॥ বাজে বকবেন না। আপনি কি করে জানলেন তাই বলুন !

নরসুন্দর ॥ খুব জোরে একটা চীৎকার শুনে আমি সোজা ওপরে চলে যাই।

সোমনাথ ॥ কোথা থেকে চীৎকারটা শুনতে পেলেন ?

নরসুন্দর ॥ রাস্তা থেকে।

সোমনাথ ॥ অত রাত্রে আপনি রাস্তায় ?

নরসুন্দর ॥ (ঢোঁক গিলিয়া) হয়েছে কি স্যার, আমার স্ত্রীর বড় বাড়াবাড়ি সেদিন।

সোমনাথ ॥ কি হয়েছিলো ?

নরসুন্দর ॥ (তাড়াতাড়িতে) বাচ্ছা হবার সময় হয়েছিলো।

সোমনাথ ॥ আপনাদের বিবাহ কতদিন হয়েছে ?

নরসুন্দর ॥ তা স্যার প্রায় এক বছর হোল।

কমলাক্ষ ॥ ইওর অনার, এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের কি কোন প্রয়োজন আছে ?

সোমনাথ ॥ আছে কিনা তা আমি এখনই প্রমাণ করছি।

জজ ॥ দেন প্রসিড অন্।

সোমনাথ ॥ ও তাহলে আপনি ঐ সময় রাস্তা দিয়ে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলেন ?

নরসুন্দর ॥ (বিগলিতভাবে) ঠিক ধরেছেন ত' স্যর !

সোমনাথ ॥ সব কিছুই আমাদের ধরে নিতে হয়। আচ্ছা দাসবাবু, এই হত্যার ঘটনা কতমাস আগে ঘটেছিল বলতে পারেন ?

নরসুন্দর ॥ তা স্যার সাতমাস হয়ে গেল।

সোমনাথ ॥ তাহ'লে আপনাদের বিবাহের তখন পাঁচমাস তাই-না ?

নরসুন্দর ॥ হ্যাঁ স্যার।

সোমনাথ ॥ এই পাঁচমাসে আপনার স্ত্রীর কিভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হোল, বলতে পারেন ?

[নরসুন্দর থতমত খাইয়া যায়। উপস্থিত সকলেই হাসিয়া ওঠে। দারোগা অস্বস্তিবোধ করিতে থাকেন। কমলাক্ষবাবু চোখ পাকাইয়া ওঠেন।]

—কই বলুন ?

নরসুন্দর॥ ইয়ে—মানে স্যার···ওটা একটা লজ্জার ব্যাপার। আমি অবশ্য বৌকে মাপ করে দিয়েছি। অবলা মেয়ে কোথায় দাঁড়াবে, নাহোলে···

সোমনাথ॥ আচ্ছা থাক। (কমলাক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া) আশাকরি আমার বন্ধুবর এই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার জন্য, আমাকে মাফ করলেন এতক্ষণে। আচ্ছা দাসবাবু, আপনি তাহ'লে সেদিন হত্যার সময় একটা চীৎকার শুনে ওপরে উঠে পড়েছিলেন, তাই না?

নরসুন্দর॥ ইয়েস্ স্যার, একজন স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনে আমি সোজা উপরে ওদের ঘরের মধ্যে হাজির হই।

সোমনাথ॥ ঘরে গিয়ে কি দেখলেন?

নরসুন্দর॥ দেখলাম, সুমন্তবাবু তার স্ত্রীর গলাটিপে ধরে রয়েছেন, আর তার স্ত্রী কেমন যেন হাঁস ফাঁস করছেন।

সোমনাথ॥ আর—

নরসুন্দর॥ আর বলতে বলবেন না স্যার, কেঁদে ফেলব! (কৃত্রিম কান্না দেখায়)

সোমনাথ॥ কিন্তু পুলিস তাব বিপোর্টে দিয়েছে; সুমন্তবাবু ঘরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিলেন।

নরসুন্দর॥ (তাড়াতাড়িতে) আমিও স্যার দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে কেবলমাত্র ঐটুকুই দেখেছিলাম।

সোমনাথ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে) আচ্ছা তাই বিশ্বাস করলাম, আচ্ছা এবার আমার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দিন তো দাসবাবু!

[দারোগাবাবুকে আরও চঞ্চল দেখা যায়।]

৬ই জুলাই রাত্রি একটার সময় নীলাদেবীকে হত্যা করা হয়েছে বলে দেখতে পান। তাই না?

নরসুন্দর॥ ঠিক তাই।

সোমনাথ॥ ঐ সময় আপনি তাহ'লে কলকাতাতেই ছিলেন ?

নরসুন্দর॥ বৌকে ঐ অবস্থায় ফেলে কোথায় যেতে পারি বলুন ? এ তো যে সে কথা নয়। এখন হয়, তখন হয় ব্যাপার।

সোমনাথ॥ পরদিন কোথায়ও গিয়েছিলেন কি ?

নরসুন্দর॥ আচ্ছা লোকতো মশাই! বলছি ত' কর্তব্য আমার কাছে অনেক বড়।

সোমনাথ॥ ৬ই এবং ৭ই জুলাই আপনি বহরমপুর কোর্টে সাক্ষ্য দেননি ?

নরসুন্দর॥ বহরমপুর কোর্ট…(ঘাবড়াইয়া গিয়া) ব…ব…

সোমনাথ॥ আকাশ থেকে পড়ছেন যে, সুবলশর্মা তার পিতাকে আহত করার ব্যাপার আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন আর তার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ৬ই এবং ৭ই জুলাই। কি ঠিক বলছি না ?

নরসুন্দর॥ আমি—আমি—সেখেনে—

সোমনাথ॥ কৈ বলুন ?

নরসুন্দর॥ দেখুন আমার ঠিক মনে নেই।

সোমনাথ॥ তাহ'লে ঐ দু'দিন আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ?

নরসুন্দর॥ হয়তো—দেখুন হ'তে পারে। আমার ঠিক মনে নেই। আচ্ছা স্যার আমি কি যাব ?

সোমনাথ॥ ইচ্ছা করলে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। অবশ্য সে ইচ্ছা আমার নেই।

নরসুন্দর॥ তাহ'লে হুজুর যাই ? (জজকে জিজ্ঞাসা করে)

জজ॥ আপনি যেতে পারেন। তবে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হোল মনে রাখবেন!

নরসুন্দর ॥ আচ্ছা স্যার।

[নরসুন্দর নমস্কার করিয়া, ঢোঁক গিলিয়া একপ্রকার দৌড়াইয়া পালাইয়া যায়।]

সোমনাথ ॥ ইউর অনার, বহরমপুর কোর্টে সাক্ষী যে ঐ দু'দিন উপস্থিত ছিল তার প্রমাণ এই।

[পেশকারের হাতে একটি কাগজ দেয়। পেশকার তাহা জজকে দেয়। জজ তাহা পড়েন এবং পরে তৃতীয় সাক্ষীকে ডাকিবার জন্য আদেশ দেন। পেশকারের নির্দেশে পরবর্তী সাক্ষী অবিনাশ পোদ্দারকে ডাকে। অবিনাশ পোদ্দার উপস্থিত হইলে পেশকার তাহাকে শপথ করায়। সোমনাথ তাহার দিকে আগাইয়া যায়।]

সোমনাথ ॥ আপনার নাম ?

অবিনাশ ॥ অবিনাশ পোদ্দার।

সোমনাথ ॥ যুদ্ধে আপনি সুমন্তবাবুর সংগে ছিলেন ?

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, প্রায় সবসময়ই ছিলাম।

সোমনাথ ॥ সুমন্তবাবু খুন করেছে বলে আপনার বিশ্বাস হয় ?

অবিনাশ ॥ না, কেউ ঠাট্টা করে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

সোমনাথ ॥ দ্যাটস্ অল্ ইউর অনার। সাক্ষীকে আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই।

[সোমনাথ তাহাব চেয়ারে গিয়া বসে। কমলাক্ষ অবিনাশের দিকে আগাইয়া আসে।]

কমলাক্ষ ॥ আচ্ছা অবিনাশবাবু, আপনি আগের যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাই না ?

অবিনাশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলাম।

কমলাক্ষ ॥ আপনি কি স্ব-ইচ্ছায় যুদ্ধে গিয়েছিলেন ?

অবিনাশ॥ কতকটা তাই। তবে সে ইচ্ছাটা জেগেছিলো কতকটা প্রতিহিংসা নেবার তাড়নায়।

কমলাক্ষ॥ প্রতিহিংসা! ইউ মিন্ রিভেঞ্জ?

সুমন্ত॥ (কাতরস্বরে) নো—নো রিভেঞ্জ! ডিয়ার্স ফর গডস্ সেক্ নো রিভেঞ্জ। পুসার ওপর বোমা পড়ল। সেই ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা সব হারাল, স্বামী স্ত্রীকে হারাল—সব হারিয়ে গেল। কটা পশুর ওপর রিভেঞ্জ নিতে গিয়ে আমরা সব হারালাম। ফাদারর্স, চিল্ড্রেন, ওমেন —নো, নো, দে আর আওয়ার এনিমিজ, লাইক দ্যাট এনিমি গার্ল। দে আর আওয়ার এনিমিজ, উই মাস্ট টেক্ রিভেঞ্জ—উই মাস্ট— উই মাস্ট। (নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়ে)

জজ॥ (কমলাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া) প্রসিড অন্।

কমলাক্ষ॥ আপনি তাহ'লে প্রতিহিংসা নেবার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিলেন! কিন্তু কিসের প্রতিহিংসা?

অবিনাশ॥ আমি মণিপুরে ডাক্তারী করতাম। সেখানে আমার বাবা মা আর এক ছোট ভাই ছিল। জাপানী আক্রমণের সময় তারা সকলেই প্রাণ দেয়। আমাদের হাসপাতালটা—

কমলাক্ষ॥ বুঝতে পারছি মিঃ পোদ্দার, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। তবুও আদালতের প্রয়োজনে আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হচ্ছি।

অবিনাশ॥ বোমা পড়তে শুরু করল। আমি তখন সাত বছরের একটা মেয়েকে অপারেশন করবার জন্য ক্লোরোফরমের ব্যবস্থা করছি। কাজ বন্ধ করে সেলটার-এর ব্যবস্থা করলাম। ছোট মেয়েটাকে আমি কোলে করে নীচে চলে এলাম, প্রচণ্ড শব্দ আর চারিদিকের বিভৎসতায় আমার

কোলেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলো। তাকে যখন আমার কাঁধ থেকে নামানো হোল, তখন আমার কাঁধের মাংসও খানিকটা অপারেশন করে কেটে নিতে হোল। মেয়েটি মৃত্যুর সংগে সংগে তার সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলো আর সেই সংগে তার দাঁত চেপে বসেছিল আমার কাঁধের মাংসোয়। আমার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিলো। আমি সব হারিয়ে যুদ্ধে যাওয়াই স্থির করেছিলাম।

কমলাক্ষ ॥ এই ছবিটা আপনি চেনেন ?

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, এটা মরিয়মের ছবি।

সুমন্ত ॥ (কাঠগড়ার ভিতর লাফাইয়া ওঠে এবং বলে) মরিয়ম, ইয়েস্ মরিয়ম, দি ইয়ং গার্ল ! আই এ্যাডমায়ার্ড হার, আই লাইকড হার—সি ওয়াজ এ ফ্লাওয়ার এণ্ড রিয়েলি লাইক এ রোজ। অল এনিমিজ স্যাড লাইক হার। মরিয়ম্ সুন্দর ছিল। শত্রুপক্ষের মেয়ে তবুও সে সুন্দর ছিল। বাট্, সি ওয়াজ এ ট্রেইটর—ইয়েস ট্রেইটর। সো আই কিল্ড হার উইথ দিস ষ্ট্রং হ্যাণ্ডস্। আমার এই শক্ত হাতদু'টো দিয়ে আমি তাকে—বেশ করেছি। আই মাস্ট নট এন্সার ইউ।

কমলাক্ষ ॥ মিঃ গুপ্ত বলুন, মরিয়ম্ কে ? আপনি তাকে হত্যা করেছেন কেন ?

সুমন্ত ॥ হু আর ইউ ? হোয়াই স্যাল আই অ্যানসার ইউ। কমাণ্ডার সুমন্ত গুপ্ত নেভার স্পিক্। হাঃ হাঃ হাঃ—

সোমনাথ ॥ ওকে বেশী চাপ দেওয়া উচিত হবেনা কমলাক্ষবাবু।

কমলাক্ষ ॥ কিন্তু ওর স্বীকারোক্তি প্রমাণ করছে যে, সে আর একটা জীবনের হত্যাকারী।

সোমনাথ ॥ স্বীকারোক্তি নয়, বরং বলুন প্রলাপ।

কমলাক্ষ॥ সেয়ানার কথায় বিভ্রান্ত হ'য়ে আপনি নিজে প্রলাপ বক্‌ছেন না তো, মিঃ মুখার্জি!

সোমনাথ॥ মোষ্ট অবজেক্‌সনেবল্, ইয়োর অনার।

জজ॥ কথাটা উইথ্‌ড্র করুন মিঃ রায়।

কমলাক্ষ॥ আমি উইথ্‌ড্র করছি ইয়োর অনার। কিন্তু সুমন্তবাবুকে জেরা করে আমি কিছু জানতে চাই। অবশ্য অপনার অনুমতি পেলে—

জজ॥ আপনি সে সুযোগ পাবেন। আপনাব বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ না কবেই বলছি কায়দা করে তা বের করবার চেষ্টা করুন।

কমলাক্ষ॥ তাই হবে স্যার।

[কমলাক্ষ নিজের চেয়াবে ফিরিয়া আসেন এবং টেবিলের ওপব রক্ষিত কাগজপত্র উল্টাইতে থাকেন। সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়ায়।]

সোমনাথ॥ ইয়োর অনার, আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে যুদ্ধের বীভৎসতা একটা সুন্দব হৃদকে কি ভাবে নষ্ট করে দেয়। আশা করি গত কয়েক-দিনের সাক্ষ্য দ্বারা আমি তা বোঝাতে পেরেছি।

কমলাক্ষ॥ আমার বিবেচনায় তা পারেন নি। বন্ধুবরকে কোর্ট মার্শালের রিপোর্টের ওপর একবার চোখ বোলাতে অনুরোধ করছি। একটা ফুলের মত হৃদয়কে সুমন্তবাবু যুদ্ধে কি ভাবে রাতের অন্ধকারে নিঃশেষ করেছেন, সেই নিষ্ঠুর চিত্র একবার নিজের মনে আনবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

সোমনাথ॥ একজন বিশ্বাসঘাতিনী কিভাবে ফুলের মতো হৃদয় নিয়ে দেশ প্রেমিকের কাছে উপস্থিত হ'তে পারে তা আমার মগজে আস্‌ছে না।

কমলাক্ষ ॥ কিন্তু তাকে ভোগ করবার জন্য সেই রাতের অন্ধকার কি সাহায্য করেনি ?

সোমনাথ ॥ তখনও পর্যন্ত মরিয়ম আমাদের বন্ধু ছিল।

কমলাক্ষ ॥ কি ছিল সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ।

সোমনাথ ॥ অংশতঃ এবং পূর্ণতঃ সবটাই তাই।

জজ ॥ অর্ডার—অর্ডার, কেসটা আজকে শেষ করতে সাহায্য করুন আপনারা।

[দু'জনে লজ্জিত হন এবং কমলাক্ষ পুনরায় জেরা শুরু করেন।]

কমলাক্ষ ॥ পুলিশের কাছে আপনি বলেছেন সুমন্তবাবু সুস্থ শরীরে খুন করতে পারে না !

অবিনাশ ॥ এখনও আমি তাই বলছি। সুমন্তকে খুনী হিসাবে কল্পনা করাও অন্যায়।

কমলাক্ষ ॥ আপনার যা বিশ্বাস আমাদের তা হবার নয়। তবুও যদি সম্ভব হয় এবং আপনার বলতে আপত্তি না থাকে, বলতে পারেন আপনার এরকম ধারণার কারণটা কি ?

অবিনাশ ॥ আমার বিশ্বাসটা কোন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদেরও বাধ্য হয়ে ছাড়া সে কখনও গুলি চালাবার আদেশ দেয়নি।

কমলাক্ষ ॥ তাহ'লে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি সুমন্তবাবুর স্কোয়াডে সব সময় ছিলেন ?

অবিনাশ ॥ না, আর সেটা আমাদের সকলের কাছে খুবই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কমলাক্ষ ॥ একটু পরিস্কার করুন মিঃ পোদ্দার।

অবিনাশ ॥ শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে আমরা যখন পেছু হঠতে আরম্ভ করেছি, সেই সময় আমাদের সেকেণ্ড অফিসার মিঃ স্টুয়ার্টের মাথায়গুলি লাগে ! সুমন্ত পেছনে ছুটেছিল স্টুয়ার্টকে নিয়ে আসবার জন্য।

কমলাক্ষ ॥ আপনি তাকে নিরস্ত করলেন না কেন ?

অবিনাশ ॥ আমি যখন জানলাম আমরা তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি। আর কোন উপায় ছিল না।

কমলাক্ষ ॥ উনি কি তাহ'লে শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছিলেন ?

অবিনাশ ॥ একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। শত্রুরা সরে যাবার পর ওদের পক্ষের নার্স মরিয়ম্ ওঁকে দেখতে পায়।

[এই সময় সুমন্ত আবার কথা বলতে আরম্ভ করে।]

সুমন্ত ॥ ঐ নাম, ঐ নাম থেকে দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। ঐ নাম আমায় খুন করেছে, আমাকে জানোয়ার করেছে। লোভ দেখিয়েছে, ভালবেসেছে বলে অভিনয় করেছে। আমাকে হাত করে আমার দেশের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, আমি দিইনি। আমি দেশকে বিলিয়ে দিইনি, তাকে খুন করে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। আর পারছি না। দয়া করে আপনারা আমাকে মরিয়মের হাত থেকে রেহাই দিন। স্যার, প্লিজ ডু সামথিং ফর মি।

জজ ॥ নিশ্চয়ই মিঃ গুপ্ত, আপনি শান্ত হোন।

[সুমন্ত চুপ করে, কমলাক্ষ আবার জেরা শুরু করে]

কমলাক্ষ ॥ তারপর বলুন মিঃ পোদ্দার ?

অবিনাশ ॥ আমাদের ফেলে আসা তাঁবুতে সুমন্তকে সে নিয়ে যায়।

কমলাক্ষ ॥ শত্রুপক্ষের মেয়েকে হাতে পেয়েও আপনারা বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন ?

অবিনাশ ॥ পেরেছিলাম, তার কারণ সুমন্তের নির্দেশ। দু'দিন পরে আমরা শত্রুপক্ষকে হঠিয়ে দিয়ে পুনরায় ক্যাম্প দখল করলাম। সত্যিকথা বলতে কি আমরাও পরে মেয়েটির কাজে সম্মোহিত হয়ে যাই !

কমলাক্ষ ॥ ইউ মিন দ্যাট্ সি ওয়াজ উইদ ইউ ফর লং।

অবিনাশ ॥ না বেশীদিন নয়। মাত্র আটদিন। কোর্টমার্শালে সুমন্ত যতটা জবানী দিয়েছে তার বেশী ব্যক্তিগতভাবে সে আমাকে যা বলেছে সেটাই আমি নিতান্ত প্রয়োজনে আপনাদের জানাতে চাই।

জজ ॥ উই নীড ছাট, আপনি বলুন।

অবিনাশ ॥ আটদিন পর আমাদের বিরাট ফৌজ এসে যাবার পর আমরা কৌশলে কি ভাবে শত্রুদের অক্রমণ করব তার নকৃশা করে রেখেছিলাম। ঐদিন গভীর রাত্রে সুমন্তের ঘুম ভেঙে যায়। টর্চের আলোতে দেখতে পায় মেয়েটি হাসতে হাসতে তার বিছানাব কাছে এগিয়ে আস্ছে। কাছে এসে সে টর্চ কেড়ে নেয়। সুমন্তকে উত্তেজিত করে তোলে। সুমন্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সেই মুহূর্তে মেয়েটির জামার ভেতর থেকে সুমন্ত আমাদের নকৃশার নকল আবিস্কার করে। দেশকে সে অনেক বেশী ভালবাসতো, গলাটিপে তাকে তখনই শেষ করে ফেলে।

কমলাক্ষ ॥ সহজ অবস্থায়, শত্রু মনে করে সুমন্তবাবু একজন মহিলাকে সেই অবস্থায় খুন করল?

অবিনাশ ॥ সহজ অবস্থায়, শান্ত মনে, আপনারা হয়ত সে কথা বলতে পারেন। তবে এটা জেনে রাখুন, সে রাত্রে তাকে শেষ না করলে আমাদের দলের কেউ রক্ষা পেত না। আর সেইজন্য সুমন্তের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কমলাক্ষ ॥ যার অপরিণামদর্শিতায়, মনের দুর্বলতায় একটা শত্রুপক্ষের মেয়ে এরকম একটা কাজ করতে উদ্যত হচ্ছিল তার প্রতি আপনারা কৃতজ্ঞ থাকবেন বৈকি?

অবিনাশ ॥ যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণা নেই তারা একথা বুঝতে পারবেন না।

কমলাক্ষ ॥ ডোণ্ট আরগু।

অবিনাশ॥ আমাদের বুদ্ধিহীনতা যদি আপনাদের চোখে পড়ে, তাহ'লে আপনাদেরটাই বা আমাদের পড়বে না কেন ?

কমলাক্ষ॥ আপনি সাক্ষ্য দিতে এসেছেন, আমাদের সমালোচনা করতে নয়।

সোমনাথ॥ (উঠিয়া দাঁড়ায়) সাক্ষীর সমালোচনা করাও কি আদালতের নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ নয়, ইওর অনার !

জজ॥ সাক্ষীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে ?

কমলাক্ষ॥ না, ইওর অনার, কাজ হয়ে গেছে।

জজ॥ আপনি এখন যেতে পারেন, মিঃ পোদ্দার।

[অবিনাশ নামিয়া পড়ে।]

পুলিসের সাক্ষ্যগ্রহণ গতকাল হয়ে গেছে। আপনারা সওয়াল আরম্ভ করুন সোমনাথবাবু।

কমলাক্ষ॥ তার আগে আসামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে, ইওর অনার।

জজ॥ কিন্তু তাতে কি কোন কাজ হবে ?

কমলাক্ষ॥ ইওর অনার, আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন।

জজ॥ পারমিটেড।

কমলাক্ষ॥ (সুমন্তের কাছে আগাইয়া যায়) সুমন্তবাবু, সুমন্তবাবু, আমার একটা কথার জবাব দিন। (সুমন্ত চুপ করিয়া থাকে) সুমন্তবাবু নীলাদেবী মানে আপনার স্ত্রীকে আপনি খুন করেছেন ? আপনি বলুন; চুপ করে থাকলে চলবে না—সুমন্তবাবু—(সুমন্ত চুপ করিয়া থাকে, কমলাক্ষ পায়চারী করিয়া কি ভাবেন। হঠাৎ সুমন্তের সামনে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলেন) মরিয়ম্···দি বিউটিফুল লেডিকে আপনি চেনেন ?

সুমন্ত ॥ নো, নো। সি ওয়াজ নট্ বিউটিফুল। সি ওয়াজ এ ট্রেইটর। বাট্ হু আর ইউ? আই মাস্ট নট্ রেডি টু এ্যান্সার ইউ। হু…হু ইউ…ইউ আর নাউ উইথ্ কম্যাণ্ডার। কম্যাণ্ডার মে অর্ডার… হাঃ হাঃ হাঃ।

জজ ॥ আমার মনে হয় এতে কোন কাজ হচ্ছে না, কমলাক্ষবাবু।

কমলাক্ষ ॥ আই অ্যাড্মিট্ ইওর অনার। (চেয়ারে বসিয়া পড়ে।)

জজ ॥ সওয়াল আরম্ভ করুন।

[সোমনাথ উঠিয়া সওয়াল আরম্ভ করেন।]

সোমনাথ ॥ আজ আমরা যাকে খুনী বলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি, তিনি একজন দেশপ্রেমিক। দেশের বিপদে তিনি আত্মাহুতি দিতে কুণ্ঠিত হননি। বর্তমানে আমরা তাঁকে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের লোক বলে গণ্য করছি। যদিও পূর্ণমাত্রায় পাগলের লক্ষণ তাঁর মধ্যে নেই। ঘুড়ির সুতো মালিকের হাতে থাকার মত খেই ধরিয়ে দিলে সুমন্তবাবু এখনও অতীতের কথা স্মরণ করতে পারেন। অপরদিকে আমরা বলছি তিনি হত্যাকারী। প্রমাণ কিছু না পেলেও অবস্থা এবং পরিবেশ চিন্তা করে আমরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করছি। আজ তাঁর দোষগুলো একের পর এক যেমন চিন্তা করছি এবং হত্যাকারী বলে ঘোষণার জন্য তৎপর হয়ে উঠছি, সেইরকম তাঁর গুণাবলী, তাঁর ত্যাগের কথা চিন্তা করে তাঁকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করা যায় না কি? মরিয়মকে তিনি হত্যা করেছেন, কথাটা যদি সত্যি বলেই মেনে নিই তবুও আমি যদি জিজ্ঞাসা করি কেন তিনি এই হত্যা করেছেন? দেশকে বাঁচাবার জন্য নিশ্চয়ই। সামান্য মোহের বশে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। এটাই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দৃঢ়তার পরিচয় নয় কি? ইওর অনার, যে লোকটা ফুলের মত হৃদয়কে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করল, সেই লোকটির

এই অধঃপতনের জন্য আমরা কি শুধু তাঁকেই দায়ী করব? একটা যুদ্ধ—বীভৎস, কুৎসিৎ, নৃশংস কলঙ্কময় একটা যুদ্ধই কি এর জন্য দায়ী নয়? লক্ষ লক্ষ সুমন্ত কি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে না? যতদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকবে ততদিন এই ভীষণ হৃদয় কি বেঁচে থাকবে না, ইওর অনার? সুমন্তবাবুকে নিঃশেষ করে আমরা কি এই অপরাধপ্রবণ মনগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবো? কোথা থেকে এর উৎপত্তি, সত্যিই সুমন্তবাবু দোষী কি না, তা কি আমরা একবারও ভেবে দেখবো না? (একটু চুপ করে) ইওর অনার, পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, সুমন্তবাবুর দোষ প্রত্যক্ষভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারিনি। প্রবল অনুমানগুলো এক্ষেত্রে শাস্তির পক্ষে যথেষ্ট তাও আমি জানি। কিন্তু তবুও এই দেশপ্রেমিক, মহান্, দয়ালু হৃদয়ের প্রতি যাতে অবিচার না হয় সে জন্য আমি আপনার কাছে সকাতরে প্রার্থনা করছি। ধর্মাবতার। আপনি মহানুভব, এই যুদ্ধদষ্ট জীবগুলোর প্রতি যাতে আপনার সকরুণ দৃষ্টি থাকে তার জন্য আপনাকে আমার অনুরোধ রইল।

[সোমনাথ নিজের চেয়ারে ফিরিলে কমলাক্ষ সওয়াল আরম্ভ করে।]

কমলাক্ষ॥ মাই লার্ণেড ফ্রেণ্ডকে ধন্যবাদ যে তিনি এতক্ষণ একটা মিঠে-কড়া রসাল উপন্যাস শুনিয়ে আমাদের এতক্ষণের কষ্ট লাঘব করলেন। বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে মানব-সমাজের প্রতি করুণ আবেদন—ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য অতি মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সংগে পাপীকে প্রশ্রয় দেবার জন্য তিনি যে উমেদারী করেছেন তাতে আমার ডিয়ার ফ্রেণ্ডের চরিত্রটা বড় বেশী প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। শান্তি আমরা চাই, পৃথিবীতে যারা অশান্তি ঘটাচ্ছে, যুদ্ধের জয়গান গাইছে, যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে বিশ্ব জগৎকে ভীত করে তুলছে, তাদের উদ্দেশ্যে

আমার ঘৃণা রইল এবং আমার মনে হয় সমস্ত সৎ লোকেরই আমারই মত ঘৃণা জন্মাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাপীকে—অন্যায়কে—হত্যাকারীকে, হত্যাকারী সুমন্ত গুপ্তকে আমরা ক্ষমা কোরব কেন? কোন অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি যে যুদ্ধে যাননি তারই বা প্রমাণ 'ক? মুখোসের আড়ালে মরিয়মের মত মেয়েকেও তিনি ভোগ করেছেন। আরও কত এই ধরনের নীচ কাজ করেছেন তারই বা হিসাব কি? নীলাদেবীকে ফিরে এসে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক হওয়ার পেছনে আরও কোন ব্যভিচার যে লুকিয়ে ছিল না, তারই বা প্রমাণ কি? পুলিশ রিপোর্ট-এ জানা যায় হত্যা করা হয়েছে শ্বাসরোধ করে। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর উপস্থিতি সত্ত্বেও অন্য কেউ এসে একজন নব বিবাহিতা স্ত্রীকে হত্যা করে গেছে এটা বিশ্বাস করা কোন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে উচিৎ হবে কি? নিশ্চয়ই হবে না। তাহ'লে এক্ষেত্রে সুমন্তবাবু ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় না! এরকম জেনুয়িন খুনিকে ক্ষমা করার কোন প্রশ্ন ওঠে কি? আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইনি। কিন্তু এক্ষেত্রে একমাত্র আসামী ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে নিজেব চোখে ঘটনা দেখা সম্ভব কি? তাছাড়া আমার মনে হয় কাগজের কাটিংস্‌গুলোই হত্যার প্রমাণ। (এই সময় কমলাক্ষ কাঠগড়ার সামনে আসামীর দিকে অগ্রসর হন। আসামীর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি বার করবার জন্য তিনি চেষ্টা করতে থাকেন।) ফুলসজ্জার রাত্রে নীলাদেবী যখন তার বহুযত্নে রক্ষিত কাগজের কাটিংস্‌গুলো অতর্কিতে জামার ভেতর থেকে বার করে—(সুমন্তকে চঞ্চল দেখা যায়) সেই সময় ঐ পিশাচ তার কুকর্মের কথা স্মরণ করে, আর—আর—তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে মরিয়ম মনে করে তার গলা টিপে ধরে—(এই সময় সুমন্তকে বিচলিত দেখা যায় এবং মৃদুস্বরে বলিতে শোনা যায়—নো-নো) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার

জামার ভেতর থেকে খামটি এইভাবে বার করেন। আর নীলাদেবী, নী—লা—দে—বী…

[বলতে বলতে জামার ভেতর থেকে কমলাক্ষ একটি কাগজের প্যাকেট বার করে। ইহা দেখিয়া সুমন্ত হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। চীৎকার করে কমলাক্ষকে ধরিতে যায়।]

সুমন্ত ॥ নো। (খুব জোরে চীৎকার করে) নীলা একাজ করতে পারে না। নীলা এ কাগজ কোথায় পেলে? তুমি আমাকে ভালবাসো। আমি তোমার স্বামী। তুমি আমাকে ঠকিও না। তুমি আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। প্লিজ তুমি বল, তুমি মরিয়ম নও? নীলা (সুমন্ত কাঁদিয়া ফেলে, কান্নার মধ্যেই বলিয়া চলে)…নীলা তোমাকে আমি খুন করলাম। তোমার সুমন্ত তোমাকে হত্যা করল নীলা? দেখে যাও নীলা, আমি ইচ্ছে করে খুন করিনি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম নীলা, তুমি মরিয়ম নও! ঐ খামটার জন্য তোমাকে আমি চিনতে পারিনি, আমি তোমাকে খুন করলাম। স্যার, ওঃ জেণ্টেলম্যান, প্লিজ হেল্প মি—ওঃ গড্, হেল্প মি। নীলাকে আমি ভালবাসি। আমি মারতে চাইনি।

[তার চীৎকার ও কান্নায় সকলে বেদনা অনুভব করে, জজ মোলায়েম সুরে তাকে নিরস্ত করে।]

জজ ॥ সুমন্তবাবু, এগেইন্ আই রিকোয়েস্ট, প্লিজ হেল্প মি। প্লিজ—

সুমন্ত ॥ স্যার, মাই নীলা!

জজ ॥ আই এ্যাডমিট, বাট্ এ্যাট্ দিস্ স্টেজ প্লিজ্ হেল্প আস্।

[সুমন্ত আস্তে আস্তে বসিয়া পড়ে। হাঁটুতে মুখ গুজিয়া কাঁদিতে থাকে।]

কমলাক্ষ ॥ (নিস্পৃহভাবে) ধর্মাবতার, আসামীর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি দ্বারা আমি প্রমাণ করেছি যে হত্যাকাণ্ড তার দ্বারাই ঘটেছে। মহানুভবের কাছে আমার আর কিছুই বলার নেই।

[কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। আদালত গৃহের নিস্তব্ধতা ভংগ করে জজ রায় দেন।]

জজ ॥ সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বাবা, সর্বোপরি আসামীর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আসামী শ্রীসুমন্ত গুপ্তই প্রকৃত হত্যাকারী। বর্তমানে আমরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলতে পারি না। হত্যার অনুশোচনা ইতিমধ্যেই তার মধ্যে সুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি আসামীকে লঘু শাস্তি দেবার পক্ষপাতি। আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৮ ধারানুযায়ী ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছি। এই দণ্ড চলাকালীন আমি তাহাব উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার আদেশও দিচ্ছি। সর্বশেষে পৃথিবীর সকলের কাছে শান্তির জন্য আবেদন জানিয়ে আজকের আদালতের কাজ বন্ধ করা হোল।

[পেশকার, ক্লার্ক তাহাদের কাগজপত্র পোছাইতে থাকে। সোমনাথ সুমন্তের দিকে আগাইয়া আসে।]

সোমনাথ ॥ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, পৃথিবীতে শান্তি আসুক।

সুমন্ত ॥ যুদ্ধগুলো বেঁচে থাকবে, শান্তি মরে যাবে। বেয়োনেট্‌টা জেগে থাকবে আর জোসেফ মাটিতে লুটিয়ে থাকবে। তার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে যুদ্ধের চাষ করা হবে। মরিয়ম্‌ বেঁচে থাকবে আর নীলা মরে যাবে। শান্তি আমি দেব না…শান্তি আমি চাই না…শান্তি আমি…

[পুলিশ তাহাকে জোর করিয়া কাঠগড়া হইতে নামাইয়া লয়। সুমন্তের উচ্চহাস্য সকলকে আশ্চর্য করিয়া দেয়। মঞ্চের উপর পর্দা নামিয়া আসে।]

মর্ম্মরের বিলাপ

[ঐতিহাসিক একাঙ্ক নাটক]

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

: চরিত্র :

শিল্পী
সুলতান হুমায়ুন শা
রহিম্ মীর্জ্জা
আনোয়ার শেখ্
ইব্‌সীন্
দস্তুর
সাল্‌মা
সাকী
বিল্‌কিস
পরিচারিকাদ্বয়
তবল্‌চী
সারেঙ্গীবাদক

[উঁচু খিলান ও থামযুক্ত একটি বহু পুরাতন প্রাসাদের এক অংশ। প্রাসাদের কারুকার্যে পঞ্চদশ শতকের মুসলমানী যুগের চিহ্ন বর্তমান। মঞ্চ-জোড়া তিনটি খিলানযুক্ত ভাঙ্গা দেওয়াল থেকে এ প্রাসাদের প্রাচীনত্ব বোঝা যাচ্ছে। মঞ্চের একপাশে অবস্থিত একটি থামেরও পলেস্তারা স্থানে স্থানে খসে গেছে। থামটির সামনের দিকে পুবাতন কবরের আকারের একটি বেদী। সময় : সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব, যেন কোন অশরীরী আত্মার ক্রন্দন।

ধীরে ধীরে পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য থেকে এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শোনা যায় :]

নেপথ্যে ॥ "হকিকৎ ইহ্ হ্যায় জো
ইস্ কায়েনাত্ মেঁ বহুত্ সি বাতেঁ
এ্যায়সি হোতি রেহ্তি হ্যায়,
জো কভি খোয়াব্ মেঁভি নহি সোচী যা সক্তী!"

[মঞ্চ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়। দেখা যায়, এক যুবককে পেছনফিরে দাঁড়িয়ে ভগ্ন দেওয়ালে কোনও কিছু লক্ষ্য করছে। একপাশে অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিসহ একটি ইজেল দাঁড় করান রয়েছে। যুবক এবার ঘুরে বেড়াতে থাকে। যুবক শিল্পী। বয়স ২৫।২৬; পরণে পায়জামা, পাঞ্জাবী এবং জহরকোট।]

নেপথ্যে ॥ দফা হো যাও, দফা হো যাও। নহি নহি, ইহ্ হো নহী সক্তা। ইহ নহি হো সক্তা!

[যুবক চমকে ওঠে! কিছুক্ষণ বাদে মঞ্চে মুসলমানী পোষাক পরিহিত এক বৃদ্ধ প্রবেশ করে। বৃদ্ধের হাতে বড় রকমের একটি মোমবাতী জ্বলছে। বৃদ্ধের নাম 'আনোয়ার শেখ'। সে এই প্রাসাদের কর্মচারী।]

আনোয়ার শেখ্ ॥ বাবুজী, রাত হোগয়ি, আপ্ সদর মহলমেঁ চো'লেন। মহলকে ইস্তরাফ্ রাতমেঁ হম্লোগোঁ কোই নহি রহ্তা হ্যায।

শিল্পী ॥ কেন?

আঃ শেঃ ॥ নহি বাবুজী। আপ্কা সোব কাম্ করনেকে লিয়ে মেরেপর্ হুকুম আছে। মগর্ রাতমেঁ হুজুর, মহলকে ইধর্ রহেন্ তো, মুঝে মাফ্ কোরতে হোবে, হুজুর।

শিল্পী ॥ কি ব্যাপার? তুমি যদি চলে যাও এই সন্ধ্যারাতে, তাহ'লে আমার যদি প্রয়োজন হয়, কাকে ডাকবো?

আঃ শেঃ ॥ ন্‌হি বাবুজী, অগর্ হমে শ' রূপেয়া মিলে, তব্‌ভি ইধর্ থাক্‌তে রাজী হোবে না। জিন্দা থাক্‌লে, আপ্‌লোগোঁকা মেহেরবাণীসে রোজগার্ কর্‌তে পারবে, লেকিন ইস্‌তরাফ্‌ রাত গুজ্‌রান করকে জান্ খোয়াতে পারবে না।

শিল্পী ॥ সেকি! আমি তো ঠিক করেছি আমি এখানেই থাক্‌বো। আমাকে রাতটা মহলের এদিকটাতেই কাটাতে হবে। তাছাড়া এখানে থাক্‌তে আমার অসুবিধা হবে না। একে জ্যোৎস্নারত, আর তার ওপর বেশ সুন্দর হাওয়া এদিকে। ঘুম এলে ঐ পাথরের বেদীটার ওপর লম্বা দেব।

আঃ শেঃ ॥ দোহাই, খোদা কা ওয়াস্তে, ওমন কাম করবেন না! ইয়ে হাবেলীর ইদিক্‌টার বহুৎ বদ্‌নাম আছে। ইথানে কো-ই রাতমে ন্‌হি রহ্‌তা। বুড্‌ঢা আদ্‌মীর বাত্‌ শুনেন। হামার গুস্তাখী মাফ্‌ করবেন, হুজুর, হাবেলীর পুরানা তস্‌বীব বনানেকে লিয়ে হাপ্‌নাকে ইথানে লিয়ে আসা হুয়েছে। মহালকে ইধর্ দিন্‌মে আ-কর্ যিত্‌না দিল্ চাহে, আপ্ তস্‌বীর বনান্। রাতমে ইধর্ থাক্‌বেন না। সদর মহালমে যাইয়ে, আপ্‌না কমরামে শুয়ে পোড়েন। আপ্‌নি পরদেশী, মেরা বাত মান্ লেন।

শিল্পী ॥ কেন, এখানে যে রাত্রে আসে, তারই কি বিপদ ঘটে?

আঃ শেঃ ॥ জীহাঁ। এক্‌হি আদ্‌মী ইস্ মহালসে জান লিয়ে বাপস্ গেছে, উহ্‌ হ্যায় রহীস্ মীর্জা! বিচারা দিওয়ানা হোগয়া! রাত্‌ আতে হি সি আর ঠিক্ ন্‌হি রহ্‌তা, হুজুর! ইয়ে মহালমে জো হি বাস্ কোরতে যায়, উস্‌কাহি তক্‌দীর খারাব্‌ হোয়! আজ চৌদ্‌বীকা চাঁদ্ আছে। ই রাত্‌-তো বড়ী খতরনাক্!

শিল্পী ॥ কেন?

আঃ শেঃ ॥ বাবুজী। ই পাথ্থরকা গুল্‌বাগের বহুৎ কহানীয়াঁ আছে। বাহ্‌মনী খান্‌দানের জালিম হুমায়ুঁ ইয়ে ইমারৎ বনায়েছিলেন। শুনা হ্যাঁয়, ইসি রাত আতেহি পুরানা জমানা জাগ্ উঠে, অউর, হালের কোই আদ্‌মী উয়োর বীচমেঁ গিয়ে পোড়ে ত' তার জান যায়। ইস লিয়ে ম্যাঁয় কহ্‌তা হুজুর, ইয়ে বুড্ডা আদ্‌মীর বাত্ শুনেন্, আপ্‌না ঘরমেঁ বাপস্ যাইয়ে।

শিল্পী ॥ আনোয়ার শেখ, ধন্যবাদ। তোমায় চিন্তা করতে হবে না। ভয় যারা পায়, তাদেরই ভয় চেপে ধরে। তুমি যখন আমার কৌতুহল জাগিয়ে দিলে, তখন আমার তো আর ফেরার উপায় নেই। তুমি ঘরে ফিরে যাও। তা'ছাড়া আমার আঁকা শেষ হয়নি। মনের মধ্যে আমার কল্পনা যতক্ষণ না বাস্তব রূপ নেয়, ততক্ষণ এ-জায়গা আমি ছেড়ে যেতে পারি না।

আঃ শেঃ ॥ (শেষ চেষ্টা করে) বাবুজী, আপ্‌কা মা-বাপ্‌কা কসম্! বাবুজী, বাব্……

শিল্পী ॥ (আদেশের স্বরে) আনোয়ার শেখ! তুমি যেতে পার।

আঃ শেঃ ॥ (স্তব্ধ হয়ে) আচ্ছা, খোদা হাফিজ্।

[আনোয়ার শেখ্ মোম্‌বাতীটা বেদীর ওপর রেখে, ধীরে ধীরে প্রস্থান করে। যুবক পাদচারণা করতে থাকে।]

শিল্পী ॥ কী ঘটে এই রাত্রির প্রাসাদে? সবই তো দেখছি, দিনে যা ছিল তাই। তবুও রাত্রির একটা রূপ আছে। চাঁদের আলোয় সে রূপ যেন উছলে পড়ছে। পাঁচ শ' বছর আগের সুলতান হুমায়ুন শার ভোগবিলাসের রম্যোদ্যানের এই দশা! না-জানি, অতীতের কত শিল্পীর চারুকলার সাক্ষ্য দেবার জন্যেই যেন দাঁড়িয়ে আছে এই ভগ্ন-

প্রাসাদ। অতীতের সাক্ষী! ইতিহাসের সাক্ষ্য! কে সাক্ষ্য দেবে? এ পাষাণ কী? বিজ্ঞান ত' বলে বস্তুর প্রাণ আছে। তবে কি সত্যই বিজাপুরের এই প্রাচীন পাষাণস্তূপ ব্যক্ত করে তার অতীত ইতিহাস রাতের অন্ধকারে?······কি যা' তা' ভাবছি!

নেপথ্যে॥ (রহীস্ মীর্জা) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

শিল্পী॥ এ-কি!

নেপথ্যে॥ দফা হো যাও, দফা হো যাও, ইয়ে হো নহি সকতা! নহি নহি, ইযে নহি হো সকতা!

[এক প্রায়বৃদ্ধ প্রবেশ করে। মুসলমান, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা! চক্ষু কোটরগত হলেও, তার ভেতর থেকে যেন আগুনের ফুল্‌কা ছুটছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় ছেঁড়া জরীর টুপী। ছিন্ন পোষাকে এককালীন আভিজাত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।]

শিল্পী॥ ওঃ, রহীস্ মীর্জা!

রহীস্ মীর্জা॥ জীহাঁ, ফানকার (শিল্পী)। ত' তুম্ ইহাঁ ক্যা কর্‌রহে হো? ক্যান্‌ভাস্ পর কিস্ হাসিনাকি জীসম্ উভার রহা, সাহাব্? যোথি, উসি এ্যায়সা জগাহ্ পর্ চলি গয়ী, যহাঁ, কোই ইন্‌সান্‌কা নজর নহি পৌছ্ সকতা—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

শিল্পী॥ না, মার্জাসাহেব। এ জায়গাটা বেশ লাগছে তাই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। দূরের পাহাড় থেকে এদিকে মিঠে হাওয়া আসে, তাই এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা।

রহীস মীর্জা॥ জীহাঁ! ঠণ্ডা! কোতল্!! খতম্!!! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— বহুৎ আচ্ছা সাহাব্! মগর্ ইস্ নৈশেমেঁ মৎ আও। দিল্‌কী নশেলী বড়ী খতরনাক্! আখের মেঁ আফ্‌শোস্ করেঙ্গে। হাঁ-হাঁ, ইয়ে হো

নৃহি সক্‌তা! ইয়ে হো নৃহি সকতা! এ্যাও! দফা হো যাও, দফা হো যাও……

[বল্‌তে বল্‌তে রহীস্‌মীর্জা প্রস্থান করে। তার কথার প্রতিধ্বনীতে সমগ্র প্রাসাদ গম গম করতে থাকে।]

শিল্পী ॥ পাগল! নাঃ হাওয়াটা দেখছি বেড়ে গেল! বাঃ বড় সুন্দর গন্ধ আসছে তো! নিশ্চয়ই দূরের পাহাড়ের ছোট্ট নদীটার তীর থেকে এ গন্ধ ভেসে আসছে। বেশ মেঠো জংলী ফুলের গন্ধ! নাঃ নাঃ এ তো হাস্নাহেনার গন্ধ! আঃ কি মিষ্টি! চোখে ঘুম আস্‌ছে। ঐ বেদীটাতেই শুয়ে পড়ি।

[যুবক বেদীর দিকে অগ্রসর হয়।]

কিন্তু, এরকম ঘুম কেন এল! এ যেন জোর ক'রে……না……না! আমায় ঘুমালে চল্‌বে না, আমার ভাবতে হবে! হুমায়ুন শা' কী অতই অত্যাচারী ছিল, যার জন্যে…না না আমি…আমি… না! বড় ঘুম! চোখ জড়িয়ে আসছে!……

[যুবক বেদীর কাছে গিয়ে আর দাঁড়াতে পারে না। বেদীতে মাথা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে অকাতরে। মোম্‌বাতীটা একটা দম্‌কা হাওয়ায় নিভে যায়। শুধু স্বল্প জোছনার আলোয় মঞ্চ দেখা যায়। কুয়াশায় ভরা যেন শীতের রাত।

* স্বল্প অন্ধকারেই দৃশ্যপটটিতে কিছু পরিবর্তন হয়। পুরাতন যা কিছু ছিল—সেগুলি নবজন্ম নেয়। তিনটি খিলানের আর্চের পেছনে সুদৃশ্য পর্দা ঝোলে। মাঝখানের আর্চে দুটি পর্দা ঝোলান। বাইরের পর্দাটা জালের এবং তাতে চুম্‌কী বসানো রয়েছে। ভেতরের পর্দাটিও

বহুমূল্যের এবং বহুবর্ণের। থামের গায়ের ভাঙা চিহ্ন-গুলিও অদৃশ্য হয়। দেখা যায় উন্মুক্ত সুন্দর এক প্রাসাদের অন্দরমহলের দৃশ্য। আলো ধীরে ধীরে জোর হতে থাকে (fade in)।

দূর থেকে নহবতের আলাপ ভেসে আসে। শোনা যায় পোষাপাখীর ডাক, যুবতী মেয়েদের কলহাস্য ও গুঞ্জন। নর্ত্তকীর নূপুরের নিক্কনও শোনা যায়। এই সব মিলে এক জমজমাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একটু পরেই দূর থেকে আরব দেশের সুরে গান ভেসে এল। এ আওয়াজ ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হতে থাকে। দেখা যায় ঢিলে আস্তিনের কামীজ ও আরবী পা'জামা পরিহিতা একজন আরব যুবতী ঐ সুরে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে। তার নিটোল হাতে একটি মিশরীয় তারযন্ত্র 'হার্প'। নেপথ্যের আওয়াজ স্তিমিত হতে থাকে। যুবতীর মাথার টুপী থেকে সূক্ষ্ম বসনের আবরণ মুখের কিছু অংশ ঢেকে ফেলেছে। কটিবন্ধে একটা বাকা ছুরি বাঁধা। গায়িকা জালের পর্দা ফেলা মাঝখানের খিলান যুক্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। এর পর মঞ্চে প্রবেশ করে এক ভীষণ দর্শন হাব্‌সী খোজা। ঝল্‌মলে ব্রোকেডের পোষাক পরে হাতে দা-এর আকারের তলোয়ার নিয়ে সে টহল দিয়ে চলে যায়। তারপর দেখা যায় ধীরে ধীরে সেই আরব যুবতী ঘর থেকে বাইরে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে এগিয়ে যায় ঘুমে অচেতন যুবকের কাছে। যুবককে সে আঁস্তে আস্তে ডাকৃতে থাকে।]

আরব যুবতী ॥ মুসাফির! মুসাফির!

[যুবক মুখ তুলে তাকায়, আশ্চর্য্য হয়ে যায়।]

একি ঘুমিয়ে পড়েছো যে! শোনো, তোমাকে ভেতরে ডাকছে। এবার সময় হয়েছে, চল।

শিল্পী॥ আমাকে! কেন? তুমি কে? কে ডাকে ভেতরে?

আঃ যুঃ॥ (মিষ্টি হেসে) কেন, মুসাফির? নারাজ কেন? তবিয়ত্ ঠিক নেই বুঝি?

শিল্পী॥ না, মানে শরীর খারাপ নয়, তবে—

আঃ যুঃ॥ তবে টবে নয়, এস!

[খোজা প্রহরীকে টহল দিতে আসতে দেখা যায়।]

সাবধান, মুসাফির!

[খোজা প্রহরী টহল দিতে আসে। বেদীর আড়ালে যুবতী আত্মগোপন করে এবং যুবক তার পাশে বসে পড়ে। হাব্সী খোজা টহল দিয়ে চলে যায়। এরা উঠে দাঁড়ায়। এই সময় দেখা গেল বাদশাহী আমলের পোষাকে সজ্জিতা দু'টি সুন্দরী রমনী দু'খানা রেকাবীতে ঢাকা দিয়ে কিছু নিয়ে জালের পর্দা দেওয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। যুবক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।]

নজর যে রুখে গেল! একেই বলে তক্দীর! ওদিকে বেহেস্তের হুরী তোমায় ইন্ত্জার করছে, আর তুমি তাকিয়ে রইলে তারই নোক্রাণীর ওপর! (মিষ্টি হেসে) আমার দিকে তাকালেও কথা ছিল!

শিল্পী॥ না, তা'নয়। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, আমি কোথায় এলুম! একি বাগ্দাদের কোন হারেম? আরব্য উপন্যাসেই এই রকম

পরিস্থিতির কথা পড়েছি। কিন্তু, না তা'ত নয়। তোমরা তো আমারই মতন রক্তমাংসের মানুষ।···সুন্দরী, তুমি কে? ওরা কারা? এ যেন কপালকুণ্ডলার 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছো?'

আঃ যুঃ ॥ (খিলখিল করে হেসে ওঠে) হাসালে তুমি! পুরুষরা এত ছলনাও জানে! আমার নাম সাকী। তোমার মাশুক্ তোমায় ইয়াদ করছে। এতক্ষণ সুলতান ছিলেন, তাই তোমাকে ডাকৃতে পারিনি। এবার চল।

শিল্পী ॥ (এগোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।) তুমি কি বলতে চাও, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। আমার জন্যেই বা কে এখানে অপেক্ষা করবে?

সাকী (আঃ যুঃ) ॥ ওঃ বুঝেছি। তুমি জানতে চাও যে আমি সব জানি কি-না। শোনো, তুমি শওকৎ ওস্‌মান, দেশ তোমার ইরাণের ইস্‌ফাহানে, এবার হয়েছে তো?

শিল্পী ॥ আ···মি শওকৎ ওস্‌মান?

সাকী ॥ জী। আরও শুন্‌তে চাও? তোমাকে নিয়ে আসার জন্যে, আমিই দূত পাঠিয়েছিলাম। আমারই নির্দ্দেশে তোমার চোখ বেঁধে, গোপন পথে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

শিল্পী ॥ কিন্তু, দেখো—

সাকী ॥ তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। জেনে রেখো যে আমার চেয়ে বিশ্বাসী সহচরী তার আর কেউ নেই। সত্যি বেচারীকে দেখে বড় দুঃখ হয়। তুমি নিজের চোখে তাকে না দেখলে বুঝতে পারবেনা। শুধু ধন দৌলত্ সম্পদই মানুষকে সুখী করতে পারে না।···কই, দাঁড়িয়ে রইলে যে! জলদী চল, নইলে এখুনিই আবার ঐ জহ্লাদ্‌টা এসে পড়বে। এস, আমার সঙ্গে।

শিল্পী ॥ কৌতুহল সর্ব্বনাশা! যাই হোক্, চল। স্বর্গের পরীকে দেখার লোভ সাম্‌লান কঠিন।

সাকী ॥ স্-স্-স্! দাঁড়াও, ইব্সীন্ আস্ছে!

শিল্পী ॥ ইব্সীন্ কে?

সাকী ॥ খোজাপ্রহরী। চুপ্! একে আমায় হটাতে হবে।

[খোজা প্রহরী টহল দিতে প্রবেশ করে। যুবককে আড়ালে চলে যেতে ইসারা ক'রে সাকী তার দিকে এগিয়ে যায়।]

ইব্সীন্! আমার একটা উপকার করবে?

ইব্সীন্ ॥ কী?

সাকী ॥ আমার ভাইয়ার আজ আসার কথা আছে। সদর মহলে গিয়ে সে এল কি-না। তুমি খোঁজটা নিয়ে আস্বে?

ইব্সীন্ ॥ কাম ছেড়ে যাব কেমন ক'রে?

সাকী ॥ যাওতো, তোমার কাম, আমি দেখবো ততক্ষণ।

ইব্সীন্ ॥ বেশ। এই রইল আমার হাতিয়ার।

[হাতিয়ার রেখে ইব্সীন্ প্রস্থান করে। এদিকে যে মেয়ে দুটি ঘরের মধ্যে গিয়েছিল, তারা প্রস্থান করে]

সাকী ॥ বাঁচ্লাম! কইগো, মুসাফীর এস।

[যুবক আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। উভয়ে গিয়ে জালের পর্দা ঝোলানো ঘরের সম্মুখে দাঁড়ায়।]

ইনাম্ কি দেবে আমায়?

শিল্পী ॥ ভেবে দেখবো, আগে দর্শন তো করাও!

সাকী ॥ ওঃ, তুমি সাংঘাতিক পুরুষ!

নেপথ্যে ॥ (ঐ ঘরের মধ্য থেকে) কে? সাকী? এনেছিস্? সে এসেছে?

[পর্দা সরিয়ে বাইরে আসে এক অপরূপ সুন্দরী ইরাণী যুবতী। মেরুনো রঙের ঢিলা সালোয়ার পরনে, পায়ে মাথা বেঁকানো জরীর চটিজুতো। কোমরে লাল কোমর বন্ধ, উন্নত বুকে জরীর কাজ করা কাঁচুলী আর তার ওপর বক্ষ উন্মুক্ত বাস্‌কেট (মেয়েদের জহর কোট)। মাথায় লাল সাটিনের ওপর জরির কাজ করা টুপী, সেই টুপী থেকে সোনার মিহি ঝালর কপাল ও গালে এসে পড়েছে; চুলের বেণীতে জরীর ফিতে বাঁধা। যুবতীর কপালের পাশদিকে মাথা থেকে রঙীন পাথর বসানো ঝুম্‌কো ঝুল্‌ছে; তার কপালে টিকলী, চোখে সুরমা, হাতে জরোয়ার ফুল ও মেহেন্দী, গলায় সাতনরী, শোভা পাচ্ছে।]

যুবতী ॥ (যুবককে দেখতে পেয়ে) এসেছো! খোদা মেহেরবান্, তাই তোমাকে পেলুম।...কিন্তু, এখানে? সাকী?

সাকী ॥ ইব্‌সীন্‌কে সরিয়ে দিয়েছি।

[যুবক নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যুবতীর দিকে।]

যুবতী ॥ শওকৎ, অমন নিষ্ঠুরের মত তাকিয়ে রইলে যে? আমাকে কি চিনতে পারছোনা? মনে ক'রে দেখোতো? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো!

[যুবক অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার যেন একটা ভাবান্তর ঘট্‌ছে, বোঝা যায়। যুবক হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে ওঠে।]

শিল্পী ॥ আমার মনে হচ্ছে, আমি...আমি যেন তোমাকে চিনি! ন্-ন্-না! সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে! একি স্বপ্ন, না সত্যি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে

পড়েছে, মনে পড়েছে—তুমি যেন সেই…ন্-ন্-না…এ আমি কি বল্‌ছি!

যুবতী ॥ হ্যাঁ, আমিই সেই। এ খোয়াব্ নয়, ওস্‌মান; আমিই সেই বাফ্‌ক্ সর্দ্দারের মেয়ে সাল্‌মা। বহু কোশিষের পর, তোমার খোঁজ করে, বহু কষ্টে তোমায় খবর পাঠাই।

শিল্পী ॥ কিন্তু—

(যুবতী) সাল্‌মা ॥ শওকৎ, আমি এখনও সেই আগের মতই আছি। সব কিছুর বিরুদ্ধে যুঝে আজও যে আমি তোমারই ইন্ত্‌জার করছি। তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তো সেই আগের সাল্‌মাই রয়েছি!

শিল্পী ॥ কিন্তু, যেন কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে! কোথাও যেন একটা ফাক্ থেকে যাচ্ছে। কিছু যেন একটা ঘটে গেছে!

সাল্‌মা ॥ আমার জীবনে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। শোনো আমার কাছ থেকে। বাফ্‌ক্ থেকে তোমার কাছে ইস্‌ফাহানে যাবার পথে, বেদুইন্ দস্যুরা আমাদের উটের কাফ্‌লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শিল্পী ॥ বেদুইন্ দস্যু!

সাল্‌মা ॥ হ্যাঁ, তারা সব লুটপাট করে আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে দামাস্কুর (দামাস্কাসের) বাজারে।

শিল্পী ॥ আচ্ছা?

সাল্‌মা ॥ আমাকে কিনে নেয় জিড্ডার এক সওদাগর, তোফা দেয় দিল্লীর এক আমীরের কাছে। সেখান থেকে আমি এসে পড়ি এই বিজাপুরে তামাম্ হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠুর সুলতান হুমায়ুঁ শা'র হাতে।

শিল্পী ॥ হ্যাঁ, শুনেছি, নিষ্ঠুরতার জন্যে হুমায়ুন শা' "দক্ষিণের নিরো" উপাধি পায়।

সাল্‌মা ॥ আল্লাতালার মেহেরবানীতে জীসমের ওপর এখনও জালিম হুমায়ুঁর অত্যাচার সইতে হয়নি। তবে মনে হয়, তা-ও আমার নসীবে আছে।

শিল্পী ॥ এখনও হুমায়ুঁন শা'র অত্যাচার!

সালমা ॥ হ্যাঁ। শয়তানটা গায়ের জোরে আমার মহব্বত্ আদায় করতে চায়। প্রতিদিন তার খামখেয়ালী আচরণে আর তার বদ জুলুমে আমার জীবন অসহ্য হয়ে পড়েছে। শওকৎ, আমায় এই দোজখ্ থেকে উদ্ধার কর, তুমি আমাকে ইরাণে, তোমাদের ইস্‌ফাহানে নিয়ে চল। আমি আর সহ্য করতে পারিনা—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, শওকৎ, আমায় বাঁচাও! এতদিনের ইন্তজার আমার সার্থক করে তোলো! শওকৎ, …শওকৎ…

[সাল্‌মা যুবকের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। যুবক সাল্‌মাকে ওঠাতে যায়।]

সাকী ॥ হায় বাব্বা! সাল্‌মাবিবি অন্দরে যাও জল্‌দি! মুসাফির ছুটে চলে যাও, ঐ আড়ালে। ইব্‌সীন্ এসে পড়লো!

[সাকী, জোর করে উঠিয়ে সাল্‌মাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দেয়। যুবক আড়ালে চলে যায়। সাকী ইব্‌সীনের হাতিয়ার তুলে নেয়। ইব্‌সীন্ প্রবেশ করে।]

সাকী ॥ কী ইব্‌সীন্ খবর পেলে? এই দেখো, আমি তোমার কাম ঠিক করে যাচ্ছি। পাহাবা দেওয়ার কামও করতে পারি, কি বল?

ইব্‌সীন্ ॥ ঠাট্টা কর না। হ্যাঁ, তোমার ভাই এসেছে। শুনলাম, দুটো আরবী ঘোড়া সে সুলতানকে ভেট দিয়েছে। তার নিজেরও দেখলাম দুটো আরবী ঘোড়া আছে।

সাকী ॥ (উৎসাহের সঙ্গে অর্থপূর্ণ ভাবে) তাই নাকি?

ইব্‌সীন্‌॥ হ্যাঁ, বেশ তেজী ঘোড়া। তোমার খবর দিতেই আমাকে এক আস্‌রফী বক্‌শীস্‌ দিল। তোমার ভাই মনে হ'ল বেশ রহিস্‌ আদ্‌মী।

সাকী॥ হ্যাঁ, দিল্লীর দরবারে মুলাজিম্‌। আচ্ছা ভাইয়া, তস্‌লীমাৎ।

[পর্দ্দা সরিয়ে সাকী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইব্‌সীন তার হাতিয়ার নিয়ে টহল দিতে থাকে। এমন সময় প্রবেশ করেন সুলতান হুমায়ুন শা'। নবাবী পোষাক। বয়সে যুবক। হাতে একটি গোলাপ; ফুলের সুগন্ধ উপভোগ করতে করতে ধীর পদে এগিয়ে যান সাল্‌মার ঘরের দিকে। ইব্‌সীন্‌ সালাম করে। সুলতান পর্দ্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে থেমে যান, যেন দূরে কেউ আস্‌ছে দেখে তিনি অপেক্ষা করেন। প্রবেশ করে একজন নর্ত্তকী। তন্বী ও সুন্দরী। সঙ্গে তার সারেঙ্গীবাদক ও তবল্‌চী। তারা সকলেই সুলতানকে সেলাম করে।]

নর্ত্তকী॥ এত রাত্রে আমাকে তলব্‌ করছেন, জনাব?

হুমায়ুন॥ হুঁ, বিল্‌কিস্‌।. কেমন আছো? মেজাজ শরিফ্‌?

বিল্‌কিস্‌ (নর্ত্তকী)॥ সবই সাল্‌মার মেহেরবানী, জনাব আলি। জনাবের মেজাজ শরিফ্‌ রাখাই তো এই বাইজীর কাম।

হুমায়ুন॥ মনে হল, অনেকদিন তোমার নাচ দেখিনি, তাই ডেকেছি।

বিল্‌কিস্‌॥ শুধু হুকুমের অপেক্ষামাত্র।

হুমায়ুন॥ হুম্‌। (ইব্‌সীন্‌কে) সাকী বিবি.।

ইব্‌সীন্‌॥ (হেঁকে) সাকীবিবি?

[সাকী প্রবেশ করে। সুলতানকে দেখে প্রথকে চম্‌কে যায়, পরে নিজেকে সাম্‌লিয়ে নেয়। সুলতানকে সালাম করে]

হুমায়ুন ॥ কি করছে ?

সাকী ॥ তাবিয়ত্‌ খারাব্‌ সুলতান। সাল্‌মাবিবির শিরদরদ্‌ হয়েছে।

হুমায়ুন ॥ (হাতের ফুলেব ঘ্রাণ নিয়ে) হুম্‌, বেশ। এখানেই নাচ হোক্‌। নাচের তাল আর গানের সুরে মাথা সেরেও যেতে পারে।

[সুলতান বেদীতে গিয়ে পা' রেখে দাঁড়ালেন। সাকী সালাম্‌ ক'রে ঘরের অভ্যন্তরে প্রস্থান করে। বিলকিসের ইঙ্গিতে সারেঙ্গী বাদক্‌ ও তবলচি তাদের বাদ্য নিয়ে বসে পড়ে। নাচ ও গান শুরু হয়।…কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই, সুলতান বাধা দেন।]

হুমায়ুন ॥ তখ্‌লিয়া !

[সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গান থেমে যায়। সুলতান ইনামের বটুয়া ছুঁড়ে দেন তাঁর সামনে। বিলকিস্‌ এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াতেই হুমায়ুন শা' পা দিয়ে সেটা চেপে ধরে ব্যঙ্গের হাসি হাসেন ও পরে সেটা পা দিয়ে এগিয়ে দেন বিলকিসের দিকে। বিল্‌কিস্‌ বটুয়াটি কুড়িয়ে নিয়ে চুম্বন করে সুলতানকে সালাম করে। পরে সঙ্গীদের নিয়ে সে প্রস্থান করে।]

হুমায়ুন ॥ সাকী ?

সাকি (নেপথ্যে) ॥ জি জনাবআলি।

[সাকী প্রবেশ করে সুলতানকে সালাম করে।]

হুমায়ুন ॥ কেমন ?

সাফী ॥ একই হাল, জহাঁপনা।

হুমায়ুন ॥ বেশ, আমি যাচ্ছি। আবার আসবো। সাল্‌মাকে বল যে, আজ তাকে আমি রাজী করাবই। রাজী না হয়তো, কাল সুবাহ্‌ আম-জনতার সাম্‌নে তাকে বে-আবরুহ্‌ হালৎ-এ কোড়া (চাবুক) খেতে হবে। অনেক সহ্য করেছি আর নয়।

[হাতের ফুলটি চুম্‌রিয়ে পিষে ফেলে দিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে সুলতান প্রস্থান করে। ইব্‌সীন্‌ সুলতানকে অনুসরণ করে। সাফী একাকী দাঁড়িয়ে চিন্তা করে।]

সাফী ॥ ইব্‌সীন্‌? (ইব্‌সীন প্রবেশ করে।)
ইব্‌সীন্‌ ভাইয়া, তোমাকে আমার জন্যে আর একটু মেহনত্‌ করতে হবে। নারাজ্‌ হয়োনা। তোমাকে ইনাম্‌ দেব।

ইব্‌সীন্‌॥ কাম করতে আমি গরবাজী নই। কিন্তু, সুলতান এসে যদি দেখেন আমি এখানে নেই; তা'হলে আমার অবস্থা কি হবে, একটু চিন্তা কর।

সাফী ॥ সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। তুমি গোপনে চুপি চুপি আমার ভাইকে এখানে এনে দেবে।

ইব্‌সীন্‌॥ (নাকে কানে হাত দিয়ে) মাফ্‌ কর, সাফীবিবি, নোক্‌রি আর গর্দ্দান দোনোই খোয়ান মুশ্‌কীল।

সাফী ॥ ইব্‌সীন, তুমি বে-ফিকির থাকো। আমি সব বন্দোবস্ত্‌ করবো। তোমার ভয়ের কিছু নেই। যাও, তুমি তাকে নিয়ে এসো।

ইব্‌সীন॥ লেকিন্‌—

সাফী ॥ লেকিন্‌ নয়। কোনো চিন্তা ক'র না, তাকে এখানে নিয়ে এস। খুব সাবধানে কাম ক'রো, তা'হলেই হবে।

[ইব্‌সীন্‌ প্রস্থান করে। সাফী ইসারায় যুবককে ডাকে। যুবক আড়াল থেকে এগিয়ে আসে।]

শোনো, আমি এক মতলব্‌ করেছি। আমার ভাই এখানে এসেছে। আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে দু'টো আরবী ঘোড়া আছে। আজ রাত্রে, দেউড়ীর বাইরে একটা তমাল গাছের কাছে ঘোড়াদু'টো বাঁধা থাক্‌বে।

[সাফী বেদীর কাছে এগিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বলে]

শোনো, এটা কবব নয়। এব নিচ দিয়ে একটা গুপ্তপথ ঐ তমাল গাছটাব পাশ দিয়ে বেরিয়েছে। তুমি ও সাল্‌মাবিবি এই পথে বেরিয়ে যাবে।

শিল্পী ॥ এই রাত্রে ?

সাফী ॥ তাই ত' বল্‌ছি তোমায়। রাত্রে তোমাদের অসুবিধা হবে না। আজ চৌদবী কা চাঁদ আছে। এখান থেকে দিল্লী ৮ দিনের পথ। দিল্লীতে গিয়ে তোমরা, আমার ভাই-এব ওখানে উঠবে। তারপর সেখান থেকে তোমাদের ইরাণে—

শিল্পী ॥ ইরাণে ?

সাফী ॥ হ্যাঁগো হ্যাঁ। সেখান থেকে তোমাদের ইরাণে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কী রাজী ?

শিল্পী ॥ এতদুর যখন এগিয়েছি, তখন রাজী না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দেখা যাক্‌, ভাগ্যে কী আছে !

সাফী ॥ তব্‌ ঠিক হ্যায় ! তুমি ঐ জায়গাতেই ঠাহ্‌রো। সুলতান আজ জিদ ধরেছেন। আমি সাল্‌মাবিবিকে ব'লে আসি যে তুমি রাজী

আছো। আর আমার ভাই এলে—ঐ তো সে আস্‌ছে! তুমি তফাৎ যাও।

[যুবক সরে যায়। একজন আরব যুবক প্রবেশ করে। ইব্‌সীন্ তাকে পৌঁছে দেয়। সাফীর ইঙ্গিতে ইব্‌সীন্ প্রস্থান করে।]

সাফী॥ দস্তুর, তুই এসেছিস্। ইস্ তোকে কতদিন দেখিনি! সব ভাল তো?

(আরব যুবক) দস্তুর॥ জীহাঁ, বড়িআপা। সব ভাল। তোর খবর কি? চল্ এবার তোকে আমার কাছে নিয়ে যাব। আর কতদিন এখানে কাটাবি? আমি হুমায়ুঁ শা'র কাছে আর্জ্জি পেশ ক'রে রাজী করিয়ে নেব।

সাফী॥ সে পরে হবে'খন। এক বিরাট কাজ হাতে নিয়েছি। তোকে মদৎ করতে হবে, দস্তুর।

দস্তুর॥ কি কাম আপা?

সাফী॥ এ মহলের একটি মেয়েকে বাঁচাতে হবে। তার বড় বিপদ্। তোর দু'টো তেজী আরবী ঘোড়া আছে শুন্‌লাম?

দস্তুর॥ হ্যাঁ, চারটে এনেছিলাম। দু'টো সুলতানকে ভেট দিলাম। অবশ্য আমার দু'টোও বেশ ভাল।

সাফী॥ আজ রাতেই ঘোড়া দু'টো দেউড়ীর উত্তর দিকের তমাল গাছটার সঙ্গে বেঁধে রেখে দিবি। কাল পরশু তুই দিল্লী ফিরে যাবি। তোর ঘোড়ায় চড়ে এরা দিল্লী গিয়ে তোর মোকানেই উঠ্‌বে। তোকে ওয়াপস্ গিয়ে এদের ইরাণে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। পারবি তো?

দস্তুর॥ হ্যাঁ, তা পারবো। কিন্তু, ওদের তুই, গোলকুণ্ডায় আমার আস্তানায় পাঠিয়ে দিস্। সেখান থেকে আমি, ওদের দিল্লী হয়ে ইরাণে

পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।……সে তো হবে, কিন্তু, তোর এই মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে, কি কারণে?

সাকী॥ কারণ অনেক। তোকে পরে সব বলবো। তুই এখনই চলে যা। যা ব্যবস্থা করতে বললাম, ক'রে রাখবি।

দস্তর॥ কিন্তু, মেয়েটির সঙ্গে কে একজন যাচ্ছে বললি? দু'জনে? সে কে?

সাকী॥ সে মেয়েটির বচপন্‌কা আশিক্!

দস্তর॥ ওঃ, অচ্ছি বাত্! চলি—(প্রস্থানোদ্যত)

সাকী॥ একা যেতে গিয়ে বিপদে পড়বি। ইব্‌সীন্?

[ইব্‌সীন্ প্রবেশ করে।]

আমার ভাইয়াকে সাবধানে বাইরে পৌঁছে দিও। আর এই নাও।

[সাকী একটি আস্‌রফী ইব্‌সীনের হাতে দেয়। ইব্‌সীন্ সেটি নিয়ে, দস্তরকে সঙ্গে ক'রে প্রস্থান করে।]

সাল্‌মাবিবি বাইরে এসো।

[সাল্‌মা প্রবেশ করে। তাকে উৎফুল্ল দেখায়।]

সাকী॥ আল্লাতালা বোধহয় মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার মুক্তির আর দেরী নেই। শওকৎ ওস্‌মান রাজী, আর আমার ভাইও মঞ্জুর করেছে।

সাল্‌মা॥ (উৎফুল্ল হয়ে) সত্যি, সাকী!

[সাল্‌মা নিজের গলার হার খুলে সাকীকে পরিয়ে দিয়ে, তাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে।]

আজীবন তোর কথা মনে থাকবে।

[নেপথ্যে ঝড়-তুফানের শব্দ, বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ ডাকে।]

সাকী ॥ (হারটা ফেরত দিতে দিতে) এটা তোমায় কাছে রেখে দাও। এই দুর্যোগের রাত্রেই তোমাদের রওনা হতে হবে। পথে অনেক জরুরৎ হতে পারে।

সাল্মা ॥ (ফেরত নেয়না) না সাকী, এটা তোর কাছে থাক্ আমার ইয়াদ্গার (স্মৃতি) হয়ে। এই বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার সাধ যে কী, তুই কি বুঝ্বি? খাঁচার বন্দীপাখীকে খোলা আস্মানে ছেড়ে দিয়ে দেখেছিস্ কি? যদি দেখিস্, তবেই বুঝ্বি, এ কিসের আনন্দ, এ কিসের পুলক!...কিন্তু, সাকী, সে কই? কোথায় সে?

[এ-কথা শুনেই যুবক এগিয়ে আসে।]

সাকী ॥ ঐ তো।

[ওদিকে দেখা যায়, সুলতান হুমায়ুন শা' প্রবেশ করতে গিয়ে এদের দেখ্তে পেয়ে আড়ালে আত্মগোপন করেন।]

সাল্মা ॥ (এগিয়ে গিয়ে যুবককে) শুন্ছো, সব ঠিক হয়ে গেছে! আমায় আর এ দুঃসহ জীবন কাটাতে হবেনা! আবার আব্বাজানকে দেখ্বো; আমার গাঁও দেখ্বো; আমার সাধের ইবাণে আবার ফিরে যেতে পাব; আর পাশে পাব তোমায়! আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠ্বে, তাই না, ওস্মান?

শিল্পী ॥ এ জীবন যদি সত্য হয়, তবে তাই হবে সাল্মা! সাল্মা—

[যুবক হাত বাড়িয়ে সাল্মাকে ধরতে যায়। এমন সময় হুমায়ুন শা' হুঙ্কার দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।]

হুমায়ুন ॥ বেইমান্!! [সকলে ভয়ে ত্রস্ত হয়ে যায়। ইবসীন্ প্রবেশ করে।] নেমক্হারাম! শয়তানী! কোড়া লাও।

[ইব্সীন্ কোমর থেকে চাবুক খুলে দেয়। সুলতান সাকীর দিকে এগিয়ে যান।]

এ ষড়যন্ত্রের মূলে তুই! আমার ইস্তেদার ব'লে হারেমে রেখেছিলাম তোকে, এই বেইমানী করবার জন্যে? তার সাজা নে—

[সাকীকে কশাঘাত করেন ; যন্ত্রণায় সারাদেহ সঙ্কুচিত হয়ে গেলেও সাকী নীরবে তা সহ্য করে।]

নিয়ে যা একে! কাল সুবাহ্‌-এর বিচার হবে।

[ইব্‌সীন্ সাকীকে নিয়ে প্রস্থান করে। সুলতান যুবকের দিকে এগিয়ে যান! সাল্‌মাও এগিয়ে যায়।]

কে, তুমি? কেমন ক'রে এলে এই মহলে? জবাব দাও?

[যুবক উত্তর দেয় না।]

জবাব কি ক'রে আদায় করতে হয়, হুমায়ূঁ শা'র তা ভাল করেই জানা আছে। বে—আদব্‌!

[সুলতান চাবুক ওঠাতেই, সাল্‌মা ছুটে গিয়ে যুবককে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। এদিকে ইব্‌সীন্ প্রবেশ করে।]

সাল্‌মা ॥ না-না। ওকে মারবেন না, সুলতান। ওতো কিছু করেনি।

হুমায়ুন ॥ নাকি? হম্‌দরদি যে দেখ্‌ছি বহুৎ! বে-সরম্‌! দেখাচ্ছি!

[সুলতান খপ্ ক'রে সাল্‌মার একখানি হাত ধ'রে তার পিঠের পেছনে নিয়ে গিয়ে মোচড় দেন। সাল্‌মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।]

সাল্‌মা ॥ (যন্ত্রণায়) আঃ—আঃ, হায় খোদা!

হুমায়ুন ॥ (অট্টহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[সেই মুহূর্তে যুবক ছুটে গিয়ে সুলতানকে এক ধাক্কা দিয়ে সাল্‌মাকে ছাড়িয়ে নেয়।]

শিল্পী ॥ শয়তান! পিশাচ!

[সাল্‌মা যুবককে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়]

হুমায়ুন ॥ (প্রথমে ধাক্কা খেয়ে একটু হক্‌চকিয়ে যান, পরে হুঙ্কার ছাড়েন) উল্লু! কম্‌বক্‌ত্‌! কোতল কর্‌!

[ইব্‌সীন তার হাতিয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে যায়; কিন্তু, সাম্‌লা যুবককে ঘিরে থাকায়, সে মুস্কিলে পড়ে, ইতস্তত করে।]

রুখ্‌ যাও! শয়তানীকে আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি, তারপর ওটাকে খতম্‌ করবি, আর ওর শির নিয়ে এসে এই শয়তানীকে দেখাবি।

[এই কথা বল্‌তে বল্‌তে সুলতান এগিয়ে গিয়ে সাল্‌মাকে ছাড়িয়ে নিয়ে টান্‌তে টান্‌তে জালের পর্দা দেওয়া ঘরের সামনে নিয়ে যেতে থাকেন। সাল্‌মা ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌তে থাকে। তার পোষাক ছিঁড়ে যায়, কাঁচুলী খুলে যায়। টুপী, মুখের সূক্ষ্ম আবরণ, ঝালর ছিট্‌কে পড়ে, চুল খসে ছড়িয়ে পড়ে। সাল্‌মা মাটিতে পড়ে গিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকে। সুলতান, বজ্রমুষ্টিতে তাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে যান। সাল্‌মার কাতর ক্রন্দন শোনা যেতে থাকে, আর শোনা যায় সুলতান হুমায়ুন শা'র অট্টহাস্য। নেপথ্য থেকে—]

সাল্‌মা ॥ (নেপথ্যে) ওকে বাঁচাও, হায় খোদা! ওকে বাঁচাও, বাঁচ্‌তে দাও!

হুমায়ুন ॥ (নেপথ্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

এদিকে যুবক সাল্‌মার উদ্দেশ্যে এগোতে গিয়ে বাধা পায় ইব্‌সীনের কাছে। ইব্‌সীন যুবকের দিকে এগোতে থাকে। যুবক প্রাণভয়ে ক্রমশঃ বেদীর দিকে পেছোতে থাকে।]

শিল্পী ॥ না না না! একি! এই, সরে যাও! এ হ'তে পারেনা, এসব মিথ্যা, এসব মিথ্যা!

ইব্‌সীন ॥ না-ও, শেষবারের মত খোদার নাম ক'রে নাও!

শিল্পী ॥ খোদার নাম? আমি—

ইব্‌সীন্‌ ॥ কবরের ওপর শির রাখ্‌খো।

[ইব্‌সীন্‌ যুবককে এক ধাক্কা দিয়ে বেদীর ওপর ফেলে দেয়।]

আল্লার নাম করতে থাকো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[ইব্‌সীনের হাতিয়ার মাথার ওপর ওঠে। আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কায়, মেঘ ডেকে ওঠে; আর বিদ্যুতের আলো এসে পড়ে ইব্‌সীনের হাতিয়ারের ওপর। আর সেই মুহূর্তেই শোনা যায়—]

নেপথ্যে ॥ দফা হো যাও, দফা হো যাও! ইয়ে হো ন্‌হি সক্‌তা, ইয়ে ন্‌হি হো সক্‌তা!......

[সেই মুহূর্তেই সমস্ত আলো নিষ্প্রভ হয়ে গিয়ে আবার বেড়ে যায়। সেই স্বল্প সময়ে, অল্প আলোর মধ্যে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়ে সবকিছুই আগের মত পুরোনো আমলের ভগ্ন প্রসাদে পরিণত হয়।

খিলানগুলির পর্দা অদৃশ্য হয়। ইব্‌সীন্‌কে দেখা যায় না। ঝড় স্তব্ধ হয়।

নেপথ্যে রহীস্‌ মীর্জার চিৎকার অব্যাহত থাকে।

ভোরের আলোয় দেখা যায়, যুবক পূর্বে যে অবস্থায় ঐ বেদীতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থাতেই সে রয়েছে। তার সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে, মুখ দিয়ে অস্বাভাবিক আওয়াজ

হচ্ছে। চিৎকার করতে করতে রহীস্ মীর্জা প্রবেশ করে। তার চোখে লাগে দিনের আলো। সে ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হতে থাকে।]

রহীস্‌মীর্জা॥ (যুবককে দেখে) আরে! হায় আল্লা! এ যে সেই ফানকার! তস্‌বীর বনানেবালা! হায়, হায়, ইয়ে অল্‌না তক্‌দীর বনায়ে ফেলেছে! বুঝেছি, এ তাই! হাঁ-হাঁ। কালই তো ছিল চ্‌উদউয়ীঁ্‌কা চাঁদ! (যুবককে ধাক্কা দেয়।)
সাহাব্‌! ও সাহাব্‌! সুবাহ্‌ হয়ে গেছে।

[যুবক ধর্‌মর্‌ ক'রে উঠে বসে। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড ভয়ের ছাপ! রহীস্‌মীর্জাকে দেখে সে প্রথমে চম্‌কে যায়, পরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আবার চারিদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খোঁজে।]

কা'কে খুঁজ্‌ছো, সাহাব্‌? কেউ নেই। ও আস্‌মান কা হুরী। আস্‌মানেই আছে।

শিল্পী॥ রহীস্‌মীর্জা! তুমি জান। বল, একি সত্যি?

রহীস্‌মীর্জা॥ তোবা তোবা! নেহি সাহাব্‌, হামি কিছু জানেনা। ম্যায় স্রীফ্‌ আফ্‌শোষ করতে জানে। মগর্‌, ইয়ে হো ন্‌হি সকতা, ন্‌হি হো সক্‌তা! চলো সাহাব, তোম্‌হার কম্‌রেমেঁ ছোড়ে আসি। চল, মত শোচো! ইয়ে হো ন্‌হি সক্‌তা! ইয়ে ন্‌হি হো সক্‌তা……

[বল্‌তে বল্‌তে রহীস্‌মীর্জা প্রস্থান করে। যুবক হতবাক্‌ হয়ে রহীস্‌মীর্জার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

—৹—

ব্যাণ্ডমাষ্টার

পরিমল দত্ত

ঃ চরিত্র ঃ

নক্স মিঞা

হুসেন

মুবারক

হজরৎ

মালিক

আলি

সরকার বাবু

[ক'লকাতার একটা ব্যাণ্ডপার্টির দোকান। সময় সন্ধ্যা। দোকানের দাওয়ায় হুসেন হাতে ক্ল্যারিওনেট নিয়ে বসে আছে। দূরে একটা শোভাযাত্রা যাচ্ছে। তারই চিৎকার, আলো, বাজির শব্দ, বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। মুবারক তাই দেখছিল দাঁড়িয়ে। শোভাযাত্রার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে মুবারক একটা বিড়ি জ্বালিয়ে হুসেনের পাশে এসে বসে। হুসেন চেষ্টা করে ক্ল্যারিওনেটে 'সা' 'রে' 'গা' 'মা' সাধতে। ঘরের ভেতর থেকে মিঞার কাশির শব্দ শোনা যায়। মুবারক বিড়িটা নিভিয়ে ফেলে, হুসেনকে জানিয়ে দেয় যে মিঞা আসছে।]

[মিঞার প্রবেশ। হুসেন অপরাধীর মত উঠে দাঁড়ায়। মুবারক উদাসীন ভাবে থাকে]

মিঞা ॥ ওতটুকু কলজে নিয়ে বাঁশিতে ফু দিস্‌নি হুসেন। ভারীতো ২৪ ইঞ্চি ছাতি, ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

হুসেন ॥ চাচা, তুমারওতো ৪০ ইঞ্চি ছাতি নয়।

মিঞা ॥ আরে যতটুকু আছে সবটুকুই কলজে, হাওয়ায় ভরা, তুদের মত হাড়মাস বাদ দিয়ে ওতটুকু কল্‌জে লয়।

[বাঁশিটা প্রায় কেড়েই নেয় হুসেনের হাত থেকে]

হুসেন ॥ তাহ'লে চাচা আমায় শিখাবে না ?

মিঞা ॥ দেখো, গোঁসা হয়ে গেল। শিখাবো রে। তুদের শিখাবো বলেইতো আমি ব্যাণ্ডমাষ্টার।

হুসেন ॥ শিখাবোই বল। বাঁশি ধরলেই তো হাত থেকে কেড়ে লাও।

মিঞা ॥ কেড়ে লিই সাধে। খেয়ে দেয়ে শক্ত কর কলজেটাকে, না হলে এক ফুঁয়েই সব দম বেরিয়ে যাবে। দেখ হুসেন, থাক্ আমার কাছে। তোকে হামি সবকুছ তালিম দিয়ে ব্যাণ্ডমাষ্টার বানিয়ে দেব।

মুবারক ॥ ও স্রিফ্ তোমার ফাঁকা জবান চাচা। হাম্‌রা তো জানি জান গেলেও তুমি মাষ্টারি কাউকে দিবেনা।

মিঞা ॥ হ্যাঁ, হ্যা, কেনই বা দিবো ? একটা আদমি দেখাতো—পাকা আদ্‌মি—যাকে এক কথায় মাষ্টারি দিতে পারি।

মুবারক ॥ কেন ? হজরৎ মিঞা ? সেতো অনেক দিন তুমার তালিম লিয়েছে।

মিঞা ॥ (একটু থেমে, যেন হজরতের কথাটা সহ্য হয় না) না, না, দিবো না হজরৎকে। হামার কাছে তালিম লিয়েছে। শিখেছে যা খুদাতাল্লা জানে।

হুসেন ॥ ও বলে, চাচা, তুমিই শিখাওনি কিছু ওকে।

মিঞা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেনই বা শিখাবো। লিজে শিখুক। তাগদ থাকে লিজে শিখে মাষ্টার হক। হামার বাপজান তো শুধু হামায় ধরিয়ে দিলো বাঁশিটা। তারপর আপসে সব শিখেছি।

মুবারক ॥ (একটু ছেড়ে ছেড়ে বলে) লেকিন, মিঞা, মালিক বলে হজরৎ মিঞাই করবে এবার মাষ্টারি।

মিঞা ॥ মালিক বলে!

মুবারক ॥ হঁ্যা,—তুমি বাজাতেই পারনা এখন। বুকে জোর নেই—তাই মালিক বলে।

মিঞা ॥ বুকে জোর নেই? বলে মালিক? হঁ্যারে মুবারক?

মুবারক ॥ হঁ্যা, হজরতের সংগে শলা করছিল মালিক।

মিঞা ॥ তা তো বলবে। বুকে জোর নেই। সেদিন তো বলেনি—যেদিন পাথুরেঘাটার বাবুদের বাড়ী বাজিয়ে মাত্ করেছিল এই নক্স্ মিঞা!

হুসেন ॥ সে এখন কাহানী হয়ে গেল চাচা।

মিঞা ॥ কাহানী!

হুসেন ॥ হঁ্যা, দত্তবাবুর বাড়ী, চৌধুরীবাবুর বাড়ী তুমার বাজনার কাহানী স্রেফ শুনি হামরা।

মিঞা ॥ শুনবিই তো। দেখবি কি করে? তোরা তো তখুন পয়দা হস্নি। শোন, চৌধরীবাবুর বাড়ী হামরা বাজাতে গেছি—হামার বাপজান তখন ব্যাণ্ডমাষ্টার। হামি জোয়ান মরদ। হাতে বাঁশি—চারদিকে রোশনাই, বাজি ফাটছে হাওয়াই উঠ্‌ছে শন্ শন্ করে আস্‌মানে—কি বলবো—একদম্ জম্‌জমাট্। নিশার ঘোরে বাজাতে লাগলাম। হঠাৎ বড়বাবু সব বাজনা থামিয়ে দিলে।

মুবারক ॥ থামিয়ে দিলে?

মিঞা ॥ হঁ্যা, হামাদের তো ডর লাগলো। বকশিস না দিক্ পাওনা-ভি-মিলবে কি না।

হুসেন ॥ তারপর?

মিঞা ॥ বড়বাবু এসে হামার গায়ে হাত দিয়ে বললে—"নক্সু তুই একাই বাজা।" বাবুর গায়ে আতরের খুসবু। মাথাটা কেমন হয়ে গেল। সবাই চেয়ে আছে হামার দিকে। মরি বাঁচি দিলাম বাঁশিতে ফুঁ। তার পর আর হুঁস নেই। হুঁস হলে দেখি ফুলের মালা গলায়, বড়বাবু নিজে হাতে পরিয়ে বললে "নক্সু, তোকে হামি সোনাব মেডেল দেব।"

[কাশতে থাকে]

মুবারক ॥ সোনার মেডেলের কথা আমরাও শুনেছি চাচা। লেকিন, দেখলাম না তো একদিন।

মিঞা ॥ দেখবিরে দেখবি। হামি তো ভেগে যাচ্ছি না। শোন, ফিন্ সেবার দত্তবাবুর বড় লেড়কার সাদি···

হুসেন ॥ ও কাহানী ভি শুনেছি চাচা। লেকিন, সেরকম বাজনা তো তোমার শুনলাম না একদিন।

মিঞা ॥ শুনবিরে, একটা বড়সড় মুজরো আসুক—দেখবি ডেরেস পরলে হামায় কেমন দেখায়। দেখাব কল্‌জের জোর, বাঁশিতে ফুঁ দিলে রাস্তার মানুষ তাজ্জব হয়ে দেখবে।

হুসেন ॥ লেকিন ওরা বলছে, এখন তোমায় দলে যেতে দিবে না।

মিঞা ॥ (একটা স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে যায়) যেতে দিবে না ?

মুবারক ॥ হ্যাঁ, চাচা, তোমার বয়স হয়েছে। এবার ছোড়েই দিলে মাষ্টারি।

মিঞা ॥ মুবারক! বয়স হয়েছে তোরাও বলবি মুবারক ? পাকা চুল দাড়িতে কি বয়স লিখা থাকে রে ? কলজেটা এখনও হাওয়ায় ভরা। পারবে হজরৎ এমন করে ধরতে বাঁশি ? পারবে আমার মত বাজাতে ? শুনবি ? শুনবি তোরা ?

[চেষ্টা করে মিঞা বাজাতে। কিন্তু উত্তেজনায় কাশি এসে যায়।]

হুসেন ॥ তুমি ঘরে যাও চাচা। এমন করলে বুখার বাড়বে।

মিঞা ॥ নাঃ! বাজাতে পারবো না ভাবছিস্! (কাশে) শালা কাশি হামার বাঁশির সতীন। নইলে শুনাতুম তোদের…

হুসেন ॥ থাক্ চাচা, আর একদিন হবে।

মুবারক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুদার মর্জি হলে আর একদিন শুনবো।

মিঞা ॥ খুদার মর্জির কথা বলছিস মুবারক? মর্জি কী নেইরে? নেহিতো জরু গরু ছোড়ে দিয়ে বিস্‌মইল্লার নাম লিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে কাটিয়ে দিলাম সারা জিন্দেগী।

মুবারক ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, এখন শুয়ে আল্লার নাম লাও। বাঁশিতে ফুঁ দিলে তমি আর বাঁচবে না।

মিঞা ॥ বাঁশিতে ফুঁ না দিলেই কি বাঁচবো রে। কোই কেঁদে কেঁদে আল্লাকে ডাকে। হামি বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ডাকি। শুনিস্‌নি সে ডাক। আর কি কবে শুনবি। তোরা তো পয়দা হসনি তখন।

মুবারক ॥ আচ্ছা, আচ্ছা শুনবো। হজরৎ মিঞা ডেকেছে এখন যাই। নইলে গোসা করবে।

মিঞা ॥ তোরা শুনবি না।

মুবারক ॥ হবে, হবে, চল্‌বে হুসেন। (বিরক্ত হয়ে চলে যায় মুবারক। হুসেনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হয়)

মিঞা ॥ শালারা হেসে গেল (বাঁশিকে) শুন্‌লি? শালারা হেসে গেল। বলে কল্‌জের জোর নেই। নেইরে হামার কলজের জোর? তোর ঠোঁটে যে মিষ্টি আছে একটা আওরাৎ দিতে পারে? তোর ঠোঁট হামাকে সব ভুলিয়েছে, আর শালারা বলে কলজের জোর নেই হামার। চুপ করে থাকিস কেন? বাজ…বাজ…(কাশতে থাকে) এই শালা কাশি হামার বাঁশির সতীন। কলজের ভিতরে জমে উঠেছে। খতম করে

দেব শালাদের। নাঃ—নাঃ—তবে তো সব হাওয়াটা নিকাল যাবে। খুদাতালার নাম লিব কেমন করে? তোর নাজুক নাজুক ঠোঁটে চুমা দিব কেমন করে?

[আলির প্রবেশ]

আলি॥ আবে! কথা কও কাব সংগে? চাচা…ও চাচা?

মিঞা॥ আবে শালা, যাব সঙ্গে কথা কই তোর কি বে?

আলি॥ এ দেখো, ঝুটমুট্ গাল দিচ্ছ কেন?

মিঞা॥ গাল দিবো না। কেন আসিস তোবা হামাব কাছে।

আলি॥ বেশ দাও গাল।

মিঞা॥ তোকে মানা কবেছি, তুই হামাব সামনে আসবি না। তোব মুখ হামি দেখবো না।

আলি॥ লেকিন তোমাব মুখ দেখাব জন্য দিলটা হামাব ছট্‌ফট্ কবে চাচা।

মিঞা॥ ছট্‌ফট করে? না শালা? টাকাব খেঁচ পড়েছে। ওহি লিযে এসেছ।

আলি॥ বহুৎ খুব। লেকিন বেটাকে অমন শালা বলে গাল দিচ্ছ কেন মিঞা?

মিঞা॥ মিঞা? চাচা বলতে পাবিস না হাবামজাদা?

আলি॥ এ দেখো, মানুষে শাহাজাদা বলে দুয়া কবে আব তুমি হারামজাদা বলে গাল দিচ্ছ? চাচা কেন? তুমি হামাব আব্বাজান, প্যায়াবা আব্বাজান ছোড়ো না আব্বাজান একখানা পাত্তি।

মিঞা॥ টাকাব দবকাব পডেছে আব এখন আবাজান। নাঃ নাঃ, এক পয়সাও তোকে দেবো না। বললাম্, আলি, থাক হামার কাছে! —তোকে হামি বাঁশি শিখাবো…ব্যাণ্ডমাষ্টাব করে দিবো!

আলি ॥ তোমার এক কথা। ব্যাণ্ডমাষ্টার ব্যাণ্ডমাষ্টার ও সব করলে পেটে দানা পানি পড়ে না। লোকে শোনেনা এখন—চোঙে করে সব গানা বাজায়।

মিঞা ॥ শোনে কি শোনে না তুই কি করে বুঝবিরে? ঠনঠনে বাবুদের জানিস, তাদের বাড়ী বাজাতে গেছি······

আলি ॥ তোমার সে সব কাহানী আর গেল না। বুঝনা জমানা বদ্‌লে গেছে! লোকে এখন গড়ের বাজনা শোনে না, কলের গানা শোনে। তামুক খায় না, সিগারেট পিয়ে।

মিঞা ॥ সিগারেট পিয়ে!

আলি ॥ হ্যাঁ...চাচা ওহি নিয়ে পান বিড়ির দোকান দিবো একটা।

মিঞা ॥ গড়ের বাজনা শোনে না! না না শোনে। শোনাবার তাগদ দরকার। দেখবি ডেরেস পরে বাঁশি হাতে যখন দাঁড়াবো লোকে তাজ্জব হয়ে শুনবে। তুই বাজালেও শুন্‌বে। বললাম শিখ হামার কাছে!···

আলি ॥ চাচা, দাওনা কিছু রুপয়া।

মিঞা ॥ রুপয়া, না, না, এক পয়সাও দেব না। গায়ে তখনও তোর নাড়ীর বাস যায়নি, জঞ্জালের পাশ থেকে তুলে আনলাম, মানুষ করলাম সিনার উপর রেখে, এখন সেয়ানা হয়েছিস্—শুন্‌লি না হামার কথা— (হঠাৎ রেগে) আওরাৎ-এর পিছনে টাকা ওড়াবে আর হামি তাই তোকে দিব?

আলি ॥ কি বলছ চাচা? হামি পান বিড়ির দোকান দিব···

মিঞা ॥ দোকান? হামি কিছু শুনিনি ভাবছিস?

আলি ॥ ওঃ, তুমি রাজিয়ার কথা বলছ চাচা? চাচা, ওকে হামি সাদি করবো।

মিঞা ॥ সাদি করবি ?

আলি ॥ হ্যাঁ, চাচা।

মিঞা ॥ সাদি করবি ? হঁ্যা, হঁ্যা তুই তো বহুৎ জোয়ান হয়েছিস আলি ! সাদি করবি, বিবি তোকে বেটা দিবে লেকিন হামার বিবি তো হামাকে একটা বেটা দিল না আলি !

আলি ॥ তোমার বিবি !

মিঞা ॥ (বাঁশিকে) হঁ্যা, হঁ্যা এই তো হামার বিবি। সারা জিন্দেগী ঠোট বাড়িয়ে ধরে রাখলে হামাকে, একটা বেটা দিল না। ভাবলাম তোকে তালিম দিয়ে বেটা বানাবো—লেকিন তু ··

আলি ॥ চাচা।

মিঞা ॥ সেই ভাল। তুই সাদি কর। বিবি তোকে বেটা দিবে। বুড়া হলে সব দিয়ে যাবি তাকে। · দিব হামার সব টাকা তোকে দিব। পরে আসিস, মালিকের কাছ থেকে চেয়ে রাখবো।

আলি ॥ দিবে চাচা··· (মিঞাকে জড়িয়ে ধরে)

মিঞা ॥ ছোড। ছোড আলি।

আলি ॥ ছোড়বো কি ? সারা জিন্দেগী রাখবো তুমাকে কলজের উপরে। বিবির মত করিয়ে লিয়ে যাবো তোমাকে হামার ঘরে।

মিঞা ॥ নাঃ। না আলি।

আলি ॥ কেন চাচা ?

মিঞা ॥ এই বাজনাগুলো হামার চোখের উপর না থাকলে রাতে নিদ আসে না। (লজ্জিত স্বরে) আর বিবিকে ছোড়ে থাকবো তেমন মরদ হামি না।

আলি ॥ বিবি ! ওহো ! (হাসতে থাকে) আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বিবিকে ভি লিয়ে যাবো।

মিঞা ॥ লিবি ! (খুশীর আবেগে ছেলে মানুষের মত) হামি যাবো তোর ঘরে আলি।

আলি ॥ বেশ। হামি তবে যাই। বিবিকে রাজি করাই।

মিঞা ॥ (তেমনি ছেলে মানুষের মত) শোন্, আলি, হামার কেমন খুশ লাগছে ! শুনবি একটু বাজনা শুনবি ?

আলি ॥ (গম্ভীর হয়ে যায়) না চাচা, এখন থাক্, তোমার বোখার।

মিঞা ॥ (রেগে ওঠে) বোখার ! সব শালা বলিস্ বোখার। হামি বাজাতে পারি না ? শোনাবই তোদের আজ।

আলি ॥ চাচা !

মিঞা ॥ সব শালা তোরা হাসিস। হামার কলজের জোরের পরখ তোদের দেখাবো আজ।

আলি ॥ (রূঢ় কণ্ঠে, অভিমান ছোঁয়া গলায়) চাচা ! ওমন যদি করো চাইনা হামার রুপয়া।

মিঞা ॥ (ধরাগলায়) আলি !

আলি ॥ (ছেলে মানুষকে সান্ত্বনা দেয় যেন) কেন তুমি ওমন কর চাচা ? হামি তো জানি তোমার বাজনায় চিড়িয়া বোল বলে। পথল ফেটে পানি পড়ে।

মিঞা ॥ জানিস, জানিস তুই আলি ! আর কেউ শুনেনা। কৈ বিশ্বাস করে না।

আলি ॥ কারো কথায় মনে দুখ্ লিওনা চাচা। হামি তোমার বাজনা শুনবো, হামার বিবি শুনবে।

মিঞা ॥ (আশ্রয় পায় যেন) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোদের শুনাবো। তোকে আর তুর বিবিকে শুনাবো—হামার আব হামার বিবির ঘরের কথা।

আলি ॥ হামি তবে যাই। বিবিকে শোনাই কথাটা। তুমি ঘরে যাও চাচা হামি পরে আসবো। (আলি চলে যায়। মিঞা বাঁশির দিকে চায়)

মিঞা ॥ (বাঁশিকে) ও বিবি, কথা ক'। আলির বিবিকে শোনাবি না তোর কথা! কথা ক' বিবি। (বাঁশিতে ফুঁ দেয় মিঞা। বদ্ধ হাওয়া যেন ছাড়া পায় দোকানের দাওয়ায়। তোড়ীর আলাপে ভরে ওঠে বাতাস। তন্ময় হয়ে যায় মিঞা ওর বিবিকে নিয়ে। এমন সময় হজরৎ ঢুকে কেড়ে নেয় মিঞার হাতের বাঁশি)

হজরৎ ॥ তোমায় মানা করেছি না, বাঁশিতে হাত দিবে না!

মিঞা ॥ হজরৎ। ব্যাণ্ডমাষ্টারের হাত থেকে কেড়ে নিলি।

হজরৎ ॥ ব্যাণ্ডমাষ্টার! হুঁঃ, খোদার ফরমান এসে গেছে মিঞা, তুমার মাষ্টারী খতম!

মিঞা ॥ নাঃ, হজরৎ না, ও হামার আব্বাজানের বাঁশি, ব্যাণ্ডমাষ্টারের বাঁশি!

হজরৎ ॥ হামিই বাজাব এখন।

মিঞা ॥ নাঃ, তোকে দিব না হামি ব্যাণ্ডমাষ্টার হতে।

হজরৎ ॥ তুমি হতে দেবার কে? মালিক হামায় বলেছে,—

মিঞা ॥ মালিক বলেছে তোকে?

হজরৎ ॥ মিঞা, দিন তো তোমার হয়ে এসেছে, এখন আর কেন ঝুট্‌মুট্ দরদ। বাশিতে ফুঁ দিতে ঠোট কাঁপে কলজেতো চুপ্‌সা বেলুন!

মিঞা ॥ ঠোট কাপে? কলজে চুপসা বেলুন? শালা হারামী, দে হামার বিবিকে।

হজরৎ ॥ গাল দিবে না মিঞা।

মিঞা ॥ দে হামার বিবিকে!

হজরৎ ॥ নাঃ, ওঃ বিবি! আওরাতের তরে তো সাদি ভি করলে না, আবার বিবির সখ কেন?

মিঞা ॥ (লজ্জা পায় যেন) হজরৎ!

হজরৎ ॥ আচ্ছা মিঞা, তোমার কাছেই তো হামি তালিম লিয়েছি। যা বলেছ শুনেছি, করেছি। তবু কেন হামাকে রাস্তা তুমি ছাড়ছ না?

মিঞা ॥ কিছু শিখিস্‌নি তুই !

হজরৎ ॥ তুমিই তো শিখাওনি। ডর লাগলো, যদি মাষ্টার হাতছাড়া হয়ে যায়।

মিঞা ॥ কেনই বা শিখাবোরে শালা ! মুরোদ থাকে নিজে শিখে মাষ্টার হ।

হজরৎ ॥ মুরোদ হামার আছে, লেকিন মালিক তোমাকে প্যার করে। তুমি যদি বল…

মিঞা ॥ না—

হজরৎ ॥ তা কেন বলবে ? হত আলি, তখন বল্‌তে।

মিঞা ॥ বল্‌তাম তো, সে হামার বেটা !

হজরৎ ॥ বেটা ? আজব কথা শোনালে মিঞা।

মিঞা ॥ কেন ? শুধু পয়দা করলেই বুঝি বাপ হয় ?

হজরৎ ॥ বেজন্মাটা হল তোমার বেটা ?

মিঞা ॥ হজরৎ, গাল দিস্‌নি আলীকে।

হজরৎ ॥ গাল নয় মিঞা, সাচ্‌ কথা। জঞ্জালের পাশ থেকে নিয়ে এসে মানুষ করলে, লেকিন আটকাতে পারলে ? যেই দেখলো তুমি অসুখে কাহিল, অমনি শিকলি কেটে সরে পড়লো, হুঁ, ওকে আবার মাষ্টার করতে চাও। জমান টাকা হাতে দিতে চাও ফুর্ত্তি করতে ?

মিঞা ॥ না হজরৎ, না, ও পান বিড়ির দোকান দিবে হামায় বলেছে, ও সাদি করবে।

হজরৎ ॥ ওঃ। তোমাকেও ও কথা বলেছে ?

মিঞা ॥ কি বলছিস হজরৎ !

হজরৎ ॥ হ্যাঁ, ও কথা সকলকে বলে তো টাকা নিচ্ছে। দোকান যা দেবে খোদাতালাই জানে।

মিঞা ॥ লেকিন ও কবুল করলে, সাদি করবে, ঘর করবে! হামায় লিয়ে যাবে ঘরে!

হজরৎ ॥ মিঞা এখনও মানুষ পায়চান্‌লে না! ও তোমাকে ঘরে লিয়ে যাবে? আরে ওর ঘর হল তো রেসের মাঠ।

মিঞা ॥ হজরৎ!

হজরৎ ॥ সাচ্‌না ঝুট বলছি ওদের পুছ, মিঞা, ও যদি সাদি করে তবে আওরাৎ লিয়ে ফুর্ত্তি করবে কে?

মিঞা ॥ না হজরৎ, ঝুট।

হজরৎ ॥ হামাকে তো বিশ্বাস করবে না কোন দিন, ওদের পুছ,…এই মোবারক…হুসেন…

(হুসেন ও মুবারকের প্রবেশ)

হুসেন ॥ কি বলছ মিঞা?

হজরৎ ॥ বল্‌তো চাচাকে, আলির কেচ্ছার কথাটা!

হুসেন ॥ আলির কেচ্ছা?

হজরৎ ॥ হ্যাঁরে, আওরাৎ লিয়ে ফুর্ত্তি কবরে। আর মিঞা যাচ্ছে তাকে টাকার যোগান দিতে, চুপ করে আছিস কেন? বলবি তো রাজিয়ার কথাটা!

হুসেন ॥ লেকেন ও তো সাদি কবরে রাজিয়াকে।

হজরৎ ॥ সাদি? ওই বেল্লাল্লার নাম সাদি? কিবে, মুবারক?

মুবারক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ চাচা, আলির সব ঝুট বাত।

হজরৎ ॥ শুন মিঞা, বলতো মুবারক, হামারাও তো চাচার কাছে মানুষ, লেকেন আলিকেই মিঞা এতো প্যার করে কেন?

মিঞা ॥ হ্যাঁ প্যার করি। ওকে হামি ভালবাসি, তোরা তো আব্বা আম্মা পেয়েছিস, পায়ের নীচে দাঁড়াবার জমিন পেয়েছিস, লেকিন উতো'

কুছ পার নি, বেয়াক্কেলে মানুষ জনম দিয়ে উকে বেজন্মা নামটা দিয়ে গেল। জঞ্জালের পাশে ফেলে গেল।…

হজরৎ॥ সে তো বুঝলাম, তোমাকে পেয়ে সে বেঁচে গেল, লেকেন এখন ও বেলাল্লা করে বেড়াবে আর তাকে তুমি টাকার জোগান দেবে?

মিঞা॥ বিশ্বাস হয় না।

হজরৎ॥ বেশ, তোমার বিশ্বাস লিয়ে তুমি থাক। ওকে যে মাষ্টার করবে ভেবেছিলে তাতো হচ্ছে না। এখন আমার কথাটা মালিককে বলতে কোথায় আট্‌কাচ্ছে তোমার?

মুবারক॥ হ্যাঁ চাচা—দিনতো তোমার হয়ে এসেছে। এখন কাউকে তো হতেই হবে মাষ্টার। হজরৎ মিঞার কথাটা বল্‌লেই মালিককে—

মিঞা॥ না।

হজরৎ॥ শালা বুড়া হারামী!

মিঞা॥ হজরৎ!

হজরৎ॥ কথার কি আছে? শালা জিনের মতো ধরে রেখেছে সব। ইচ্ছে করে পাকা দাড়ি শুদ্ধু শির সানে ঘসে দি।

হুসেন॥ হজরৎ মিঞা, বাপের মতো বুড়া মানুষটাকে ওই কথা বল্‌তে তোমার সরম লাগ্‌ছে না?

হজরৎ॥ চুপ যা হুসেন। বড় মস্তান হয়েছিস।

হুসেন॥ সাচ্‌ কথা বল্‌লেই তোমার দিলে লাগে, লেকিন কি করবো? মুবারকের মতো তোমার দিল খুস কথা হামি বল্‌তে পারি না।

মুবারক॥ এই শালা চুপ যা।

হুসেন॥ থাক্‌তো আলী এখানে, চাচাকে এই কথা বল্‌তে, আর চাক্কু দিয়ে কলজেটা ফাঁস করে দিত।

হজরৎ॥ চুপ যা কেতি কুত্তা কাঁহিকা!

হুসেন ॥ চুপ যাবে কি ? মালিকের কাছে যা শলা করছে তাতে তোমার মাষ্টারি ঠেকায় কে ? লেকিন তুদিন তোমার সবুর সইছে না, ওই বুড়া মানুষটার পিছনে লাগছ !

মুবারক ॥ বুঝলে হজরৎ মিঞা, বুড়ার পায়ে তেল মেখে ওই শালাই মাষ্টারি বাগাবার ধান্ধায় আছে।

হুসেন ॥ না মুবারক। সে ইচ্ছে আমার নেই, আর এও জানি কল্জেতে হাওয়া থাকতে মান ধরে চাচা কাউকে মাষ্টারি দেবেনা। হজরৎ মিঞার কথা ছেড়েই দিলাম আলীকে ভি না।

মিঞা ॥ না হুসেন, আলিকে হামি দিতাম, লেকেন সবাই বলছে ও খারাপ হয়ে গেছে।

হুসেন ॥ কারু কথা তুমি বিশ্বাস করনা চাচা।

মুবারক ॥ উকে ভি বিশ্বাস করনা চাচা। তোমার সব কিছু বাগাবার ধান্ধায় আছে।

হুসেন ॥ চুপ যা মুবারক।

হজরৎ ॥ চুপ যাবে ! শালা তোকে খুন করে ফেল্‌বো।

মিঞা ॥ ছোড়্ ছোড়্ হজরৎ !

[হজরৎ মারতে যায় হুসেনকে, হুসেন রুখে দাঁড়ায়, মিঞা আড়াল করে হুসেনকে, ধাক্কা খেয়ে কাশতে কাশতে পড়ে যায় একদিকে, মালিক ঢোকে]

মালিক ॥ কি হচ্ছে কি দোকানের মধ্যে ?

হজরৎ ॥ সালাম মালিক। হুসেন হারামিকে ভাগাও নেহিতো হামরা দুকান ছোড়ে দিব, কি বলিস মুবারক ?

মুবারক ॥ হ্যাঁ মালিক।

মালিক ॥ আঃ, কি হয়েছে বলবিতো ?

মিঞা ॥ ওই দুটাকে ভাগাও মালিক, ওরা খুন করছিল হুসেনকে।

মালিক ॥ আঃ, তুমি আবার এ গণ্ডগোলের মধ্যে কেন এলে? অসুখ শরীর শুয়ে থাকবেতো।

হজরৎ ॥ হ্যাঁ মালিক, হামরাও ওই কথা বলছিলাম। এমন করতে লাগলো কি বলবো, হুসেনটা হয়েছে ওর জুড়িদার। ওকে তুমি ভাগাও মালিক।

মালিক ॥ একে ভাগাও, ওকে ভাগাও, কি সুরু করলি বলতো, এতোদিন পরে একটা খুশ খবর নিয়ে আসছি,—কথাটা বলতে দিবি না?

মুবারক ॥ ওকে আগে ভাগাও।

মালিক ॥ ভাই হুসেন, যাতো, বাইরে যা, হামি পরে দেখছি।

[হুসেন চলে যায়]

মিঞা ॥ ভাগিয়ে দিলে মালিক, হুসেনকে? হামার কথা বিশ্বাস করলে না, বিচার করলে না।

মালিক ॥ মিঞা, তোমার অসুখ শরীর, এদের কথায় থাক কেন? জোয়ান বয়েস, মারামারি তো এরা করবেই, তোমার মত বুড়ো হয়ে যায়নি।

মিঞা ॥ হামি বুড়া হয়ে গেছি, তুমিও বলবে মালিক?

মালিক ॥ বলা না বলায় কি এসে যায়। তাছাড়া যা হাল হয়েছে তোমার দোকান তুলে দেবো কিনা ভাবছি।

মিঞা ॥ তুলে দেবে কেন?

মালিক ॥ কেন আবার? বছরে দু-একটা মুজরো আসে, আর এলেও বাজনাদার খুঁজে পাওয়া ভার।

মিঞা ॥ মালিক হামি তো এখনও জিন্দা আছি।

মালিক ॥ জিন্দা তো আছো লেকিন কাজে লাগছো না।

মিঞা ॥ কেন? আমি পারিনা বাজাতে? লোকে এখনও চেয়ে থাকেনা আমি বাঁশি ধরে দাঁড়ালে?

মালিক ॥ থাক্তে! তোমাব বাজনা একদিন তারিফ পেয়েছে। লেকেন এখন এই বেমার শবীরে তোমাকে দিয়ে সে বাজনা হবে না।

মিঞা ॥ হবে মালিক হবে।

মালিক ॥ না মিঞা, বাঁশি হাতে নিলে এখন তোমার হাত কাঁপে।

মিঞা ॥ না, না ঝুট, ঝুট, হামি সবাইকে শুনাবো।

মালিক ॥ আঃ চেচাঁমেচি করনা, বিমার বাড়বে।

মিঞা ॥ তা হলে আমায় আর বাজাতে দিবে না? আমাব মাষ্টাবি খতম?

মালিক ॥ না, না—তা কেন? অসুক সারুক, তুমিই আবাব কববে মাষ্টারি।

মিঞা ॥ আমি কি করবো এখন? কোথায় যাবো?

মালিক ॥ তোমায় তো বলেছি—যতদিন বাঁচো এইথানেই তুমি থাকবে, কেউ মানা করবেনা, তোমার জন্যই অনেক পয়সা কামিয়েছি একদিন। তোমায় এখন তাড়িয়ে দেব এমন নেমখহারাম আমি না।

মিঞা ॥ না, না,—আমি আলীর কাছে চলে যাবো। ওব বিবিকে শোনাব আমার বিবির কথা। এখানে কেউ শোনে না। সব হাসে।

মালিক ॥ কি বলছ মিঞা, তুমি আলীব কাছে যাবে?

হজরৎ ॥ শোন মালিক, তোমার কথা শুনলো না—মিঞার কাছে এখন বড় হ'ল আলী। এত করে বললাম ঐ লুচ্চাটা সব ঝুট লাত, বুজরুকি···

মালিক ॥ হ্যাঁ মিঞা বিশ্বাস করোনা আলীকে। তোমার সব টাকা নষ্ট করে দেবে, ওটা লুচ্চা হয়ে গেছে।

মিঞা ॥ লুচ্চা হয়ে গেছে। তুমি দেখেছ?

মালিক ॥ না, মানে, শুনি তো সব।

মিঞা ॥ সব ঝুট, আমি বিশ্বাস করিনা, ও সাদি করবে বলেছে।

মালিক ॥ বেশ তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাক, হামার বলার কথা বল্‌লাম ঃ যাও ঘরে যাও, এখানে দাঁড়িয়ে একটা ঝামেলা করো না।

মিঞা॥ না হামি এখানে বসে থাকবো। আলী যতক্ষণ না আসে হামি এখানে বসে থাকব!

মালিক॥ বেশ, বসেই থাক। কি করি বলত হুজরৎ?

হুজরৎ॥ কেন মালিক?

মালিক॥ ওই ছাখ, এমন হল্লা বাধালি আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।

মুবারক॥ কি কথা মালিক!

মালিক॥ আরে চুমনপ্রসাদজীর বেটার সাদী। তিনদিন গান বাজ্‌না হবে। বাজী পুড়াবে, ওদের বাংগালী সরকারবাবু হামায় একটি ব্যাণ্ডপার্টির কথা বল্‌লে, হাজার টাকার উপর কাম।

হুজরৎ॥ কাম লিলে মালিক!

মালিক॥ হ্যাঁ…এত টাকার কাম, এমন তো পাওয়া যায় না হামেসা। কে কখন ধরে লেয়…মেজাজে বলে দিলাম হামি যাবো।

হুজরৎ॥ ওঃ কি খোস খবর। কত দিন পরে কাম পাওয়া গেল।

মুবারক॥ সকলকে খবরটা দিয়ে আসি।

হুজরৎ॥ আরে আগে বাজনাগুলো বার কর। সাফসুফ করতে হবে তো।

মালিক॥ আরে থাম, থাম।

হুজরৎ॥ থাম্‌বো? কি বল্‌ছ মালিক্?

মালিক॥ কাম্ তো এখনও পুরা পাওয়া যায়নি। আগে বাজনা শুনিয়ে ওদের সরকারবাবুকে খুসি করতে হবে। তবেতো।

হুজরৎ॥ সেটা আটকাবে কোথায়।

মালিক॥ ব্যাণ্ডমাষ্টার কই? মিঞার তো ওই হাল…

হুজরৎ॥ ওঃ।

মালিক॥ সরকারবাবুকে বলে আস্‌লুম দোকানে আসতে, এসে পড়বে। অত টাকার কথা শুনে হুঁস করিনি। দোকানের এই অবস্থা, ছোঁড়াগুলো

কলে মিলে কাম করছে, অবশ্য ওদের আনা যাবে, লেকিন নিজের ব্যাণ্ডমাষ্টার চাই, যে কামাল করে দেবে।

হজরৎ॥ মালিক, বলছিলুম, মিঞার বেমার বলে তো এতবড নামকরা দোকানটা উঠে যেতে পারে না। আর দোকান উঠে গেলে হামরাই বা খাব কি? সেই জন্য...বলুনা মুবারক।

মুবারক॥ হ্যাঁ মালিক, হজরৎ মিঞাকেই দাওনা মাষ্টার করে।

মালিক॥ সেকি!

হজরৎ॥ দাওনা মালিক হামায় ব্যাণ্ডমাষ্টারি।

মালিক॥ না, না, শেষে একটা বেইজ্জতি হয়ে যাবে।

হজরৎ॥ একবার চেষ্টা করে দেখতে দাও মালিক।

মালিক॥ নারে ওসব ছোট খাট কাম হলে কথা ছিল। লেকিন এত বড কাম, মিঞার মত ব্যাণ্ডমাষ্টার না হলে কি সামলাতে পারে।

হজরৎ॥ তোমার ঐ এককথা মালিক। লেকিন একটা বেতো ঘোড়ার জন্যে আফশোষ করলে তো আর গাড়োয়ানের কাজ চলে না।

মালিক॥ নারে ভরসা হয় না। বদনাম হয়ে যাবে।

মুবারক॥ দোকান উঠে গেলে নাম নিয়ে কি হবে?

মালিক॥ বুঝলি, বদনাম হওয়ার থেকে, দোকান উঠে যাওয়াই ভাল। দোকান যদি তুলে দিই, তবে নাম রেখেই তুলে দিব। বদনাম করতে চাই না।

হজরৎ॥ তাই যদি মনে ছিল তবে এতদিন আমাদের সুরত দেখার জন্যে বসিয়ে রেখেছিলে?

মালিক॥ কেন? তোদের তলব তো সব দিয়ে যাচ্ছি, না কি?

মুবারক॥ চিরদিন তো আর দিবে না।

হজরৎ ॥ দোকান উঠে গেলে আমরা খাব কি ?

মালিক ॥ আর পাঁচজনের মত কলে মিলে ঢুকে যাবি।

হজরৎ ॥ ওই জন্যেই বুঝি ধরে রয়েছি তোমার দোকান, আগে বললে তো আমরা অন্য দোকানে কাজ নিতাম।

মালিক ॥ তা আমি এখন কি করবো ?

হজরৎ ॥ আমায় দেবে ব্যাণ্ডমাষ্টারি ?

মালিক ॥ জোর করে নিবি ?

হজরৎ ॥ হ্যাঁ, জোর করে নিব ; ইজ্জৎ যাবে, সরম লাগবে, বদনাম হবে, আর, এখন যে লোকটাকে বলে এসেছো, সে এসে ফিরে গেলে সরম লাগবেনা ? কথার খেলাপ হবে না ?

মালিক ॥ হ্যাঁ, কি করি বলতো—

মুবারক ॥ দাওনা মালিক হজরৎ মিঞাকে। দেখই না একবার। আগে সরকারবাবুর সামনে বাজাক্। হজরৎ মিঞা যখন বলেছে বুক ঠুকে, তখন দেখই না একবাব।

মালিক ॥ বলছিস্ তোরা ? তুমি কি বল মিঞা ?

হজরৎ ॥ মিঞা আবার কি বলবে ? ওকে সালিশ মান্‌ছ ! মালিক তুমি, তুমি হুকুম করবে আমি বাজাব। ব্যস্ হয়ে গেল, এখন সরকারবাবুর ভাল লাগা না লাগা আমার নসীব।

মালিক ॥ বেশ দেখ্ চেষ্টা করে। দোকান তো উঠেই যাবে।

হজরৎ ॥ ব্যস্—ব্যস্—সালাম্ মালিক। দেখনা কিরকম বাজাই। আর পাঁচজনে দেখুক—বাজনা কারুর একার জিনিস না।

মিঞা ॥ মালিক—

মালিক ॥ তুমি আবার কি বলছ ?

মিঞা ॥ আমি আর ব্যাণ্ডমাষ্টার না ?

মালিক ॥ আহা, সে কথা তো হচ্ছে না।

মিঞা ॥ তবে ও বাজাবে কেন? আমার সামনে আমার আব্বাজানের বাঁশি বাজাবে কেন?

হজরৎ ॥ ওই দেখ মালিক, অম্‌নি বুড়া হারামীর কল্‌জে জ্বালা করে উঠল।

মালিক ॥ চুপ হজরৎ! তুমি আব বাজাতে পার না মিঞা, ওকে একবার দেখি বাজাতে পারে কি না।

মিঞা ॥ না—না, ও পারবে না বাজাতে, বদনাম হবে, আমি বাজাব মালিক আমি বাজাব, আমি ব্যাণ্ডমাষ্টার।

হজরৎ ॥ হুঁ বাজাবে, গোরে গিয়ে বাজাবে।

মিঞা ॥ এই খানেই বাজাবো আমি, সবাইকে শুনাবো, আব্বাজান হামায় ব্যাণ্ডমাষ্টার করে গেছে। কল্‌জেয় হাওয়া থাক্‌তে হামি দেব না হামার আব্বাজানের বাঁশি বাজাতে।

মালিক ॥ আঃ মিঞা, দোকান হামার। তোমাব অব্বাজানের না।

মিঞা ॥ মালিক, তুমি এই কথা বলতে পারলে। আমার আব্বাজান না থাকলে দোকান হত? আমি না থাকলে দোকান দাঁড়াতো? এখন আমার চোখের সাম্‌নে ওকে ব্যাণ্ডমাষ্টার করে দেবে? আমি কি করবো?

মালিক ॥ কেন? যেমন আছ তেমন থাকবে। আমি যা ভাল বুঝছি তাই করছি। তোমাকে নিয়ে থাকলে তো আমার চিরদিন চলবে না!

মিঞা ॥ মালিক!

মালিক ॥ আমি বুঝি না তুমি কেন এই নিয়ে চেচাঁমেচি কর। এতদিন আমার হয়ে কাম করেছ। বুড়ো হয়েছ, তোমায়তো ফেলে দিচ্ছি না, তোমার সব ভার হামার। তবু কেন এই নিয়ে অসুখ শরীরে চেচাঁমেচি করছ!

হজরৎ॥ হ্যাঁ লাগিয়েছে দেখনা। যেন ওর বিবিকে কেউ কেড়ে লিচ্ছে।

মিঞা॥ আমার ইজ্জৎ কেড়ে লিচ্ছে, আমার সরম কেড়ে লিচ্ছে। আমার সব লিচ্ছে, আমি কি করবো। মালিক, আমি বাজাবো—

মালিক॥ আহা, তুমি কি বল্‌ছ তার ঠিক নেই। যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

মিঞা॥ না—না—আমি বাজাব, হামি তোমার সামনে বাজাব, তারপর তুমি বলবে সরকারবাবুর সামনে বাজাব। মাৎ করে দেব। বায়না লিয়ে ডেরেস পরে বাঁশি হাতে দাঁড়াব। দেখ্‌বে মালিক, কেমন বাজাই

মালিক॥ আচ্ছা তুমি কি পাগল হলে মিঞা।

মিঞা॥ তুমি আমায় বাজাতে দিবে না?

মালিক॥ কি ঝামেলা বোল্‌তো। এখন আবার সরকারবাবু এসে পড়বে।

হজরৎ॥ বেশ মালিক, ও বাজাক—দেখি ওর কলজের জোর।

মালিক॥ না—না—সবাই মিলে বুড়োটাকে মারবি নাকি?

হজরৎ॥ না—না—মালিক ও বাঁশিতে ফুঁ দিতে পারলে ওই বায়না লিয়ে যাবে। এই লাও, বাজাও দেখি।

মিঞা॥ বাজাবোই তো! দেখ্‌ আমার কল্‌জের জোরের পরখ। আলী বলেছে হামার বাজনায় চিঁড়িয়া বোল বলে, পাথর ফেটে পানি পড়ে। দে। (বাঁশি প্রায় কেড়ে নেয়)

[মিঞা চেষ্টা করে বাজাতে। কিন্তু বৃথা। কাশির দমকে ছিঁড়েই পড়তে চায় বুঝি ওর কল্‌জে। হজরৎ আর মুবারক হেসে ওঠে]

মুবারক॥ হজরৎ মিঞা, তোমার মাষ্টার হওয়ার আশা খতম। শুনছ চাচা কেমন বাজাচ্ছে।

[দু'জনে হেসে ওঠে]

মিঞা ॥ শালা কাঁশি হামায় বেইজ্জত করিস। (কাশতে থাকে)

মুবারক ॥ কই মিঞা, পাথল ফাটাও।

হজরৎ ॥ চিঁড়িয়ার বোল বোলাও।

মিঞা ॥ হজরৎ—(প্রবল বেগে কাশতে থাকে। হজরৎ আর মুবারক পাল্লা দিয়ে হেসে ওঠে)

হজরৎ ॥ তোমার বিবির খেল দেখাও!

[হঠাৎ সমস্ত শক্তি নিয়ে নিয়া চড় মারে হজরৎকে। সবাই বিস্ময়ে চুপ করে যায়। সন্তানকে আঘাত করার বেদনায় ভেংগে পড়ে মিঞা]

মালিক ॥ ছিঃ! ছি,—ছি, মিঞা, সুবোদ তো নেই। আবার হামার সাম্‌নে তুমি গায়ে হাত তোল, বুড়া হয়েছ, অসুখ শরীর, ঘরে শুয়ে আল্লার নাম লিবে, তা নয়, একটা খুনা খুনী বাঁধাবার মতলব, যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

মিঞা ॥ (অসহায়ের মত) না মালিক।

মালিক ॥ নাঃ, এই মুবারক, হজরৎ, ঘরে বন্ধ করে দে ওটাকে।

মুবারক ॥ ধর হজরৎ মিঞা।

মিঞা ॥ না, হামি আলীর ঘরে চলে যাবো, আলী হামাকে লিয়ে যাবে।

মালিক ॥ সে যখন যাবে তখন যাবে। এখন বাইরের লোকের সাম্‌নে কেচ্ছা করতে হবে না, কিরে তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

[জোর করে মিঞাকে ঘরে রেখে আসে মুবারক আর হজরৎ]

মুবারক ॥ আচ্ছা করেছ মালিক, দেখ্‌লে তোমাকে ভি মানে না, ওই বেজম্মাটা···কি হল মালিক?

মালিক ॥ বুড়া মানুষটাকে বড় শক্ত কথা বলে ফেলা্‌লাম। নারে হজরৎ?

হজরৎ ॥ তুমি হক কথাই বলেছ। তোমার মত নরম মালিক পেয়েছে বলেই না ওর এত হুজ্জ্‌তি। পড়ত হামার হাতে…

মালিক ॥ দোকানটাকে মিঞা ভালবেসেছিল, বাজনাটাকে ভালবেসেছিল তাই না এমন বম্‌ বম্‌ করে উঠেছিল দোকানটা। ওকে চড়া কথা বল্‌লে নিজের মনেই লাগে।

হজরৎ ॥ তুমি কিছু ভেবনা মালিক। হামায় পাকাপাকি মাষ্টার করে দাও, দেখ কেমন বাজাই। কেমন নতুন করে সাজাই দোকানটাকে।

মালিক ॥ পারবি তুই! পারবি মিঞার মত দিল দিয়ে ভালবাসতে দোকানটাকে? বাজনাটাকে?

হজরৎ ॥ হ্যাঁ মালিক, দেখ না, হামি আছি মুবারক আছে।

মুবারক ॥ দেখনা মালিক, হজরৎ মিঞাই কেমন চাচাকে ছাড়িয়ে যাবে।

মালিক ॥ বেশ, আজ যদি সরকারবাবুকে বাজনা শুনিয়ে খুশী করতে পারিস তবে পাকাপাকি তুই এই দোকানের ব্যাণ্ডমাষ্টার।

হজরৎ ॥ সালাম মালিক।

[নেপথ্যে সরকারবাবুর গলা শোনা যায়]

মালিক ॥ আসুন সরকারবাবু।

[সরকারবাবুর প্রবেশ]

সরকার ॥ এই বুঝি দোকান। খুব তো নামডাক শোনালেন, ভাল বাজনা দিতে হবে কিন্তু।

মালিক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ব্যাণ্ডমাষ্টারের বাজনা শুনেন। ভাল লাগে লিবেন।

সরকার ॥ হ্যাঁ মশাই, বাবুর আবার হাজার বায়না। ভাল জিনিস চাই। ছেলের বিয়ে বলে কথা। তিনদিন ধূমধাম, বাবুতো একবার বল্‌লেন বিলেত থেকে হাওয়াই জাহাজ করে বাজ্‌না নিয়ে আস্‌বেন।

মালিক ॥ হ্যাঁ বহুৎ খরচ করছেন।

সরকার ॥ খরচ মানে, তার কি সীমে পরিসীমে আছে। জলের মত, বুঝলেন, জলের মত, আমার উপর আবার ভার পড়েছে ভাল ভাল বাজনা বায়না দেবার। আমাকে বাবুর খুব পছন্দ কিনা ?

মালিক ॥ বসেন, বসেন। এই মুবারক চৌকিটা দেনা।

মুবারক ॥ (চৌকি এগিয়ে দেয়) বসেন, মশাই।

সরকার ॥ (বসে) নিন মশাই, আরম্ভ করুন। আমার আবার হাজার কাজ। এটা পছন্দ না হলে আরেকটা দেখতে হবে।

মালিক ॥ না, না, হাপনার পছন্দ মত বাজানাই দিব। কইরে হজরৎ।

[হজরৎ বাঁশিটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়]

সরকার ॥ এই বুঝি ব্যাণ্ডমাষ্টার !

মালিক ॥ হ্যাঁ, এখন ছোক্‌রা দেখাচ্ছে, লেকিন বাজিয়ে মাৎ করে দিবে। সুরু করুক সরকারবাবু ?

সরকার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ (হজরৎ একটা হাল্‌কা গানের সুর বাজায়) থামো, ছোক্‌রা, কি সস্তা বাজনা বাজাচ্ছো, এই বাজ্‌নদার নিয়ে চুমনপ্রসাদজীর বেটার বিয়ে হবে !

মালিক ॥ ঘাবড়ে গেছে মশাই। আর একটু বসুন।

সরকার ॥ না মশাই না, বসে কাজ নেই। বাজনার জন্যে খোঁজা খুঁজিতো আমাকেই করতে হবে।

হজরৎ ॥ মেহেরবাণী করে আর একটু বসুন। হামি আর একবার বাজাচ্ছি।

সরকার ॥ আরে বাবা আমরা হলুম পুরোন লোক, বাঁশিতে ফুঁ দিলেই বলে দেব কে আসল বাজনদার।

মালিক ॥ এ কথা পাঁচ কানে গেলে হামার দোকানের বদনাম হবে সরকারবাবু, একবার শুনুন।

সরকার ॥ বেশ, বাজাও ছোক্‌রা।

[অনিচ্ছাসত্বেও বসে সরকারবাবু। মুবারক হজরতের কানে কানে পছন্দমত একটা গানের সুর বোধহয় বলে যায়। হজরৎ বাজায়। আগেকার ঘটনাই ঘটে। কারণ সরকারবাবুর মতে হজরৎ-এর ভাঁড়ারে দামী কিছু নেই দেবার মত]

আরে ধেৎ! সময় নষ্ট! চুমনপ্রসাদজীর ব্যাটার বিয়েতে তোমাদের বাজিয়ে কাজ নেই। কোন শ্রাদ্ধে বাজিও। আর দোকানটাকে নিমতলার ঘাটে বসিও, বড় বড় কথা আব কাজের বেলা অষ্টরম্ভা।

[প্রস্থানোদ্যত সরকারবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মিঞা। ওর গায়ে ব্যাণ্ডমাষ্টারের রং বাহারী জামা, মাথায় ঝকঝকে পাগ্ড়ী। সবাই স্তম্ভিত। মিঞার কপালের উপর ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম জমেছে]

মিঞা॥ সরকারবাবু, একটু ঠেব্হেন। এ আমার আব্বাজানের হাতের দোকান। এর ইজ্জত হাপনাকে লিয়ে যেতে দিব না।

মালিক॥ মিঞা, কি করছ কি?

মিঞা॥ মালিক, দুকানের ইজ্জত লিয়ে যাচ্ছে বাইরের লোক, তুমি দেখছ। লেকিন হামি ব্যাণ্ডমাষ্টার। এ হতে দিব না। সরকারবাবু মেহেরবাণী করে শুনুন হামার বাজনা, ব্যাণ্ডমাষ্টারের বাজনা।

মালিক॥ তোমার জান চলে যাবে মিঞা।

সরকার॥ ভাল বিপদ, এ বলে ব্যাণ্ডমাষ্টার, ও বলে ব্যাণ্ডমাষ্টার।

মিঞা॥ সব ঝুট্। হামি ব্যাণ্ডমাষ্টার। কলজে হাওয়ায় ভরা। শুনুন সরকারবাবু। আব্বাজানের বাঁশি দে হজরৎ।

[হজরতের হাত থেকে বাঁশি নেয় মিঞা। কানে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করে গুরুকে]

সরকার ॥ দেখো, শোনার সময় আমার নেই। চুমনপ্রসাদজীর ব্যাটার বিয়েতে এ বাজনা চল্‌বে না।

মিঞা ॥ চল্‌বে সরকারবাবু। একটু শুনেন, হামার বিবি হাসে, কাঁদে, কথা কয়।

[বাজাতে শুরু করে মিঞা। সরকারবাবুর আর যাওয়া হয় না। সবাই অবাক হয়ে শোনে, মিঞা বিস্তার করছে সুরের ইন্দ্রজাল। "বসন্ত" রাগে ছড়িয়ে চলে মিঞার বিবি,—হাসি,—অশ্রু,—কথা, এইতো মিঞার জীবনের বসন্ত। সারাজীনের ফসল তোলা' শেষ, এবার শেষ বসন্তে নতুন জীবনের আহ্বান। গত দিনের দেনা পাওনা শেষ করে আনন্দ সাগরে ডুব দিতে চলেছে মিঞা তারই প্রকাশ পেতে থাকে সুরে সুরে। এই জীবনের খেলা শেষ কবে শান্তিব কোলে সুপ্ত হয় মানুষটা। আর সকলের তন্দ্রা ভাংগে যেন।]

মালিক ॥ ইয়া আল্লা !

সরকার ॥ কি হ'ল ?

মালিক ॥ কল্‌জের শেষ ফুঁ দিয়েছে মিঞা, বাঁশি তো আর বাজবেনা।

হজরৎ ॥ বাঁশিটা কেমন ধরে আছে দেখ মালিক।

মালিক ॥ থাক হজরৎ, মিঞার বিবি মিঞার কল্‌জের উপরেই থাক।

[একটু নীববতা। আলীর চিৎকার শোনা যায় 'বিবির মত পেয়ে গেছি, তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবো চাচা।' থম্‌কে দাঁড়ায় আলী। মিঞার মাথাটা কোলে তুলে নেয়। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকায় সবার দিকে]

মালিক ॥ মিঞা আর বাজাবেনা আলী।

আলী ॥ আব্বাজান (শিশুর মত কেঁদে ওঠে মিঞার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটা)

[যে সুর রেখে গেল মিঞা বাঁশিতে, প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে সেই সুর দূরে দূরান্তরে]

সমাপ্ত